ছোট ছোট গল্প।

পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য, শিবাজী মহাকাব্য,
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত
প্রভৃতি প্রণেতা

কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ,

প্রণীত

কলিকাতা।
১৩৩০

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা

৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PRINTED BY K. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS,
91-2, Machua Bazar Street, Calcutta.

স্নেহোপহার

বধূরূপে যাঁরা আমার মাতা, দুহিতা এবং সেবিকার

স্থান গ্রহণ করেছেন ; যাঁদের স্নেহ, ভক্তি এবং

শুশ্রূষাগুণে আমার মানসিক ও শারীরিক

অবসাদ দূরীভূত হয়, যাঁদের ব্যবহারে

আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ ভেবে

ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করি ; তাঁদের হাতে, শুভাশীর্বাদ

সহ, এই ছোট ছোট গল্পের

বইখানি দিলাম।

সূচীপত্র।

চিত্রসূচী।

প্রস্তাবনা।

গল্প বলা বুড়া মাত্রেরই স্বভাব; সুতরাং আমি যদি, এ বয়সে, দু'টো একটা গল্প বলি, তা' হ'লে স্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করা হ'বে। আমাদের দেশে গল্পের বিষয় রাজপুত্র ও রাজকন্যার কথা, গরীব বামুন ঠাকুরের কথা, চোর ডাকাতের কথা, রাজা বিক্রমাদিত্যের কথা ইত্যাদি। এই গল্পগুলিতে আমি সেই সনাতন প্রথারই অনুসরণ করেছি। বিশিষ্টতার মধ্যে এই যে, আমোদলাভের সঙ্গে, যা'তে কিছু উপদেশ লাভ হয়, তা'ও লক্ষ্যপথে রেখেছি। আর সর্ব্বোপরি চেষ্টা করেছি যা' স্বাভাবিক এবং সম্ভবপর তা'ই গল্পের বিষয় কর্ব্বার জন্য। গল্পগুলিতে কল্পনা আছে, কিংবদন্তী আছে, কোথাও বা ইতিহাসের কথা আছে। খাঁটী ইতিহাস না হ'লেও তা' হতে অতীত যুগের সামাজিক ও ঐতিহাসিক চিত্র পাঠকের চোকে পড়্‌বে। গল্পে ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ চিরদিনই চলে আস্‌চে। সুতরাং মিহিরকুলের পরাজয়ে তাল বেতালের এবং মোগলের পর্ত্তুগীজধ্বংসে গঙ্গাচরণের আবির্ভাব, বোধ হয়, অবৈধ বলে গণিত হবে না।

রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্পের একটী অংশ বোঝ্‌বার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ যাঁরা উপন্যাস পড়েন, তাঁদের এ জ্ঞানটুকু আছে, এই বিশ্বাসেই আমি গল্পটাকে এ ভাবে গঠন করেছি। পতিপুত্রের নিকট বুঝিয়ে নিলে আমাদের মহিলাগণের পক্ষেও গল্পের মর্ম্মটা বোঝা কঠিন হ'বে না, আমার এইরূপ বিবেচনা হয়।

যে ভাষায় আমরা সচরাচর কথোপকথন করি, গল্প বলি, তা' "সাধু ভাষা" হ'তে কিছু ভিন্ন। তা'তে ক্রিয়াপদগুলির কিছু পরিবর্ত্তন এবং চলিত কথার কিছু প্রবর্ত্তন কত্তে হয়। যা'কে অকারণে "অপভাষা" বলা হয়, মধ্যে মধ্যে, তা'রও প্রয়োগ না কল্লে চলে না। দোষই হ'ক বা গুণই

হ'ক, আমি গল্পগুলিতে এই "সাধু" ও "অসাধু" ভাষার সংমিশ্রণ করেছি। সংসার এই সাধু অসাধুর সংমিশ্রণেই চলচে। সাহিত্যের বা সাধুভাষার সম্বন্ধে আমার যা' আদর্শ আমি আমার অপর বহু গ্রন্থে তা' ব্যক্ত করেছি।

'মানুষ না দেবতা' নামে গল্পটীর মূল স্থানীয় জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত; শাখা, পল্লব আমার সংযোজিত। এই গল্পটীর উপাদান-সংগ্রহে আমার পরমস্নেহাস্পদ ছাত্র, দেওঘর-প্রবাসী, শ্রীমান ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে। আমি সেজন্য শ্রীমানের নিকট সস্নেহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

গল্পগুলি যা'তে সাধারণ পাঠকগণের সঙ্গে বালক, বালিকা এবং মহিলাদিগেরও পাঠের উপযোগী হয়, আমি তা' লক্ষ্য রেখেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের রুচি এখন পরিবর্ত্তিত হয়েছে; কিন্তু উত্তেজনার অনলে ইন্ধন না যুগিয়ে যা' সত্য এবং শিব তা'রি আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি।

পীড়িত অবস্থায় মুদ্রিত হওয়ায় এবং সমস্ত প্রুফ স্বয়ং দেখিতে না পারায় কয়েকটা মুদ্রণ ভ্রম রহিয়া গিয়াছে; তজ্জন্য ত্রুটি স্বীকার করি। পুস্তকের আকার ও মুদ্রণ-ব্যয় অনুমান অপেক্ষা অনেক অধিক হওয়ায় বিজ্ঞাপিত মূল্য অপেক্ষা মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি—

৩৫ এ গুয়াবাগান লেন,
কলিকাতা।
শ্রাবণ ১৩৩০

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু
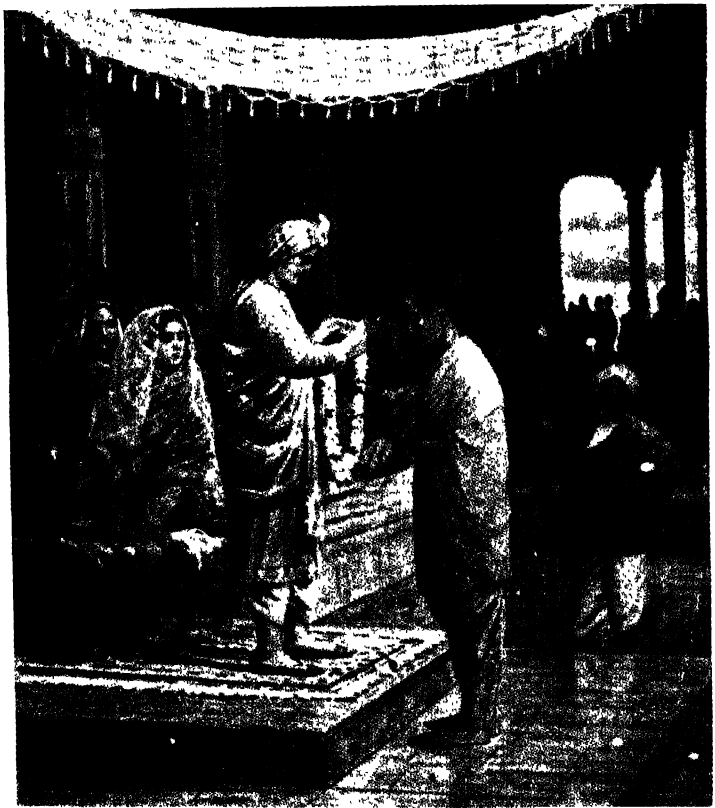
রাজা বিক্রমাদিত্যের কালিদাসকে সংবর্দ্ধন।

ছোট ছোট গল্প।

প্রথম।

অজানা দেশের রাজকন্যা।

এক ছিল অজানা দেশ। কেউ, কখনও, সে দেশে যায়নি বা সে দেশ হ'তে আসেনি; কাজেই তা'র কথা কেউ জান্‌ত না। তা'র চার দিক্ উঁচু পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড় ঠিক্ প্রাচীরের মত খাড়া হ'য়ে উঠেছিল; কেউ যে চড়্‌বে, সে সম্ভাবনা ছিল না। পাহাড়ের তলায় নিবিড় বন; ক্রোশের পর ক্রোশ চ'লে গিয়েছিল। বনে বাঘ, ভাল্লুক, অজগর সাপ থাক্‌ত; বুনো হাতী, মহিষ, আর বড় বড় বানর, দলে দলে, ঘুরে বেড়াত। অনেকগুলি ছোট, বড় ঝর্‌ণা, পাহাড় থেকে বেরিয়ে, তর্ তর্ ক'রে সেই বনের ভিতর ছুট্‌ত। রাত্রিতে, কখনও কখনও, ঝরণার ধারে, আলো দেখা যেত। লোকে বল্‌ত, সেগুলো ডাকিনীর আলো। বনের জন্তুরা রাত্রিতে ঝর্‌ণায় জল খেতে আসে, আর ডাকিনীরা তা'দের খাবে ব'লে হাঁ করে। তখন তা'দের মুখ থেকে আলো বেরোয়। এই সকল কারণে কেউ সে বনের মধ্যে যেতে সাহস কত্তো না; কাজেই বনের ভিতর দিয়ে অজানা দেশে যাবার কোনও পথ আছে কি না, কেউ বল্‌তে পাত্তো না। বনটার নাম ছিল ডাকিনীর বন। একটা প্রবাদ ছিল যে, অনেক দিন আগে, ডাকিনীর বনের ভিতর দিয়ে, অজানা দেশে যাবার পথ ছিল। ভূমিকম্পে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ায় সে পথ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে; সেই অবধি অজানা দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ লোপ পেয়েছে।

অজানা দেশের পাশেই শিলাগড় রাজ্য; ধনে, জনে পরিপূর্ণ। সেখানে নদীতে প্রচুর সুমিষ্ট জল, গাছে প্রচুর সুমিষ্ট ফল, গরুর বাঁটে প্রচুর সুমিষ্ট দুধ। চোরডাকাতের ভয় ছিল না; অত্যাচার, উপদ্রব ছিল না; প্রজার শিক্ষার, ব্যবসায়বাণিজ্যের এবং স্বাস্থ্যের উপর রাজার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল; কাজেই লোকে, সেখানে, পরম সুখে বাস কর্ত্তো। শিলাগড়ের রাজার নাম ছিল বিক্রমজিৎ সিংহ। প্রজারা তাঁকে পিতার ন্যায় ভাল বাস্‌তো, পিতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা কর্ত্তো। রাজার ছিলেন একটী মাত্র পুত্র; নাম অগ্নিজিৎ সিংহ। রাজপুত্রের যেমন রূপ, তেমনই বুদ্ধি, তেমনই বল। অত বড় রাজ্যের মধ্যে তাঁর মত সুপুরুষ কেউ ছিলেন না। কাঁচা সোণার মত রঙ, বড় বড় চোক, হৃষ্ট, পুষ্ট গড়ন, মুখে যেন হাসিটী লেগেই আছে; যে দেখ্‌ত, সেই তাঁর রূপের প্রশংসা কর্ত্তো। কিন্তু এই সুন্দর দেহের মধ্যে তাঁর অসুরের মত বল ছিল। বড় বড় জঙ্গ্‌লী ঘোড়া, যার কাছে যেতে কেউ সাহস কর্ত্তো না, তিনি ঝুঁটী ধ'রে বিনা জিনে চড়্‌তেন। যে ক্ষেপা হাতী তার মাহুতকে পায়ে মাড়িয়ে মেরেছে, তিনি তার কাঁধে চ'ড়ে, ডাঙ্গস মেরে, চালাতেন। দেশ বিদেশ থেকে নামজাদা পালোয়ানেরা তাঁর সঙ্গে কুস্তি লড়্‌তে আস্‌ত; কিন্তু হেরে, পায়ের ধূলো নিয়ে, চলে যেত। মুষ্টিযুদ্ধে, তলোয়ার চালাতে, তীর ছুড়্‌তেও তিনি অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। অমন সুন্দর, ললিত দেহের মধ্যে কিরূপে তাঁর অত বল ছিল, সাধারণ লোকে তা' বুঝ্‌তে পার্ত্তো না। কিন্তু রাজা, রাণী আর তাঁর শিক্ষক তাঁর বলের প্রকৃত কারণ বুঝ্‌তেন। তাঁরা জান্‌তেন, রাজপুত্রের বল তাঁ'র ব্রহ্মচর্য্যে। বাহিরে কোন লক্ষণ না দেখালেও, অন্তরে, তিনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী ছিলেন। রাজসভায় সুরূপা, সুবেশা নর্ত্তকীরা নৃত্য কর্ত্তো। যুবক রাজপুত্রের মনোরঞ্জনের জন্য তারা কতরূপ ভাব, ভঙ্গী কর্ত্তো। কিন্তু তিনি, একবারও তাদের দিকে ফিরে চাইতেন না। তিনি নগরভ্রমণে বেরুলে, শত শত সুন্দরী নারী,

গবাক্ষপথে দাঁড়িয়ে, তাঁকে দেখ্‌তেন। কখনও কোন যুবতীর সঙ্গে হঠাৎ চোকোচোকি হলে তিনি, সসঙ্কোচে, মাথাটী নীচু কত্তেন; একবার একটু দেখি, কখনও, এ কথা ভাব্‌তেন না। পরিচর্য্যাকারী ভৃত্যের কোন ত্রুটি হ'লে, রাজপরিবারের কেউ কেউ তাকে বেত্রাঘাত পদাঘাত কত্তেন; কিন্তু রাজপুত্র কখনও কোন ভৃত্যকে একটী কঠোর বাক্য পর্য্যন্ত বল্‌তেন না। তাঁ'র বাক্যে সংযম, ব্যবহারে সংযম, আহারে সংযম, নিদ্রায় সংযম; সকল বিষয়ে সংযম ছিল ব'লেই তাঁর শরীরে ওরূপ বল জন্মেছিল। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিও তাঁর শারীরিক বলের উপযুক্ত ছিল। সাহিত্য, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, কত শাস্ত্র যে তিনি পড়েছিলেন, তার গণনা নাই। বিভিন্ন দেশে কিরূপ ভাষা, কিরূপ শাসনপ্রণালী, কিরূপ জীবজন্তু, কিরূপ বৃক্ষলতা আছে, তিনি যত্নের সহিত শিক্ষা করেছিলেন। অন্য বিদ্যার ন্যায় রাজনীতিতেও তাঁর এমন অধিকার জন্মেছিল যে, প্রাচীন রাজমন্ত্রীরা, সন্দেহ-স্থলে, তাঁরই পরামর্শমত কাজ কত্তেন। শিলাগড়ের রাজা, রাণী দু'জনেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন; তাই লোকে বল্‌ত, দশরথের আর কৌশল্যার পুণ্য-বলে যেমন শ্রীরামচন্দ্র জন্মেছিলেন, তাঁদেরও পুণ্যবলে তেমনই কুমার অরিজিতের জন্ম হয়েছে। শুনে রাজারাণীর আনন্দের সীমা থাকৃত না।

রাজপুত্রের বয়স্ ক্রমে পঁচিশ বৎসর হ'ল। রাজা, রাণী তখন তাঁর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হলেন। তাঁদের ইচ্ছা, যেমন সুন্দর, গুণবান্ ছেলে, তেমনই একটী সুন্দরী, গুণবতী বউ ঘরে আনেন। রাজপুত্রের রূপগুণের কথা শুনে নানা দেশের সুন্দরী রাজকন্যাদের পিতারা ঘটক পাঠাতেন। রাজা, রাণীও অনুসন্ধান করৃতেন। কিন্তু রাজপুত্র কোথাও বিবাহ করৃতে সম্মত হ'তেন না। গোপনে মেয়েদের আচার ব্যবহারের, বিদ্যাবুদ্ধির, রূপগুণের অনুসন্ধান নিয়ে, তিনি, তাঁর বন্ধুদের দিয়ে, মায়ের কাছে ব'লে পাঠাতেন, "না মা! ও মেয়ে ঘরে এনো না; মেয়েটীর রূপ আছে, কিন্তু বড় চঞ্চলা, বড় মুখরা; ও মেয়ে নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পারৃবে না।"

কখনও বা বল্‌তেন ;—"মেয়েটীর রূপ, গুণ আছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল নয়। ও মেয়েকে বউ কল্লে, মা! তুমি তার সেবা পাবে না, তোমাকেই তার সেবা কত্তে হ'বে।" কেমন ক'রে যে তিনি এই সকল সংবাদ পেতেন, রাজারাণী তা বুঝ্‌তে পাত্তেন না। যাই হ'ক্, এই রকমে অনেক সম্বন্ধ আস্‌ত আর যেত ; রাজপুত্রের পছন্দই হ'ত না। রাজারাণীর মনে বড় দুঃখ হ'ত। তবে একটীমাত্র ছেলে, অমন গুণবান্ ছেলে, তা'র অমতে কিছু কত্তেও পারেন না ; কাযেই ক্ষান্ত থাক্‌তেন। শেষে, দু'জনে, পরামর্শ ক'রে, স্থির কল্লেন, রাজকুমারেরই উপর মেয়ে পছন্দ কর্‌বার ভার দেবেন। রাজা নিজে কিছু বল্‌তে পাল্লেন না, পাছে পুত্রের লজ্জা হয়। রাণী একদিন কুমারকে বল্লেন ; "অরিজিৎ! তুই কি বিয়ে কর্‌বি না?"

অরি। "কেন মা! যে দিনই বল্‌বে, সেই দিনই কর্‌ব।"

রাণী। "ওটা ত তোর মুখের কথা। এত মেয়ের খবর এল, তোর যখন পছন্দ হ'ল না, তখন তোর যে বিয়ে হ'বে, আমাদের ত সে আশা হয় না।"

অরি। "মা! এত ব্যস্ত হচ্চ কেন? বিধাতার যদি কৃপা থাকে, এমন সম্বন্ধ আস্‌বে, বাবা, তুমি, আমি সকলেই আমরা সুখী হব। আর যদি নিতান্তই তোমাদের ইচ্ছে হয়, যে মেয়েকে বল্‌বে, সেই মেয়েকেই বিয়ে কর্‌ব। আমার আবার সুখ, অসুখ কি? তোমরা সুখী হ'লেই আমি সুখী। তবে অনেক রাজা, পছন্দ হ'ল না ব'লে, পাঁচটার উপর সাতটা, সাতটার উপর দশটা বিয়ে করেন। আমি কিন্তু, মা! তা' কত্তে পার্‌ব না।"

রাণী হেসে বল্লেন ; "না না! তোর তা' কত্তে হ'বে না। তোর বাবারও ত এক বিয়ে, তুই একটা বিয়েই করিস্। তবে ছাখ্, বাবা! আমাদের দু'জনারই বয়স হ'য়েছে ; কে কোন্ দিন ম'রে যাব ; তোর একটী খোকা দেখ্‌তে পাল্লে আমাদের জন্ম সার্থক হয়। সেইজন্যই আমরা ব্যস্ত।"

রাণীর এক সখী সেখানে ছিলেন। তিনি ঠাট্টা ক'রে বল্লেন; "জানা রাজকন্যাদের একটীও ত কুমারের পছন্দ হ'ল না; এখন অজানা দেশের রাজকন্যাই বাকী আছেন; কুমার না হয় তাঁরই অনুসন্ধান করুন।"

কুমার বল্লেন, "বেশ! মার যদি তাই মত হয়, করব। মা! তুমি কি বল?"

রাণী। "আচ্ছা কর"।

অরি। "বাবার ত অমত হবে না?"

রাণী। "না। আমি তাঁর মত জানি। তিনি বলেছেন, আমরা যখন কুমারের মনের মত পাত্রী ঠিক্ কত্তে পাল্লুম না, তখন কুমারই নিজে ঠিক করুক। আমাদের দু'জনারই ইচ্ছে, যেখানে হ'ক, বিবাহ ক'রে তুমি সংসারী হও। তুমি তোমাদের বংশের মর্য্যাদা ভেঙ্গে অপাত্রী মনোনীত কর্ব্বে না, এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা তোমার উপর ভার দিচ্চি।"

অরি। "আপনাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

সে দিন আর অন্য কথা হ'ল না।

২

রাজপুত্র অরি তাঁর সমবয়সীদের মধ্যে নানাবিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ত। এখন প্রধান আলোচনার বিষয় হ'ল অজানা দেশ। এত নিকটে, অথচ যেন পরলোকের মত অজানা, অদৃশ্য হ'য়ে রয়েছে, এ কেমন কথা! বনের ভিতর দিয়ে কোথাও কি পথ নাই? পাহাড় কি ভেদ করা যায় না? সে দেশে মানুষ থাক্‌লে তা'দেরও কি ইচ্ছা হয় না যে এদেশে আসে? দেশটা কি রকম? যদি সেদেশে লোকের বাস থাকে, তবে তা'র ভাষা, ধর্ম্ম কিরূপ? এই রকম সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা হ'ত। কেউ না দেখ্‌লেও, সে দেশে যে লোকের বাস আছে, তারা যে হিন্দু, তা'দের ভাষা যে শিলাগড়ের ভাষারই মত, কখনও কখনও, তার প্রমাণ পাওয়া যেত। দেওয়ালির দিন দেখা যেত, পাহাড়ের কোন কোন চূড়ায়, দীপের মত সার্ গাঁথা

আলো জ্বলচে। বড় বড় তারাবাজী, হাউই উঠ্চে। তাই দেখে লোকে অনুমান কর্‌ত, অজানা দেশের লোকেরা দেওয়ালির উৎসব কচ্চে। হিন্দু না হ'লে, প্রতি বৎসর, দেওয়ালির রাত্রে, এমন আলো, বাজী কেন হ'বে? পাহাড় ভেদ ক'রে উঁচু থেকে যে ঝরণাগুলো নাম্‌ত, তার জলে কখনও কখনও ফুল, তুলসীপাতা, বেলপাতা দেখা যেত; তাতে চন্দনের গন্ধ, সিন্দুরের দাগ থাক্‌ত। একবার একখানি ভূর্জ্জপত্র পাওয়া গিয়েছিল, তা'তে লাল কালিতে কারু জন্মতিথি, কোষ্ঠীর ফল লেখা ছিল। তা'র ভাষা শিলাগড়েরই ভাষার মত। এই সকল প্রমাণ পেয়ে রাজপুত্রের মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সে দেশে সভ্য মানুষের বাস আছে, সেটা রাক্ষসের বা ডাকিনীর দেশ নয়।

রাজপুত্রের আর কোন সখ্‌ ছিল না; ছিল কেবল শিকারের। শিকারে বেরুলে রোদ, বৃষ্টি, হিম কিছুই তিনি গ্রাহ্য কত্তেন না। তাঁর যেমন সাহস তেমনই শিকারে দক্ষতা ছিল। অপর সকলে হাতীর পিঠে চ'ড়ে বাঘ মার্‌ত। তিনি বাঘ দেখ্‌লে, হাতী থেকে নেমে, ঢাল, তলোয়ার নিয়ে, তার সাম্‌নে দাঁড়াতেন; দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাঘের রক্তাক্ত দেহ ভূমিতে লুটা'ত। দাঁতাল গুণ্ডা হাতীর শুঁড় তিনি দু'টুক্‌রা ক'রে কাট্‌তেন, আর হাতীটা গাঁ গাঁ কত্তে কত্তে ছুট্‌ত। তাঁকে নাড়াবার জন্য তার পা তোলাটা বৃথাই হ'ত। এতদিন তিনি অন্য বনে শিকার করেছিলেন; অজানা দেশের পাহাড়ের তলায় যে বন, তা'তে কখনও শিকার করেন নি। সেখানে নানারূপ বিপদের সম্ভাবনা আছে ভেবে রাজা তাঁ'কে সে বনে শিকারে যেতে অনুমতি দেন নি। রাজপুত্র, এইবার, অনেক উপরোধ, অনুরোধ করে, মা বাপের মত নিয়ে, সেই বনে শিকারে বেরুলেন। তাঁর জন্যে বনের স্থানে স্থানে বড় বড় তাঁবু পড়্‌ল; গাছ কেটে পথ তৈয়ার হ'ল। কিন্তু অত বড় বনের মধ্যে ক' যায়গায় তাঁবু পড়্‌বে, ক'টা পথ তৈয়ার হ'বে? তার উপর রাজপুত্র, যে স্থানটা যত

দুর্গম, যেখানে যত ভয়ঙ্কর জন্তু থাক্‌ত, সেখানে যেতে তত ভাল বাস্‌তেন। অনেকদিন তাঁর সঙ্গীরা পেছিয়ে পড়্‌ত; বনে বনে তাঁকে খুঁজে বেড়াত; সন্ধ্যার সময় তিনি, হয়ত, একটা প্রকাণ্ড হরিণের শিং, কি একটা বাঘের ছাল হাতে নিয়ে তাঁবুতে ফির্‌তেন। একদিন রাজপুত্র আর তাঁর সমবয়সীরা, মধ্যাহ্নে, একটা পাহাড়ে নদীতে স্নান কচ্ছিলেন। নদীটা অজানা দেশের পাহাড়ের একটা ঝরণা থেকে বেরিয়েছিল। তার জল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনই নির্ম্মল। সকলে, স্নান কত্তে কত্তে, অজানা দেশের কথা বলাবলি কচ্ছিলেন। কেউ বল্‌ছিলেন, "যে দেশের ঝর্‌ণার জল এত ঠাণ্ডা, এত মিষ্ট, সে দেশের রাজকন্যার স্বভাব না জানি কত ঠাণ্ডা, কত মিষ্ট"। এইরূপ রহস্যালাপ হচ্চে, এমন সময়, রাজপুত্রের এক সমবয়সী দেখ্‌তে পেলেন, এক ছড়া বেলফুলের মালা জলে ভেসে আস্‌চে। তিনি সাঁতার দিয়ে মালা ছড়াটী তুলে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বল্লেন;—"এই নাও, অজানা দেশের রাজকন্যা তোমার জন্যে এই মালা পাঠিয়েছেন।" রাজপুত্র মালাছড়াটী হাতে নিয়ে দেখ্‌লেন, বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গে গাঁথা। ফুলগুলি তখনও টাট্‌কা আছে; জলে পড়ে থাকায় শুকোয় নি, একটু বিবর্ণ হয়েছে মাত্র; কিন্তু তা'দের গন্ধ যায় নি। বোধ হল, পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যায়, আধফোটা ফুল তুলে, কেউ মালা গেঁথেছিল। রাত্রিতে ব্যবহারের পর জলে ফেলে দিয়েছে। রাজপুত্র আরও বুঝ্‌লেন, মালাটী কেউ গলায় পরে নি, মাথার চুলে পরেছিল। কারণ, মাথার একগাছি চুল মালার সঙ্গে জড়িয়েছিল; জলের ঢেউয়ে ছেড়ে যায় নি। রাজপুত্র চুলগাছি হাতে নিয়ে দেখ্‌লেন, সচরাচর তত বড় চুল দেখা যায় না, হাঁটুর নীচে পড়ে; যেমন কালো তেমনই কোমল, রেশমের সূতার মত। রাজপুত্রের সঙ্গীরা সেই চুল দেখে যাঁর চুল, তাঁর রূপ বর্ণনা আরম্ভ কল্লেন। তাঁর হরিণের মত চোক, চাঁপার কলির মত আঙ্গুল, স্থলপদ্মের মত পা ইত্যাদি যা'র যা' ইচ্ছা হ'ল, তিনি তাই বল্লেন। শেষে এই সিদ্ধান্ত হ'ল, যিনি এই মালা পরেছিলেন, যাঁর মাথার এই চুল, তিনি যদি

কুমারী আর রাজপুত্রের স্বজাতীয়া হন, তবে তিনি কুমারের পত্নী হ'বার যোগ্যা।

অজানা দেশ দেখ্‌বার জন্য রাজপুত্রের মনে পূর্ব্ব হ'তে যে ইচ্ছা ছিল, এই ঘটনার পর তা' শত গুণ বেড়ে উঠ্‌ল। তিনি ভাব্‌লেন, সত্যই কি বিধাতা অজানা দেশে আমার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী রেখেছেন? এই ফুল, এই চুল কি তাঁরই ইচ্ছায় এসেছে? বাবা, মা দু'জনেই ত অনুমতি দিয়েছেন; এখন যেমন করেই হ'ক, একবার, অজানা দেশ দেখ্‌তেই হ'বে।

(৩)

একদিন রাজপুত্র, অন্য দিনের চেয়ে মূল্যবান, সুন্দর পরিচ্ছদ পরে, নিজের উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রগুলি সঙ্গে নিয়ে, শিকারে বেরুলেন। রাজা, রাণী, তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে, তাঁকে যে সকল হীরা, মুক্তা দিয়ে আশীর্ব্বাদ কত্তেন, সেগুলি তাঁর নিজের কাছেই থাক্‌ত। কি জানি কি ভেবে, শিকারে আসবার সময়, তিনি তার মধ্যে গুটি কত বাছা বাছা হীরা, মুক্তা সঙ্গে এনেছিলেন। এই দিন তিনি সেগুলিও সঙ্গে নিলেন।

ইচ্ছা করেই, সে দিন, তিনি, তাঁর সঙ্গীদের ছেড়ে, একা বনের এক দুর্গম অংশে প্রবেশ কল্লেন। সে দিন তিনি শিকারের চেষ্টা একবারেই কল্লেন না; বনের ভিতর দিয়ে অজানা দেশে যা'বার কোন পথ আছে কিনা তা'রই অনুসন্ধান কত্তে লাগ্‌লেন। ঝোপের ভিতর, ঝরণার পাশে, কোথাও, কোনও গুহা আছে দেখ্‌লেই তিনি খুঁজ্‌তেন; কিন্তু কোথাও পথ পেলেন না। অজানা দেশ হ'তে অনেক ঝরণা নেমেছিল; কিন্তু সে গুলো এত ছোট, এত আঁকা বাঁকা যে তা'দের ভিতর দিয়ে জল আস্‌তে পার্‌ত কিন্তু মানুষ যেতে, আস্‌তে পার্‌ত না। খুঁজতে খুঁজতে দু'পর অতীত হল। তিনি একটী গাছের তলায় একখানি পাথরের উপর বস্‌লেন। বনফুলের গন্ধ নিয়ে বেশ ঝুর্ ঝুর্ করে বাতাস বচ্ছিল; শ্যামা, ভীমরাজ প্রভৃতি বনের পাখীরা গান কচ্ছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর শ্রান্তি দূর হ'ল। তিনি দেখ্‌তে পেলেন একটা মস্ত বানরী তার বাচ্ছাটীকে নিয়ে খেলা কচ্চে। সে রাজপুত্রকে দেখ্‌তে পায় নি; কখনও বাচ্ছাটীর মুখে মুখ দিয়ে, কখনও তার গায়ের উকুন বেচে, কখনও তাকে বুকে নিয়ে, এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে, আমোদ কচ্চে। খানিকক্ষণ পরে বানরী একটা ঝোপের ভিতর ঢুক্‌ল আর, একটু পরে, পাকা পেয়ারার মত হল্‌দে রঙের একটা ফল এনে বাচ্ছাটাকে দিল। বাচ্ছাটা, কিচ্‌ কিচ্‌ শব্দে তার আনন্দ জানিয়ে, ফলটা খেতে লাগ্‌ল। বানরী আবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে সেই রকম ফল, একটা হাতে করে, একটা মুখে করে, আন্‌ল। দু'জনেই ফল খাচ্ছে, এমন সময় রাজপুত্রের উপর তা'দের চোক্‌ পড়্‌ল; অম্‌নি চম্‌কে উঠে দুটোই বনের মধ্যে লুকুল।

রাজপুত্র, তখন, সেই ঝোপের কাছে গেলেন। যত্ন করে, গাছের ডালগুলি সরিয়ে, দেখ্‌লেন যে, সে রকম ফলের গাছ সেখানে নাই। তিনি ভাবলেন, বানরী তবে এ ফল কোথায় পেলে? ঝোপের ভিতর কি কোন সুড়ঙ্গ আছে? বানরী সেই সুড়ঙ্গ-পথে গিয়ে ওপার থেকে ফল এনেছে? এ ছাড়াত ফল পাবার কোন উপায় নাই। বানরী যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে ফল এনেছিল, তা'তে বোধ হয় সুড়ঙ্গটা তত লম্বা নয়। হয়ত পাহাড়টা এইখানে খুব অল্প চওড়া, তার ভিতরের সুড়ঙ্গটাও ছোট। তা'হলে সুড়ঙ্গ যদি মানুষ যাবার উপযুক্ত হয়, এই পথে অজানা দেশে প্রবেশ করা যেতে পারে। এইরূপ ভেবে তিনি ঝোপের ভিতর প্রবেশ কল্লেন; দেখ্‌লেন সত্য সত্যই তার ভিতর একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে। গোটাকত গাছের ডাল নুয়ে পড়েছে বলে সুড়ঙ্গের মুখ হঠাৎ দেখা যায় না, কিন্তু ডালগুলো সরালেই দিব্য সুড়ঙ্গ চোকে পড়ে। বানরেরা ফলের লোভে সর্ব্বদা যাতায়াত করে ব'লে সুড়ঙ্গটী বেশ পরিষ্কার; তার ভিতর যেন একটা মাড়ান পথের মত পড়েছে। অজানা দেশ দেখ্‌ব বলে রাজপুত্রের এমন আগ্রহ জন্মেছিল যে,

সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুক্‌লে কোন বিপদ হ'তে পারে, সে কথা তাঁর মনে স্থানই পেলেনা। তিনি ভাব্‌লেন, সুড়ঙ্গে কোন হিংস্র জন্তু কি সাপ নাই; থাক্‌লে বানরেরা যাতায়াত কর্‌তনা। ও পারে কি আছে কে জানে? শত্রুও হ'তে পারে, মিত্রও হ'তে পারে। তাঁর সঙ্গে বাছা বাছা অস্ত্র ছিল। তিনি ভাব্‌লেন, যদি শত্রুই হয়, দু'চার জনে সহজে কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। আর তা'রা শত্রুতা কল্লেও আমি ত কর্‌ব না, ভাষায় হ'ক, ইঙ্গিতে হ'ক, কোনরূপে তা'দের সঙ্গে সদ্ভাব করে নেব। নিতান্তই শত্রুতা করে, তখন বোঝা যাবে। আর যদি বিধাতা প্রসন্ন হন, তা' হলে যাঁর সেই চুল, যিনি সেই মালা পরে ছিলেন, হয়ত তাঁর সংবাদ পেতে পার্‌ব; বাবা, মার মনের সাধ পূর্ণ হবে। বিপদ্, আপদ যা'ই হ'ক্, একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তেই হবে। বিপদের সম্মুখীন না হ'য়ে পৃথিবীতে কে কবে সম্পদের অধিকারী হয়েছে?

তিনি সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। চার হাত পায়ে ভর ক'রে চল্লেন। একজন মানুষ এরূপ ভাবে বেশ যেতে পারে। সুড়ঙ্গটা নীচু থেকে ক্রমে উঁচুর দিকে চলেছে বলে বোধ হ'ল। প্রথমটা নিবিড় অন্ধকার, তার পর অল্প অল্প আলো দেখা গেল। ক্রমে ও পারের রৌদ্র তাঁর চোকে পড়্‌ল; নীচু থেকে মানুষের গলার স্বর তাঁর কাণে প্রবেশ কর্‌ল। যেন দু'জন লোক কথা কচ্চে। তা'দের ভাষা শিলাগড়েরই ভাষার মত। তাঁর বড় আনন্দ হ'ল। কিন্তু তিনি মনে কল্লেন, এমন সময় যা'ব না; ও পারে প্রহরী থাক্‌তে পারে; হঠাৎ তা'দের চোকে পড়ে একটা ঝগড়া বাধাবার প্রয়োজন নাই। সন্ধ্যার পর যখন একটু একটু অন্ধকার হবে তখন যাব। এই ভেবে তিনি আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। পাখীদের কলরবে আর বনের জন্তুদের গর্জ্জনে বন আকুলিত হয়ে উঠ্‌ল। পূব আকাশে চাঁদ দেখা দিল; লতা পাতার

ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো ঝোপের মুখে পড়্‌ল। রাজপুত্র সাহসে ভর ক'রে আবার সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুক্‌লেন। শিকারের বর্শাটা আগবাড়িয়ে দিতে দিতে চল্লেন, যদি রাত্রি ব'লে কোন জন্তু সুড়ঙ্গের ভিতর আসে, বর্শায় বিঁধ্‌বে। কিন্তু কোন জন্তু এলনা; দু'একটা চাম্‌চিকে, মাঝে মাঝে তাঁর গায়ের কাছ দিয়ে, কিচ্ কিচ্ কত্তে কত্তে উড়ে গেল মাত্র। একটু একটু করে তিনি সুড়ঙ্গের ওপারে এসে পড়লেন। সে পারে দেখ্‌লেন, খানিক দূর পর্য্যন্ত ছোট ছোট ঝোপ, তারপর দিব্য খোলা মাঠ। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ; তা'তে ফুল ফুটে চারদিক আমোদিত কচ্চে। তখন বেশ চাঁদ উঠেছিল; ধপধপে জ্যোৎস্নায় আকাশ, পৃথিবী সব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আকাশে মেঘ ছিল না; ধোঁয়া ছিল না; নক্ষত্রগুলি যেন হীরের মত জ্বল্ জ্বল্ কচ্ছিল। মধুর বাতাসে তাঁর শ্রম দূর হল। পাপিয়ার মত সুরে দু'একটা পাখী গাছের ডালে বসে গান কচ্ছিল। তিনি ভাব্‌লেন কি সুন্দর দেশ! এমন আকাশ, এমন বাতাস, এমন পাখীর গান ত আমাদের শিলাগড়ে নাই। তাঁর একটী বন্ধু কখনও কখনও ঠাট্টা করে বল্‌তেন, "শ্বশুরবাড়ীর সবই ভাল; কাকটাও কোকিল ব'লে বোধ হয়।" তিনি ভাব্‌লেন, এখানে শ্বশুরবাড়ী হবে বলেই যায়গাটা এত ভাল বোধ হচ্ছে নাকি?

কোথাও জনপ্রাণী ছিল না। দূরে একটা আলো দেখে রাজপুত্র সেই আলো লক্ষ্য করে চল্লেন। একটা ছোট পাহাড়ে নদী তর্ তর্ করে ছুটেছিল। রাজপুত্র খানিকদূর এগিয়ে দেখেন, তার ধারে এক প্রকাণ্ড পাথরের মন্দির; মন্দিরের দরজা খোলা; ভিতরে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, মন্দিরের প্রদীপে খানিকটা ঘি ঢেলে দিয়ে, দেবমূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করে, বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় রাজপুত্র গিয়ে সেখানে দাঁড়ালেন। চাঁদের আলো তাঁর মুখের উপর পড়্‌ল। বীরের মত মূর্ত্তি, বীরের মত পরিচ্ছদ, ধপধপে জ্যোৎস্নায় যেন তাঁকে দেবকুমারের মত

দেখাচ্ছিল। বৃদ্ধা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁকে দেখে রাজপুত্রেরও মনে ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল। বৃদ্ধার চাঁপাফুলের মত রঙ, মাথায় পাকা, সাদা চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে একটী পুষ্পপাত্র দেবতার প্রসাদী ফুল বেলপাতায় ভরা, পরিধানে একখানি সাদা গরদের কাপড়; দেখ্‌লেই শিবপূজার জন্য আগতা কোন ঋষিপত্নী বলে বোধ হয়। বৃদ্ধা কোন কথা বল্‌বার পূর্ব্বে রাজপুত্র, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, তাঁকে বল্লেন, "মা! আমি বিদেশী, রাত্রির জন্য আমাকে কি একটু আশ্রয় দিতে পারেন?" বৃদ্ধা অতি মিষ্টস্বরে বল্লেন; "বাবা! আমার বাড়ীতে এস, স্থান পাবে। বিদেশীর এ রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু তুমি যখন নিরাশ্রয়, আমি তোমাকে আশ্রয় দেব। আমার কল্যাণেশ্বর তোমাকে রক্ষা কর্ব্বেন।"

বৃদ্ধার বাড়ী অধিকদূর ছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'জনে সেখানে পঁহুছিলেন। চার দিকে ইটের প্রাচীরে ঘেরা একটী ছোট পাকা বাড়ী; বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। বৃদ্ধা ঘা দিলেই একটী স্ত্রীলোক এসে দরোজা খুলে দিলে। বৃদ্ধা বল্লেন, "অতিথি এসেছেন, সেবার আয়োজন কর।"

তৎক্ষণাৎ বাহিরের একটী ঘরে রাজপুত্রের জন্য একখানি গালিচা পাতা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সন্ধ্যাবন্দনার আসন, পা ধোবার জল দেওয়া হ'ল। বৃদ্ধা বল্লেন, "দেখ্‌চি তোমার সঙ্গে দ্বিতীয় পরিচ্ছদ নাই; কিছু দিন আগে আমার ঘরে তোমারি মত একটী অতিথি ছিল। এক বৎসর হ'ল সে নিজের দেশে চলে গিয়েছে। আমি তা'কে যে কাপড়, চোপড় দিয়ে ছিলুম, সে কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি; সমস্তই ফেলে রেখে গিয়েছে। ভাল ভাল নূতন কাপড় আছে, তোমার যা' ইচ্ছা হয়, ব্যবহার কর।"

বৃদ্ধা অতি ধীরভাবে এই কথাগুলি বল্লেন। কিন্তু রাজপুত্র বুঝ্‌লেন, তিনি যা'কে অতিথি বল্‌ছেন, তিনি প্রকৃত অতিথি ন'ন; তাঁর পুত্র।

অতিথিরূপে কিছুদিন তাঁর গৃহে বাস করে স্বস্থানে চলে গিয়েছেন। তিনি বল্লেন, "মা! আমি আপনার পুত্র, যা' বল্‌বেন, তা' কর্‌ব।"

হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, সন্ধ্যাবন্দনার পর, রাজপুত্র আহার কত্তে বস্‌লেন। নানাবিধ সুমিষ্ট ফল, ক্ষীর, ছানা, মাখন প্রভৃতি অতি উপাদেয় খাদ্য একখানি সাদা পাথরের থালায় সাজান ছিল। সমস্ত দিন বনে বনে অনাহারে ঘুরে তিনি ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন; অতি তৃপ্তির সঙ্গে আহার কল্লেন। বৃদ্ধা তখন বল্‌লেন, "তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও, কাল প্রাতে আমি তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইব। তুমি বিদেশী, এখানকার পথঘাট জান না, আমি না ওঠা পর্য্যন্ত কিছুতেই বাড়ী থেকে বেরিও না।"

বৃদ্ধা চলে গেলে রাজপুত্র আপনার অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিছানার কাছে সাজিয়ে রেখে, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়্‌লেন।

ভোর না হ'তেই রাজপুত্রের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি, হাত, মুখ ধুয়ে, ঘরে বসেছেন, এমন সময় শুন্‌তে পেলেন, দূর থেকে অতি মধুর বাজনার শব্দ আস্‌ছে। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগ্‌ল; সেই সঙ্গে লোকের কোলাহল, রথের চাকার ও ঘোড়ার পায়ের শব্দও শোনা গেল। ব্যাপার কি দেখ্‌বার জন্য তাঁর মনে বড় ইচ্ছা হ'ল; কিন্তু বৃদ্ধা তাঁকে বাড়ী থেকে বেরুতে নিষেধ করেছিলেন ব'লে তিনি ঘরেই রইলেন। বৃদ্ধা এই সময় সেখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "বাবা! তোমার কোন কষ্ট হয়নি ত? রাত্তিরেত ভাল ঘুম হয়ে ছিল?" রাজপুত্র তাঁকে প্রণাম করে বল্লেন;—"মা! আমি পরম সুখে ছিলুম, আমার কোন কষ্ট হয়নি, বেশ সুনিদ্রা হয়েছিল।" বৃদ্ধা বল্লেন; "আজ আমাদের রাজকুমারীর জন্মতিথি; যে মন্দিরে তোমার সঙ্গে কাল আমার দেখা হ'য়েছিল, সেই মন্দিরে আজ তিনি পূজা দিতে আস্‌বেন। এই মন্দিরটাই আমাদের রাজ্যের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরে পূজা না দিয়ে এ দেশের কোন লোক কোন শুভ কর্ম্ম করেন না। আমার শ্বশুর,

আমার স্বামী এই মন্দিরের পূজারি ছিলেন। তাঁদের পর আমি এর ভার পেয়েছি; লোক রেখে পূজা করাই। আমাকে এখনই মন্দিরে যেতে হ'বে। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমার সঙ্গে যেতে পার। কত হাতী, ঘোড়া, লোক জন, সমারোহ দেখ্‌তে পাবে; আর সেই সঙ্গে আমাদের রাজকুমারীকেও দেখ্‌বে। রূপে, গুণে এমন মেয়ে এ পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। সঙ্গীতে, শিল্পে, শাস্ত্রে, সকল বিষয়েই সমান দক্ষ। স্বর্গীয় মহারাজ যেমন অগাধ গুণে ভূষিত ছিলেন, মেয়েটীও তেমনি হয়েছেন। আজ তাঁ'র জন্মতিথি; প্রজারা তাঁকে নানারূপ উপহার দেবে। সকলেই আজ তাঁকে দেখ্‌তে পারে, কোন বাধা নাই।

রাজপুত্র ভাব্‌লেন, এ বিধাতারই অনুগ্রহ। যাঁকে দেখ্‌বেন ব'লে তাঁর এত ইচ্ছা, যাঁর জন্যে তিনি এত কষ্ট স্বীকার করে অজানা দেশে এসেছেন, এত সহজে যে তাঁকে দেখ্‌বার সুযোগ হ'বে, তা' তাঁর আশা ছিল না। তিনি বল্লেন; "মা! যখন আপনার এই অভিপ্রায়, তখন যেতে আমার আপত্তি নাই; চলুন।"

দু'জনে মন্দিরের দিকে চল্লেন। পূর্ব্বরাত্রে, চন্দ্রালোকে, দেশটী যত সুন্দর বলে রাজপুত্রের বোধ হয়েছিল, দিবালোক যেন তা'রও অপেক্ষা অধিক সুন্দর বোধ হ'ল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়; লতায়, পাতায়, ফুলে সাজান। পাহাড়ের চূড়ায় এক একটী ছোট মন্দির, তা'হতে মধুর বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। পাহাড়ের নীচেই দূর্ব্বাঘাসে ঢাকা মাঠ; তার সবুজ রঙে চক্ষু জুড়ায়। মাঠের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে নদীগুলি কুল্‌ কুল্‌ কুল্‌ কুল্‌ গান কত্তে কত্তে চলে ছিল। নদীতীরে, পাহাড়ের সর্ব্বাঙ্গে রঙ বেরঙএর এত ফুল ফুটে ছিল যে, দেখ্‌লে, চক্ষু ফিরাতে ইচ্ছা হয় না। প্রভাতের সুস্নিগ্ধ বায়ুতে ফুলের গন্ধ চার দিকে যেন উথ্‌লে উঠ্‌ছিল। নানা বর্ণের শত শত প্রজাপতি সূর্য্যালোকে উড়্‌ছিল, পড়্‌ছিল, যেন তা'দের স্ফূর্ত্তির সীমা নাই, শেষ নাই। গাছের ডালে বসে

পাখীরা প্রভাতী গান গাচ্ছিল। রাজপুত্র দেখে, শুনে আনন্দে বিভোর হলেন। লোকের আকৃতি, প্রকৃতি শিলাগড়েরই মত বোধ হ'ল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, নদীতে স্নান ক'রে, সেইরূপই মন্ত্র পাঠ কত্তে কত্তে, গৃহে চলেছিলেন; রাখালবালক, গবীবৎস নিয়ে, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায়, সেইরূপই মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল; গৃহস্থের বধূরা, তৈল হরিদ্রা মেখে, সেইরূপই সরোবরে স্নান কত্তে যাচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন সকলই ত শিলাগড়ের মত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে একটা পাহাড়ের ব্যবধান এমন দেশকে ডাকিনীর রাজ্য করে তুলেছিল।

তাঁদের মন্দিরে পহুঁছিবার পূর্ব্বেই মন্দিরের সম্মুখের মাঠ হাতী, ঘোড়া, লোকে ভরে গিয়েছিল। হাজার হাজার লোক, "জয় রাজকুমারীর জয়", "জয় রাজকুমারীর জয়" বলে সেখানে আনন্দধ্বনি কচ্ছিল। রাজপুত্র পূজারিণীর পুত্রের পরিচ্ছদে সেইদেশেরই লোকের মত দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর সুন্দর, বলিষ্ঠ মূর্ত্তির দিকে সকলেরই চোক পড়্‌ল। সৌন্দর্য্যে প্রীত, সৌন্দর্য্যে কৌতূহলী না হয় কে? অনেকেই জিজ্ঞাসা কল্লেন, "অই যুবাপুরুষটী কে?" তিনি পূজারিণীর আত্মীয় শুনে কেউ আর কিছু বল্লেন না। প্রহরীরা তাঁকে মন্দিরের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে অনুমতি দিল।

ক্রমে রাজকন্যার রথ দেখা গেল। আগে একদল হাতী, তা'দের গলায় বড় বড় রূপার ঘণ্টা বাঁধা; পিঠে জরীর কাজ করা হাওদা; তা'তে রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা বসেছিলেন। তাঁ'দের পিছনে একদল ঘোড়া, মনোহর সাজ পরা; পিঠের উপর বড় বড় যোদ্ধাদের নিয়ে চলেছিল। তারই পরে একখানি সুসজ্জিত রথ; তার চূড়া থেকে পতাকা উড়্‌ছিল; সোনার কলসগুলির উপর সূর্য্যের কিরণ পড়ে ঝক্‌মক্ কচ্ছিল। চারটী সাদা পাহাড়ে ঘোড়া, হীরে মুক্তোয় সাজান, ঘাড় বাঁকিয়ে, কেশর ফুলিয়ে, যেন আহ্লাদে নাচ্‌তে নাচ্‌তে রথ টান্‌ছিল। রথের মাঝে একখানি সুসজ্জিত সিংহাসন; রাজকন্যা সেই সিংহাসনে বসেছিলেন। দু'টী সুন্দরী

মেয়ে চামর নিয়ে তাঁকে ব্যজন কচ্ছিল। রথ অতি ধীরে ধীরে চল্‌ছিল। রাজকন্যার সখীরা আর রাজবাড়ীর মেয়েরা, কারু হাতে জলের ঝারি, কারু হাতে শাঁক, কারু হাতে ফুলের সাজী, রথের আগে পিছে, রাজকুমারীর মঙ্গলের জন্য, কল্যাণেশ্বরের এই বন্দনা গান কত্তে কত্তে আসছিলেন।

"জয় জয় ত্রিপুরারি!
জয় ত্রিনেত্রধারক ত্রিতাপহারক!
ত্রিভুবন-সংহার-কারী।
জয় বিভূতিভূষণ! ভালে হুতাশন,
শির-ধৃত জাহ্নবী-বারি;
আপন ধ্যানে অপগত জ্ঞানে
অনুদিন শ্মশানচারী।
কণ্ঠে ফণিমাল, শিরে জটাজাল,
ত্রিশূল-ডম্বরুধারী;
কল্যাণ-ঈশ্বর! বাঞ্ছা পূরণ কর;
জয় জয় সঙ্কটহারী।

প্রজারা, রাস্তার দু'ধারে, সার দিয়ে দাঁড়িয়ে, জয়ধ্বনি কচ্ছিল, আর রাশ রাশ ফুল রথের সাম্‌নে ছড়াচ্ছিল। রাজকুমারী, মাথা নুঁইয়ে, সকলকে নমস্কার কচ্ছিলেন। পথের ভিক্ষুকও তাঁর নমস্কার হ'তে বঞ্চিত হচ্ছিল না। আজ সকলেরই তাঁর নিকটে আস্‌বার অনুমতি ছিল। এক সন্ন্যাসী এসে তাঁর অঙ্গে কমণ্ডলু থেকে জলের ছিটা দিলেন; এক কৃষক তার উদ্যানজাত ফুল এনে তাঁর রথের উপর ঢেলে দিল; এক সধবা ব্রাহ্মণী, রথে চড়ে, তাঁর কপালে চন্দনের টিপ দিলেন। রাজকুমারী সহাস্যবদনে সকলকেই সম্ভাষণ করে পরিতুষ্ট কল্লেন। কোষাধ্যক্ষের স্বর্ণমুষ্টিতে জয়ধ্বনি দ্বিগুণিত হ'ল।

এত ঐশ্বর্য্যের, এত আড়ম্বরের মধ্যে, কিন্তু, রাজকন্যার বেশভূষা ছিল অতি সাধারণ। তাঁর কপালে চন্দনের রেখা, গলায় বেলফুলের মালা, পরিধান টুকটুকে লাল রঙের একখানি রেশমী কাপড়। অলঙ্কারের মধ্যে গলায় একটী হীরার কণ্ঠী, কাণে দু'টী মুক্তার দুল, হাতে দু'গাছি হীরার বালা। কিন্তু এম্‌নি তাঁর অঙ্গের জ্যোতি, মুখের এম্‌নি লাবণ্য, এম্‌নি সমুজ্জ্বল ভাব যে, তিনি যেন কতই গয়না পরেছেন বলে বোধ হচ্ছিল। রথ মন্দিরের উঠানে এসে থাম্‌লে রাজকুমারী নেমে সিঁড়িতে উঠ্‌লেন। রাজপুত্র দরোজার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন; অন্য শত শত লোকের ন্যায় রাজকুমারীরও দৃষ্টি তাঁর উপর পড়্‌ল। দু'জনাই দু'জনকে দেখে ভাবলেন, "কি সুন্দর! বিধাতার সৃষ্টিতে এমন সুন্দর কিছু ছিল, আগে ত জানি নাই।" রাজকন্যা, মাথা নীচু করে, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কল্লেন।

পূজা, প্রদক্ষিণ সব শেষ হ'ল। রাজকন্যা বিদায় নেবার পূর্ব্বে পূজারিণীকে প্রণাম কল্লে তিনি বল্লেন;—"রাজকুমারি! কল্যাণেশ্বর কাল আমাকে স্বপ্নে বলেছেন, আপনার বিবাহ নিকটবর্ত্তী। আমি মানৎ করেছি, বিবাহের কথা স্থির হলে, প্রভুকে শতকুম্ভ দুগ্ধে স্নান করাব, আর একশত সোণার বিল্বপত্র দেব। আপনাকে পূর্ব্বে জানিয়ে রাখ্‌লুম।" রাজকন্যা কোন উত্তর দিলেন না; পূজারিণী বুঝ্‌লেন, মৌনই তাঁর সম্মতির লক্ষণ।

রাজকন্যা চলে যাবার একটু পরেই তাঁর এক সখী এসে পূজারিণীকে, অন্তরালে ডেকে, জিজ্ঞাসা কল্লে, "মন্দিরের দরোজায় অই যে যুবাপুরুষটী দাঁড়িয়ে আছেন, উনি কে?" পূজারিণী তখনও রাজপুত্রের পরিচয় পান নি; তিনি বল্লেন, "আমি রাজবাড়ীতে নিজে গিয়ে তাঁর পরিচয় দেব।"

৪

রাজপুত্র পূজারিণীর বাড়ীতে ফিরে এলেন। হাতী, ঘোড়া, লোক জনের সমারোহ তিনি অনেক দেখেছিলেন; সে সব তাঁর মনে স্থান

পায়নি ; কিন্তু তা'দের মধ্যে তিনি যে দেবীমূর্ত্তিটী দেখেছিলেন, সেইটী তাঁর মন একবারে অধিকার করে বসেছিল। তিনি ভাব্‌ছিলেন, কি প্রশান্ত, পবিত্র কান্তি! গর্ব্ব নাই, চাঞ্চল্য নাই, উগ্রতা নাই ; পথের ভিক্ষুককেও মাথা নুইয়ে নমস্কার কচ্চেন! আজ তাঁর জন্মতিথি বলে কত লোক তাঁকে কত প্রার্থনা জানাচ্ছিল ; একটু মাত্র বিরক্তি বোধ না করে সকলকেই সুমিষ্ট কথায় তৃপ্ত কচ্ছিলেন ; যেন মাধুর্য্যে ভরা। পূজা'র সময় কল্যাণেশ্বরের কি সুন্দর স্তব পাঠ কল্লেনই! কি ভক্তি! কি মধুর কণ্ঠ! কি বিশুদ্ধ উচ্চারণ! ভাব, ভঙ্গী, দৃষ্টি এমন মধুর ত অপর কোন নারীর কখনও দেখি নাই। একবার মাত্র তাঁর সঙ্গে চোকোচোকি হয়েছিল ; লজ্জায় ভাল করে দেখ্‌তেও পারি নি। তবু সেই মনোহর রূপ, এখনও, যেন চোকের সাম্‌নে ভাস্‌ছিল। রাজপুত্রের মনে হ'ল, অজানা দেশে এসে ভালই করেছি; এঁকে যদি লাভ করতে পারি, বাবা, মা কত সুখী হ'বেন ; আর আমি নিজে পৃথিবীতে স্বর্গ-সুখের অধিকারী হ'ব। এঁকে পা'বার জন্য কোন ক্লেশই ক্লেশ বলে জ্ঞান হ'বে না।

তিনি স্নানাহার করে বিশ্রাম কল্লে পূজারিণী এসে তাঁর কাছে বস্‌লেন। "রাজকুমারীকে কেমন দেখ্‌লে?" এই কথা জিজ্ঞাসা করায় রাজপুত্র তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জান্‌বার সুযোগ পেলেন। শুন্‌লেন যে, ইনিই এখন এই রাজ্যের অধিকারিণী। তাঁর পিতা মৃত্যুকালে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন; সেই অনুসারে তিনি বিবাহার্থীকে অতি কঠোর পরীক্ষা করেন। এ পর্য্যন্ত কেউ সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি ; কাজেই, তিনি এখনও অবিবাহিতা আছেন।

রাজপুত্র বল্লেন ;—"মন্দির থেকে আস্‌বার সময় আমি একটী অদ্ভুত দৃশ্য দেখ্‌লুম। মাঠে চাষারা জমী চষ্‌চে ; কিন্তু কারও, কারও, দুটা বলদের স্থলে, দেখ্‌লুম একটা মানুষ আর একটা বলদ। এর অর্থ কি?"

পূজারিণী। "রাজকন্যাই এই অদ্ভুত দৃশ্যের মূলে। তাঁর রূপগুণের

কথা শুনে এত লোক এসে সর্ব্বদা তাঁকে বিরক্ত কর্‌ত যে, তিনি, মন্ত্রীদের অনুরোধে, আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন, বিবাহার্থী যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হন, তবে তাঁকে বলদের মত, এক বৎসর কাল, লাঙ্গল টান্‌তে হবে। তুমি মাঠে যা'দিগকে লাঙ্গল টান্‌তে দেখেছ, তারা সকলেই বড় ঘরের ছেলে; বিদ্বান, বলবান্, রূপবান্; রাজকন্যাকে বিবাহ কর্‌বে বলে এসেছিল; এখন তা'দের এই দুর্দ্দশা হয়েছে। এতে রাজকন্যার কিন্তু দোষ নাই; আত্মরক্ষার জন্যই তিনি এই আদেশ দিয়েছেন। তবুও লোকে ছাড়ে না; এখনও, মাঝে মাঝে, অযোগ্য ব্যক্তিরা বিবাহার্থী হয়।"

রাজপুত্র। "তিনি কিরূপ পরীক্ষা করেন?"

পূজারিণী। "তা'র কিছু নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। তবে সকল পরীক্ষারই উদ্দেশ্য, সর্ব্বগুণান্বিত পাত্র নির্ব্বাচন। কা'র শরীরে কেমন বল, কে কেমন অস্ত্রচালনায় নিপুণ, কা'র বুদ্ধি কিরূপ তীক্ষ্ণ, কে কেমন উদার, ধর্ম্মানুরাগী, এইগুলি বুঝ্‌বার জন্য নানারূপ পরীক্ষা করা হয়। তীর ছোড়া, হাতী, ঘোড়া, রথ চালান, বড় বড় পালোয়ানের সঙ্গে লড়াই, সুচতুর সভাসদগণের এবং রাজবংশের গুরু পুরোহিতের সঙ্গে তর্ক, বিতর্ক—কত রকম পরীক্ষার কথা যে রাজকন্যার মনে ওঠে, তা কেউ বল্‌তে পারে না। কা'রও কা'রও পরীক্ষা দু'তিন দিন ধরে চল্‌তে থাকে। মাঝে মাঝে কেউ, হয়ত, দু'একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়; কিন্তু যেরূপ কঠোর পরীক্ষা তা'তে কেউ যে কখন তাঁর সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, আমাদের ত সে ভরসা হয় না। তবে কল্যাণেশ্বরের কৃপায় সবই হ'তে পারে। রাজকন্যা কায়মনোবাক্যে তাঁর পূজা করে আস্‌ছেন; তিনি রাজকন্যার উপযুক্ত, সর্ব্বগুণান্বিত পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন। তোমাকে ত আমি আমাদের রাজকন্যার সম্বন্ধে অনেক কথা বল্লুম। এখন তোমার পরিচয়টা আমায় দাও দেখি। তোমার চেহারা দেখে, তোমার ব্যবহার দেখে আমার মনে হচ্চে, তুমি সামান্য ঘরের ছেলে নও। এ দেশে বিদেশীর আসা নিষেধ; তুমি কেন এদেশে এসেছ?"

রাজপুত্র। "আমি আপনাকে মা বলেছি; আপনার কাছে কিছু গোপন কর্‌ব না। আমি আপনাদের রাজকন্যার বিবাহার্থী হয়েই এদেশে এসেছি। আপনাদের রাজ্যের সীমা এই পাহাড়ের পরেই আমার পিতার রাজ্য; আমি তাঁর একমাত্র পুত্র।

পূজারিণী। "সে রাজ্যের সঙ্গে ত এ রাজ্যের কোনও রূপ সম্বন্ধ নাই। উভয় রাজ্যের লোকের ত কখনও দেখা হয় না। তবে তুমি আমাদের রাজকন্যার কথা কিরূপে জান্‌লে?"

রাজপুত্র। "আমি ঠিক কিছু জান্‌তে পারিনে। তবে আমার মনে কেমন একটা ধারণা জন্মেছিল যে, এদেশে আমার উপযুক্ত পাত্রী আছে। তার উপর এদেশ থেকে যে সকল ঝরণা আমাদের দেশে গিয়ে পড়েছে, তার একটাতে, একদিন, একছড়া বেলফুলের মালা পেয়েছিলুম। মালা ছড়াতে একগাছি চুল জড়ান ছিল; অত বড় চুল সচরাচর দেখা যায় না। আমার মনে হয়েছিল, সেই চুল আর সেই মালা আপনাদের রাজকন্যার।"

পূজা। "তোমার অনুমান অসঙ্গত হয় নি। রাজকন্যার মাথার চুল প্রকৃতই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে; আর সত্যই তিনি বেলফুল ভালবাসেন। আচ্ছা! চুল আর মালা ত পেলে; কিন্তু তুমি এলে কি করে?"

রাজ। "আমি পাহাড়ের ভিতর একটা দুর্গম সুড়ঙ্গ পেয়ে সন্ধ্যার পর সেই পথে এসেছি।"

পূজা। "তুমি অসম সাহসের কাজ করেছ। রক্ষা যে সান্ত্রীরা তোমায় দেখতে পায় নি; দেখ্‌তে পেলে তোমার প্রাণ যেত। রাজকন্যার বিবাহার্থী ভিন্ন অপর বিদেশীর পক্ষে এদেশে আসা নিষিদ্ধ। কিন্তু তুমি যে ভাবে এসেছিলে, তা'তে, তুমি যে বিবাহার্থী তা' জান্‌বার পূর্ব্বে, তারা তোমাকে দেখ্‌বামাত্র আক্রমণ কত্তো। যা'হক্‌ কল্যাণেশ্বরের কৃপায় যে কোন বিপদ হয় নি সেই ভাল। সন্ধ্যার পর এসে ভালই করেছ। দিনের বেলা এলে তা'দের চোখে পড়্‌তেই পড়্‌তে।"

রাজ। "আপনি বল্লেন যে রাজকন্যার বিবাহার্থী ভিন্ন অপর বিদেশীর এদেশে আসা নিষিদ্ধ। বিবাহার্থীদের সম্বন্ধে নিষেধ নাই কেন?"

পূজা। "এদেশে যদি রাজকন্যার উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া যায়, আর বিদেশীর আসা যদি নিষিদ্ধ হয় তা'হলে ত তাঁকে, চিরদিন, অবিবাহিতা থাকতে হ'বে। সেই জন্যই স্বর্গীয় মহারাজ বিদেশী বিবাহার্থীদের সম্বন্ধে ভিন্ন আদেশ দিয়ে গিয়েছেন; প্রজারাও তা' অনুমোদন করেছে।

রাজ। কখনও কোন বিদেশী কি এদেশে এসেছে?

পূজা। না! এর চারদিক পাহাড়ে ঘেরা, কেমন করে আসবে? তুমি বিদেশী হ'লেও যে বিবাহার্থী এটা মঙ্গলের কথা। নচেৎ তোমাকে আর তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি বলে আমাকেও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হ'ত। তুমি ত সমস্ত শুনলে; এখন পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ কি? যদি কৃতকার্য্য না হও তোমাকে কি দারুণ কষ্ট পেতে হবে সেটা ভেবে দেখ।"

রাজ। "কল্যাণেশ্বরের কৃপায় আমি অকৃতকার্য্য হ'ব না। আপনার যদি অনুমতি হয় আমি কালই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উপস্থিত হই।"

পূজা। "কাল নয়, তোমার পরিচয় দেবার জন্য আমার রাজবাড়ীতে যা'বার কথা আছে। আমি সেখান থেকে ফিরে আসি, তার পর যা'বে। রাজকন্যার মনের ভাব বুঝে কাজ কল্লেই ভাল হয়।"

রাজ। "আপনি ঠিক বিবেচনা করেছেন। এর মধ্যে আমিও প্রস্তুত হই। রাজকন্যার বিবাহার্থী হলে তাঁর মর্য্যাদার উপযুক্ত যান, বাহন, পরিচ্ছদ আবশ্যক। লঘুভার বলে আমি কয়েকখানি মূল্যবান্ হীরা সঙ্গে এনেছি। হীরার আদর সর্ব্বত্র। আপনি তার মধ্যে একখানি হীরা কোন বিশ্বাসী জহুরীকে বিক্রী করে এদেশের প্রচলিত মুদ্রা আমায় এনে দিন। আমি নিজের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রস্তুত করাই। কয়খানি হীরাতে আমার জন্য অলঙ্কারও প্রস্তুত কত্তে আদেশ দিন।"

পূজা। "হীরা বিক্রয় করা বা অলঙ্কার প্রস্তুত করা আমার পক্ষে

কষ্টকর হ'বেনা। অনেকেই কল্যাণেশ্বরকে রত্ন-অলঙ্কার দেন; সময়ে সময়ে আমাকেই অলঙ্কার প্রস্তুত করার ভার নিতে হয়; ভগ্ন অলঙ্কারও সংস্কার করাতে হয়। সেইজন্য অনেক জহুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি সহজেই হীরা বিক্রী করতে এবং অলঙ্কার প্রস্তুত করাতে পারব।"

রাজপুত্র যে হীরাগুলি সঙ্গে এনেছিলেন, তার মধ্যে একখানি পূজারিণীর হস্তে দিয়ে বল্লেন;—"বিবাহার্থী হলে কোনও উপহার দিতে হয় কি?"

পূজা। "কিছুমাত্র না। দীন,দুঃখী যে কেউ বিবাহার্থী হ'তে পারে। কিছুই দিতে হয়না; তা'তেই এত লোক আগে বিবাহার্থী হত; ভাব্‌তো না পার্‌লে ত কোন ক্ষতি নাই, একবার পরীক্ষা দিয়ে দেখিনা। রাজ-বাড়ীর দরোজায় একটী সোণার ঘণ্টা বাঁধা আছে। গিয়ে সেইটী নাড়্‌তে হয়, তখনই পরীক্ষার আয়োজন হয়। কা'র পরীক্ষা কিরূপ হ'বে তা' কেউ বল্‌তে পারে না। তোমাকে দেখে আমার মায়া জন্মেছে; সেই জন্য বল্‌চি বুঝে সুঝে কাজ কর। কেন বৃথা কষ্ট পাবে? মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে যাও।"

রাজপুত্র সহাস্যমুখে বল্লেন;—"আপনি চিন্তিত হ'বেন না। চেষ্টা মানুষের হাত, ফলাফল ঈশ্বরের হাত। মানুষের সুখ, দুঃখত জানি, বলদের সুখ দুঃখটা কেমন একবার দেখি না।"

বৃদ্ধা বল্লেন, "আচ্ছা দেখ।"

অপরাহ্ণে পূজারিণী রাজকুমারকে হীরকের মূল্য এনে দিলে তিনি, পরদিন, নিজের মনোমত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা'লেন। অশ্ববিক্রেতার নিকট হ'তে তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বটী ক্রয় করে আন্‌লেন; অশ্বের পরিচর্য্যার জন্য ভৃত্য এবং আপনার শরীররক্ষক ও পতাকাধারী অনুচর নিযুক্ত কল্লেন। এইরূপে তিনি রাজপ্রাসাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

এদিকে রাজকুমারকে দেখে অবধি রাজকন্যার মনে হচ্ছিল, ইনিই

আমার উপযুক্ত পাত্র। কল্যাণেশ্বর পূজারিণীকে পূর্ব্বরাত্রিতে স্বপ্ন দিয়েছেন শুনে তাঁর এই ধারণা আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল। তাঁর মনের ভাব বুঝে তাঁর এক সখী বল্লে;—"যদি এঁকেই আপনি উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করেন, তবে আর অত পরীক্ষা কেন? আত্মীয় কুটুম্ব, প্রজা সকলেই আপনার বিবাহের জন্য উৎসুক। আপনি যদি কা'কেও নিজের উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করেন, কেউ তাঁকে অনুপযুক্ত মনে কর্ব্বেন না। বিশেষতঃ সেই যুবা পুরুষকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেককেই আমি বল্‌তে শুনেছি যে, আমাদের রাজকন্যার যদি এইরূপ একটী বর হয়, বড় সুখের হয়। আপনি যদি আপনার অভ্যাস মত কঠোর পরীক্ষা করেন, তবে উনি উত্তীর্ণ না হ'তেও পারেন। আপনি রাজ্যের অধীশ্বরী; পরীক্ষা করা না করা আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি বলুন, 'এই পাত্র আমার উপযুক্ত,' প্রজারা আনন্দে তাঁকে রাজা বলে মেনে নেবে। এক সপ্তাহের মধ্যে বিবাহ আর অভিষেক দুই হবে। আর তা' যদি না করেন, চিরদিন, আপনাকে আইবড় থাক্‌তে হবে।"

রাজকন্যা বল্লেন;—"প্রভুর যদি সেই ইচ্ছা হয়, তা'তে ক্ষোভ কি? বিনা পরীক্ষায় আমি কা'কেও পতিরূপে বরণ কর্ত্তে পার্‌ব না। তা'হলে আমার পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা হবে।"

৫

যথাসময়ে পূজারিণী রাজবাড়ীতে গেলেন। রাজকন্যার সখীরা এসে তাঁকে নানারূপ প্রশ্ন কর্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি যা' যা' জান্‌তেন, সমস্ত বলে শেষে বল্লেন, "রাজকুমারি! আমার বিশ্বাস হচ্ছে, এই বিদেশী রাজপুত্রই আপনার উপযুক্ত পাত্র। রূপে, বংশমর্য্যাদায়, সুশীলতায় আপনি এঁর চেয়ে সুপাত্র পা'বেন না। আপনি এঁকেই পতি নির্ব্বাচন করুন। কেউ আপনার কার্য্যের প্রতিবাদ কর্ব্বে না। প্রজারা আপনার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। আপনার কঠোর পরীক্ষা-প্রণালী দেখে তারা সন্দেহ

করে যে, আপনার বিবাহ কত্তে ইচ্ছা নাই। তাঁরা ভাবে আপনি যদি বিবাহ্ না করেন, আপনার যদি সন্তান না হয়, কে তা'দের রাজা হ'বে? এই যুবা পুরুষকে বরণ করে আপনি সকলকে সুখী করুন। আর যদি পরীক্ষা করাই অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করেন, তবে এরূপ পরীক্ষা করুন যা'তে তিনি উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। এক সঙ্গে বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, রূপ, সকল গুণ যদি সমান চান, তা' কেমন করে মিল্‌বে?"

রাজকুমারী অধিক বাদানুবাদ কল্লেন না। কেবল বল্লেন;—"আমার পিতার আদেশ লঙ্ঘন কত্তে পার্‌ব না; বিনা পরীক্ষায় স্বর্গের দেবতাকেও আমি বরণ কর্‌ব না। আর সহজ পরীক্ষার কথা যা' বল্‌চেন, তা'ও হ'বে না। আমি চিরদিন যা' করে আস্‌চি, তা'ই কর্‌ব। কারুর প্রতি আমার নিজের মনের যদি একটু টান হয়, আমি তাঁকে বরং একটু কঠোর পরীক্ষা করি। কারণ তা' হলেই আমার পিতার আদেশ প্রকৃত পালন হয়। যিনি সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁর প্রতি কখনই শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না।"

রাজকন্যা এমন স্থির, ধীর ভাবে এই সকল কথা বল্লেন যে, শুনে, কেউ আর কোন কথা বল্‌তে সাহস কল্লেন না।

পূজারিণী ফিরে এসে রাজপুত্রকে সমস্ত কথা জানিয়ে বল্লেন; "বাবা! আমি রাজকন্যার সখীদের কাছে শুনেছি যে, মন্দিরে তোমাকে দেখে অবধি, তোমার প্রতি তাঁর একটু মনের টান জন্মেছে। তুমি কে, কোথা থেকে কবে এসেছ, এই সকল অনুসন্ধান নেবার জন্যে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের প্রতি আদেশ দিয়েছেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কত্তে যাব বলায় তিনি উৎসুক হয়েছিলেন। এই সকল কথা শুনে আমার মনে হচ্চে তোমার পরীক্ষাটা কঠোর হ'বে। তা' হ'ক; আমার বিশ্বাস কল্যাণেশ্বরের কৃপায় তুমি কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌বে। আমি তোমার জন্যে তাঁর পূজা মানৎ করে রেখেছি।"

এইরূপে সপ্তাহকাল গত হ'ল। রাজপুত্র সেই সময়ের মধ্যে রাজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা পূজারিণীর নিকট হ'তে জেনে নিলেন। রাজ্যের আয়, ব্যয়, লোকসংখ্যা, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ের সঙ্গে প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীদের দোষগুণ, রাজকুমারীর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের পরিচয়, এমন কি তাঁর প্রিয় হাতী ঘোড়াটীর নাম পর্য্যন্ত শিখে নিলেন। পূজারিণী অতি বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর স্বয়ং দিতে পা'র্‌লেন। কোন কোন বিষয় অপরের নিকট জেনে বল্লেন। রাজপুত্র একদিন সেখানকার প্রধান চতুষ্পাঠীতে গিয়ে কি কি শাস্ত্রের আলোচনা হয়, একদিন নগরের মল্লশালায় গিয়ে সেখানকার মল্লদের যুদ্ধ-প্রণালী কিরূপ জেনে এলেন। কথায় কথায় একদিন তিনি পূজারিণীকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "আপনাদের দেশের সঙ্গে অপর দেশের লোকের যে সাক্ষাৎকার বা সম্বন্ধ নাই, তা'তে কি কেউ অসুবিধা বোধ করেন না ?"

পূজারিণী বল্লেন ;—"অনেকেই বোধ করেন। তবে কতকগুলি লোক আছেন, যাঁরা ভাল, মন্দ সকল প্রকার পরিবর্ত্তনেরই বিরোধী। তাঁরা বলেন, 'যা আছে তা'ই ভাল"। এঁদের জন্যে রাজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত হচ্চে। রাজকন্যার পিতা স্বর্গীয় মহারাজ সদানন্দ সিংহ পাহাড় ভেঙ্গে রাস্তা কর্‌বার সঙ্কল্প করেছিলেন ; সমস্ত আয়োজন হয়েছিল ; কিন্তু তাঁর অকাল-মৃত্যুতে আরম্ভ হয়েই কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

রাজপুত্র। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, বহুদিন পূর্ব্বে, শিলাগড়ের সঙ্গে এ রাজ্যের সম্বন্ধ ছিল। ভূমিকম্পে পাহাড় ভেঙ্গে পথ বন্ধ হওয়ায় উভয় রাজ্যের সম্বন্ধ লোপ পেয়েছে। আপনাদের দেশে কি সেরূপ কোন প্রবাদ আছে ?"

পূজারিণী। "খুবই আছে। তার সঙ্গে আরও প্রবাদ আছে যে, দুই দেশের রাজকুমার ও রাজকুমারীর বিবাহ হলে, পূর্ব্ব সম্বন্ধ আবার স্থাপিত

হ'বে। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে প্রবাদটা এবার সত্যে পরিণত হবে।"

রাজপুত্র। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখানে, কি কবিতাতেই মনের ভাব ব্যক্ত করা রীতি?

পূজারিণী। হঠাৎ এ প্রশ্ন কল্লে কেন? আমি ত তোমার কাছে কোন কবিতা আবৃত্তি করি নাই।

রাজপুত্র। আমি দেখেছি এখানকার ছোট, বড়, অনেকেই কবিতায় মনের ভাব প্রকাশ করে। নিজের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা'বার জন্য আমি এক দোকানে গিয়েছিলুম। দোকানদার বল্লে:—

"স্বাগত এ পণ্যশালে, ক্রেতামহাশয়!
বাছিয়া লউন বস্ত্র, যাহা ইচ্ছা হয়।
এক দর স্থির মোর, দু' কথা না বলি,
সঙ্গত না হয় বোধ যাইবেন চলি।

আর একবার আমি নগর দেখ্‌তে বেরিয়ে পথ হারিয়েছিলুম। একটী বিদ্যালয় দেখে একজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "কল্যাণেশ্বরের মন্দির কোথায়?" ভেবেছিলুম কল্যাণেশ্বরের মন্দির সকলেরই পরিচিত; সেখানে পঁহুছিতে পাল্লে আপনার বাড়ীর সন্ধান পাওয়া কঠিন হবে না। শিক্ষক আমার প্রশ্নের উত্তরে একটী ভাঙ্গা পাহাড় দেখিয়ে বল্লেন:—

"অই যে পর্ব্বতচূড়া, বজ্রাঘাতে হয়ে গুঁড়া,
পড়িয়াছে ভূমির উপর;
দেবদারু-তরুগুলি, যথা, ঊর্দ্ধে শির তুলি,
বায়ু সনে খেলে নিরন্তর।
কানন-মল্লিকাদল ঢালে যথা পরিমল,
ধূপগন্ধে দিক্‌ আমোদিত;

ভৃঙ্গ গুন্ গুন্ স্বরে শিবগুণ গান করে,
পিককণ্ঠে শিবগুণগীত।
তুলি কুলু কুলু তান নির্ঝরিণী গায় গান,
তটে তা'র, হে পথিকবর!
এ পুরীর অধিষ্ঠাতা, চতুর্ব্বর্গফলদাতা,
বিরাজিত কল্যাণ-ঈশ্বর।"

পূজারিণী। সর্ব্ব সাধারণের এই রীতি নয়; তবে কবিতাতে কিছু বল্‌তে পাল্লেই এদেশে অনেকের শ্রদ্ধা জন্মে। তাঁদের বিবেচনায় কবিতাটা একদিকে, ভাষার উপর অধিকারের, অপর দিকে, হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় দেয়। সভাসদেরা তোমার পরীক্ষা কালে, হয়ত, তোমার কবি-শক্তিরও বিচার কর্ব্বেন।

রাজপুত্র। "উত্তম! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি কবিতারচনায় অপটু নই।"

পূজারিণী। "বাবা! তুমি সকল বিষয়েই যোগ্যপাত্র; কল্যাণেশ্বর তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্ব্বেন।"

অষ্টম দিন প্রাতঃকালে রাজপুত্র কল্যাণেশ্বরের পূজা কল্লেন। তার পর, আপনার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, সুন্দর, স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ পরে, ঘোড়ায় চড়ে, রাজবাড়ীর দিকে চল্লেন। সঙ্গে তাঁর শরীর-রক্ষক, পতাকাধারী ভৃত্যেরা চল্‌ল। একেই তাঁর মনোহর রূপ, তার উপর বীরোচিত বেশ, ভূষা, পিঠে বাণে পূর্ণ তূণ বাঁধা, কোমর থেকে তলোয়ার ঝুল্‌চে, পাগড়ীতে হীরের কিরীট ঝক্‌মক্ কচ্চে, তেজস্বী ঘোড়াটী যেন নেচে নেচে চলেছে, সব মিলিয়ে অতি অপরূপ শোভা হ'ল। তিনি রাজকন্যার বিবাহার্থী জেনে তাঁকে দেখ্‌বে বলে, রাজপথে লোক জমে গেল। সৈনিক পুরুষেরা, তাঁর অশ্বচালনার প্রশংসা ক'রে, পরস্পর বলাবলি কত্তে লাগ্‌ল যে, সমস্ত রাজবাহিনীর মধ্যে

এমন বীরের লক্ষণযুক্ত পুরুষ একজনও নাই। পথের ধারে বাড়ীগুলির জান্‌লা খুলে, মেয়েরা দেখ্‌তে লাগলেন। দু' এক জন বল্লেন; "ছাইএর পরীক্ষা! এমন সুপুরুষকে রাজকুমারীর যদি পছন্দ না হয়, তবে আর হ'বে কা'কে? ঘোড়া না চড়ে যদি উনি ময়ূর চড়ে যেতেন তবে ত কার্ত্তিক বলে বোধ হ'ত।" তাঁর পরীক্ষা কিরূপ হয় দেখ্‌বার জন্যে অনেক লোক তাঁর পিছু পিছু চল্‌ল। রাজপুত্র, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে, একবারে রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রহরীরা তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে নমস্কার কল্লে। তিনি দেখ্‌লেন সম্মুখে একটী সোণার ঘণ্টা ঝুল্‌চে। নাড়া দেওয়ামাত্র সেটী জোরে বেজে উঠ্‌ল; সমস্ত রাজবাড়ীর লোক বুঝ্‌লে একজন বিবাহার্থী এসেছেন। রাজকুমারীর সখীরা তাঁকে গিয়ে বল্লেন, মন্দিরের সেই যুবাপুরুষ এসেছেন। পরীক্ষায় কি হয় জান্‌বার জন্য রাজকন্যা মনে মনে উৎসুক হয়ে রইলেন। কিন্তু বাইরে কোন ভাব প্রকাশ কল্লেন না।

এই সময় এক প্রবীণ কর্ম্মচারী এসে রাজকুমারকে অভিবাদন করে বল্লেন;—"আপনার কি প্রার্থনা?"

রাজপুত্র বল্লেন:—"আমি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণার্থী।"

কর্ম্মচারী। বিবাহ সম্বন্ধে রাজকুমারীর যা' পণ তা' আপনি জানেন? অকৃতকার্য্য হ'লে বলদের মত লাঙ্গল টান্‌তে হবে।"

রাজপুত্র। "হাঁ! এ নিয়ম আমি জানি। আমাকে কি পরীক্ষা দিতে হ'বে বলুন।"

কর্ম্মচারী। "আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, এখনই পরীক্ষার আয়োজন হ'বে।

এই বলে তিনি ভিতরে প্রবেশ কল্লেন। অমনি পাঁচজন সৈনিক-পুরুষ বাহিরে এসে রাজপুত্রের সম্মুখে দাঁড়া'ল। সকলেরই হস্তে ধনুর্ব্বাণ; একজন তা'দের মধ্যে নায়ক। সে রাজপুত্রের আপাদমস্তক ভাল করে

দেখ্‌লে; তাঁর ধনুক, বাণ পরীক্ষা কল্লে; তাঁর ধনুকের দণ্ডটা একটু নুইয়ে বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলে। বোধ হয় ভাবুলে এমন সুকুমার পুরুষ কিরূপে এই কঠোর ধনু বাঁকিয়ে গুণ দিতে পারেন। সে, ইচ্ছা করেই, গুণটা খুলে ফেলে, ধনুকের দণ্ডটা রাজপুত্রের হাতে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বল্‌লে;—

"তূণটী তোমার বাণে ভরা, হাতে ধনুক, তীর;
উড়ো পাখী পাড়ো দেখি, বুঝি কেমন বীর।"

রাজপুত্র "উড়ো পাখী পাড়ো দেখি" কথা কয়টী হ'তে বুঝ্‌লেন, পাখীটীকে মারা প্রধান তীরন্দাজের অভিপ্রেত নয়। তিনি নিমেষের মধ্যে ধনুকে পুনর্ব্বার গুণ দিলেন; তার পর তূণ থেকে একটা বাণ নিয়ে তার ফলাটা পাথরে ঠুকে একটু ভোঁতা কল্লেন। এই সময় তিনি দেখ্‌তে পেলেন, একদল বুনো হাঁস, উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার জন্যে, সেই দিকে আস্‌চে। গলা বাড়িয়ে, দুই ডানা খেলিয়ে চলেছে। সূর্য্যের কিরণ তা'দের বুকের উপর পড়ায় সাদা পালকগুলি ঝক্‌মক্ কচ্চে। তিনি ধনুকে সেই ভোঁতা বাণটী যোজনা করে, হাঁসগুলি মাথার উপর আসবা-মাত্রই একটাকে লক্ষ্য করে ছুড়্‌লেন। নিমেষের মধ্যে হাঁসটী ঘুরে ঘুরে তাঁর নিকটে এসে পড়্‌ল। তথন সেই তীরন্দাজেরা হাঁসটীকে ধরে বেশ করে পরীক্ষা কল্লে। কোথাও এক বিন্দু রক্তের চিহ্ন নাই। ডানার গোড়ায় আঘাত পেয়ে হাঁসটী যন্ত্রণায় পড়ে গিয়েছে। অপর সকলে দেখে বল্লে "বাহবা! বাহবা!" কিন্তু প্রধান তীরন্দাজ ঘাড় নেড়ে বল্লে;—

"সাতটা পাখীর একটা পাড়া কঠিন তেমন নয়;
আস্‌ছে সুযোগ, দাও এইবার গুণের পরিচয়।"

রাজপুত্র দেখ্‌লেন, একটা বাজ রাজবাড়ীর একটা পায়রাকে তাড়া করেছে। পায়রা বাচ্ছা ছেড়ে দূরে যেতে পাচ্চে না; কিন্তু প্রাণভয়ে

কখনও উপরে, কখনও নীচে, কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে উড়ে যাচ্চে; বাজও তার পিছনে পিছনে চলেছে। দু'টীতে কখনও কখনও এত কাছাকাছি হ'চ্চে যে, বাজ যেন পায়রাটীকে ধর্‌লে ধর্‌লে বোধ হচ্চে। বাণ ছুড়্‌লে কার গায়ে লাগ্‌বে বলা যায় না। রাজপুত্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দু'টীকে দেখ্‌ছিলেন। একবার দেখ্‌লেন পায়রাটী, শ্রান্ত হয়ে, দুই ডানার উপর ভর দিয়ে যেন বাতাসে ভাস্‌চে, আর, বাজটা দেখে, ছোঁ মারবার জন্য, পায়ের নখ বাঁকিয়ে, মুখটা নীচু করে তার উপর পড়েছে। দেখ্‌বামাত্র তিনি ধনুকে বাণ যুড়্‌লেন। একবার "টোয়াঙ্‌" করে একটা শব্দ হল, আর পরক্ষণেই দেখা গেল বাজের রক্তাক্ত দেহ ঘাসের উপর লুঠ্‌ছে। অমনি তীরন্দাজেরা এসে কেউ তাঁর পায়ের ধূলো নিলে, কেউ তাঁকে নমস্কার কল্লে। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তা'দের "সাবাস সাবাস" শব্দে সিংহদ্বার কেঁপে উঠ্‌ল। সেই প্রবীণ কর্ম্মচারীটী এই সময় এসে সহাস্য মুখে রাজপুত্রকে বল্লেন;—"আপনি প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন; কাল প্রাতে আপনাকে আন্‌বার জন্য হাতী যা'বে। আপনি মল্লযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আস্‌বেন।" "আসব" বলে রাজপুত্র বিদায় নিলেন।

পরদিন প্রাতে এক প্রকাণ্ড, দাঁতাল হাতী এসে পূজারিণীর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়া'ল। তার সাজসজ্জা অতি সুন্দর, কিন্তু চালাবার জন্যে মাহুত ছিল না। সঙ্গের এক কর্ম্মচারী বল্লেন;—"আপনাকে নিজে এই হাতী চালিয়ে রাজবাড়ীতে যেতে হবে। হাতীটী শান্ত এবং শিক্ষিত, কিন্তু এর দোষ এই যে, একবার থম্‌কে দাঁড়া'লে, চালান দুঃসাধ্য। স্বর্গীয় মহারাজ এই হাতীটী চড়ে দর্‌বারে যেতেন বলে এটী রাজকুমারীর অতি প্রিয়। আমি বিদায় নিচ্চি, এক প্রহরের মধ্যে, আপনাকে রাজবাড়ীর কুস্তির আখ্‌ড়ায় পৌঁছুতে হ'বে।"

রাজপুত্র ভাব্‌লেন, হাতী চালান ত কিছু কঠিন নয়, অভ্যাস আছে। কিন্তু যে তিনটী কথা শুনলুম তা'তে চালান ত সহজ হবে না। থম্‌কে

দাঁড়ালে চল্‌তে চায় না, রাজকন্যার প্রিয়হাতী, মার্‌তেও পার্‌ব না অথচ এক প্রহরের মধ্যে পঁহুছিতেই হ'বে। ভাল! দেখাই যাক্‌। পূজারিণীর গৃহে প্রসাদী ফল, মূল প্রচুর থাক্‌ত; তিনি, তাঁর অনুমতি নিয়ে, রাশীকৃত ফল, মূল এনে হাতীর সম্মুখে রাখ্‌লেন। হাতী চোক্‌ মুদে আনন্দে সেগুলি ভোজন কত্তে লাগ্‌ল। এই সময় তিনি তার পায়ে, গায়ে, শুঁড়ে হাত দিয়ে মাহুতেরা যেমন হাতীর পরিচর্য্যা করে, খানিকক্ষণ সেইরূপ কল্লেন। পূজারিণীর কাছে তিনি শুনেছিলেন যে রাজকন্যার প্রিয় হাতীটীর নাম পুরন্দর। পুরন্দর বলে ডাক্‌তেই হাতী কাণখাড়া করে শুন্‌লে, তাঁর ডাকের উত্তর দিলে। তখন তিনি যেরূপ ইঙ্গিতে হাতী চলে, ফেরে, সেইরূপ ইঙ্গিত কত্তে লাগ্‌লেন। হাতীটী বাস্তবিকই শান্ত ও সুশিক্ষিত ছিল। ঘোড়া যেমন সওয়ার চিনে, হাতীও তেমনি মাহুত চেনে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে রাজপুত্রকে চিনে নিলে। তিনি ইঙ্গিত কর্‌বামাত্র হাতী চার পা মুড়ে মাটীর উপর শুয়ে পড়্‌ল। রাজপুত্র, মল্লোচিত পরিচ্ছদ সঙ্গে নিয়ে, এক লাফে তার কাঁদে চড়ে বস্‌লেন। ইঙ্গিতমাত্র হাতী উঠে দাঁড়া'ল। রাজপুত্র দেখ্‌লেন, হাতীর একটী কাণের গোড়ায় ছোট একটী ঘা আছে; কতকগুলো ডাঁস মাছি তা'তে বসেছে। হাতী, শুঁড় নেড়ে, কাণ ঝেড়ে, কিছুতেই, তাড়াতে পাচ্চে না। তিনি প্রথমে হাত দিয়ে মাছিগুলো তাড়ালেন; তার পর একটী গাছের পাতা নিয়ে ঘা টা বেশ করে চাপা দিলেন। হাতী সোয়াস্তি বোধ কল্লে। তার পর তাঁকে আর কিছু কত্তে হল না; হাতী তাঁকে পিঠে নিয়ে, সোজাসুজি, রাজবাড়ীর দরোজায় গিয়ে দাঁড়া'ল।

রাজবাড়ীর চারিধারে সে দিন লোকারণ্য হয়েছে। পথে, ছাদে, ব্বারান্দায়, গাছের উপর দলে দলে লোক দাঁড়িয়েছে। রাজপুত্রের ধনুর্ব্বিদ্যায় নৈপুণ্যের কথা নগরে প্রচার হয়েছিল। আজ তিনি রাজবাড়ীর প্রধান পালোয়ানদের সঙ্গে লড়্‌বেন শুনে সহরের ছোট, বড় যত লোক

এসে জমা হয়েছিল। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী থেকে রাস্তার মুটে, মজুর পর্য্যন্ত কেউ আস্‌তে বাকী ছিলনা। লোকে বল্‌ছিল, "আজই ব্যাপার শক্ত।" অন্দর মহলের নিকটে, উঁচু প্রাচীরে ঘেরা একটী মাঠে, কুস্তির স্থান হয়েছিল। অন্দরমহল হ'তে স্থানটী উত্তম দেখা যায়। রাজপুত্র দেখ্‌লেন, রাজবাড়ীর মেয়েরা, রাজকুমারীকে অগ্রে নিয়ে, কুস্তি দেখ্‌বার জন্যে বসেছেন। ফৌজখানার সিপাহীরা দলে দলে মাঠ ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রাজবাড়ীর পালোয়ানেরা, প্রধান পালোয়ান বুটা চোবেকে ঘিরে, মাঠের একদিকে মজলিস্‌ করে বসেছে। কা'র সঙ্গে লড়াই হবে ঠিক নাই বলে সকলেই প্রস্তুত হচ্চে। কেউ ডন, কেউ বৈঠক কচ্চে; কেউ আখ্‌ড়ার মাটি নিয়ে কপালে, বুকে, বাহুতে লাগাচ্চে। সকলেই আকারে সমান; যেন এক একটী হাতীর বাচ্ছা। প্রহরের ঘণ্টা পড়্‌বা মাত্র রাজপুত্র, কাপড়, চোপড় ছেড়ে, কুস্তির ল্যাঙ্গট পরে, আখ্‌ড়ার একদিকে দাঁড়া'লেন। যাঁরা এতক্ষণ তাঁর নাক মুখ চোখের, সুন্দর চেহারার, প্রশংসা কচ্ছিলেন, এইবার তাঁর খোলা গায়ের গড়ন দেখে অবাক হলেন। কি চওড়া বুক! কি বিপুল গ্রীবা! কি সুগঠিত বাহু! কি মাংসল উরু! এমন সর্ব্বাঙ্গসবল দেহ কেউ কখনও দেখেনি। তিনি যখন আখ্‌ড়ার মাটী মেখে, বুক ফুলিয়ে, দাঁড়ালেন, বুটা খানিকক্ষণ বিস্ময়ে চেয়ে রইল; আপনার ছাত্রদের সঙ্গে কি পরামর্শ কত্তে লাগ্‌ল। সর্ব্বপ্রধান ছাত্রের কাণে কাণে কি দু' একটা কথা বলে আদরে তার পিঠ চাপ্‌ড়ালে। সে বুটার পায়ের ধূলি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়া'ল। সময় হয়েছে বুঝে একজন কর্ম্মচারী রাজপুত্রকে লক্ষ্য করে বল্লেন;—"পরদেশী! এই বারোজন পালোয়ানের মধ্যে যে কোন একজনকে পরাজয় কল্লেই আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন গণনা করা হবে। সকলেই প্রস্তুত আছে; দেখে বলুন, আপনি কার সঙ্গে লড়্‌তে চান?"

রাজপুত্র গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন;—"ওস্তাদজী বুটার সঙ্গে।" তখন

উপস্থিত লোকদের মধ্যে একটা কোলাহল পড়ে গেল। সে দেশে কেউ কখন বুটার সঙ্গে ল'ড়ে জয়লাভ করে নি ; লড়্‌তে এসে অনেকেই হাত, পা ভেঙ্গে মরেছে। তবে পরদেশীর এত স্পর্দ্ধা কিরূপে হ'ল ? তিনি কি বুটার নাম শুনেন নি ? ইচ্ছা কর্‌লেত তিনি তার কোন সাক্‌রেতের সঙ্গে লড়্‌তে পারতেন ; এতটা সাহস করা তাঁর পক্ষে ভাল হয় নি। অনেকেই এই সকল কথা বল্লে ; আবার কেউ কেউ বল্লে ;—"উনি না বুঝেই কি এত স্পর্দ্ধা করেছেন ? হার্‌লে কি ঘট্‌বে তা'ত উনি জানেন। দেখ্‌ছনা কেমন স্থির, গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন।"

রাজপুত্রের কথা শুনে বুটা রাগে গর্ গর্ কচ্ছিল ; কিন্তু ভাব গোপন করে বল্লে ;—"পরদেশী ! তোমার সাহস দেখে বড় খুসী হয়েছি। কিন্তু আমি ত যার তার সঙ্গে লড়ি না। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়্‌বার উপযুক্ত তার কিছু প্রমাণ দাও। আগে আমার এই সাক্‌রেতের সঙ্গে একটু লড়, পরে আমার সঙ্গে লড়্‌বে।" বুটার বিশ্বাস ছিল, সাক্‌রেতের সঙ্গে লড়াইতেই রাজপুত্রের দর্প চূর্ণ হ'বে।

রাজপুত্র বল্লেন ;—"ওস্তাদজী ! তোমার সাক্‌রেতের সঙ্গে লড়া যদি রাজকুমারীর ইচ্ছা হয়, তবে, আগে তা'ই হ'ক ; কিন্তু তুমিও তৈয়ার থাকো ; তোমার সাক্‌রেতকে বেশীক্ষণ লড়্‌তে হবে না।"

রাজপুত্র যা' বলেছিলেন, সত্য সত্যই তা'ই ঘট্‌ল। দলপতি বুনো হাতীর সঙ্গে লড়াইএ পোষা হাতীর যে অবস্থা হয়, রাজপুত্রের সঙ্গে লড়াইএ বুটার সাক্‌রেতের সেই অবস্থা হ'ল। দু' একবার জড়াজড়ি, হাতে হাতে আঁকড়া আঁকড়ি, পায়ে পায়ে বেড়াবেড়ির পর বেচারার স্ফূর্ত্তি কমে গেল। যারা কুস্তির দাঁও প্যাঁচ জানেন, তাঁরা বুঝ্‌তে পাল্লেন যে পরদেশী কেবল দয়া করেই তাকে আছাড় দিচ্ছেন না। সে এক একবার উপুড় হয়ে জমী নেয় আর রাজপুত্র তাকে টেনে তোলেন। এইরূপে বৃথা সময় যাচ্চে দেখে, সে আবার জমী নিলে, রাজপুত্র, এক হাত তার বুকের নীচে

আর এক হাত তার জানুর নীচে দিয়ে, তা'কে একবারে শূন্যে তুল্‌লেন। ইচ্ছা কল্লে তা'কে দশ হাত দূরে ছুড়ে ফেল্‌তে পাত্তেন; কিন্তু তা' না করে মানুষ যেমন ছোট ছেলেকে আদর করে লোফে, তেমনি অত বড় সেই পালোয়ানকে লুফে উল্টে নিলেন। তারপর তার পিঠটা মাটীতে ঠেকিয়ে "এক, দো, তিন" বলে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলেন। সে রাজপুত্রকে নমস্কার করে আপনার দলে গিয়ে মিশ্‌ল। যারা নিকটে ছিল, দেখে বল্লে;—"এ মানুষ নয়, অসুর।" কেউ বা বল্লে; "স্বয়ং বলদেব।"

তখন সেই পূর্ব্বের কর্ম্মচারী বল্লেন;—"আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, এখন বিশ্রাম কত্তে পারেন।"

রাজপুত্র বল্লেন;—"আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি শুনে সুখী হলুম। কিন্তু বুটা যে অবজ্ঞা করে তার সাকৃরেতকে আমার সঙ্গে লড়্‌তে দিয়েছিল, নিজে আসেনি, সেটা আমার ভাল লাগ্‌চেনা। রাজকুমারীর সম্মতি জান্‌লে আমি বুটার সঙ্গে লড়্‌তে প্রস্তুত আছি। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।"

সকলেই শুনে অবাক্ হ'ল। উত্তীর্ণ হয়েও আবার লড়্‌বার সাধ! তা' আবার যার তার সঙ্গে নয়, মহাবীরের অবতার বুটার সঙ্গে! ধন্য সাহস! রাজপুত্রের রূপ আর তাঁর বল দেখে অনেকেরই তাঁর প্রতি মায়া জন্মেছিল। কি জানি কি ঘটে ভেবে তাঁরা বল্লেন,—"যখন পরদেশীর জয় হয়েছে, তখন আর লড়ালড়ীর প্রয়োজন কি?" কিন্তু অধিকাংশ লোকের মত অন্যরূপ হ'ল। রাজপুত্রের সঙ্গে বুটার সাকৃরেতের লড়াইটা অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ হয়েছিল বলে তা'দের কুস্তি দেখ্‌বার সাধ মেটেনি। তারা চীৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ওস্তাদজী! লড়িয়ে লড়িয়ে". সাকৃরেতের অবস্থা দেখে বুটার লড়্‌বার সাধ কমে গিয়েছিল; কিন্তু লোকের আগ্রহ দেখে, আর নিজের গৌরব রক্ষার জন্য, সে স্থির থাক্‌তে পাল্লেনা। রাজকুমারী যে দিকে বসে কুস্তি দেখ্‌ছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হয়ে বল্লে;—

স্বর্গীয় মহারাজের আশীর্ব্বাদে আমি অনেক পালোয়ানকে শিক্ষা দিয়েছি; অনুমতি হ'লে পরদেশীকেও শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি।”

রাজকুমারীর অভিপ্রায় জেনে পূর্ব্বের সেই কর্ম্মচারী বল্লেন;—“যখন পরদেশী ও বুটা উভয়েই লড়বার জন্যে ইচ্ছুক এবং সাধারণেও তাঁদের লড়াই দেখতে চান, তখন লড়াই হ'ক। কিন্তু এ লড়াইয়ে পরাজিত হলেও, পূর্ব্বাদেশ অনুসারে, পরদেশী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন গণ্য হ'বে।”

সকলেই বল্লেন;—“এ আদেশ ন্যায়সঙ্গত।”

রাজপুত্র আর বুটা মল্লভূমির দু'দিকে দাঁড়া'লেন; লোকে উভয়ের চেহারার তুলনা করতে লাগল। লম্বায় দু'জনেই সমান, চার হাতের দু'এক আঙ্গুল বেশী বই কম নয়। রাজপুত্রের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, কাঁচা সোণার মত; বুটার রঙ্ ঘোর কালো, আষাঢ়ের নূতন মেঘের মত। উভয়েরই বাহু, বক্ষ, উরু, মাংসল; কিন্তু রাজপুত্রের দেহে কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত একতিল মাংস নাই; বুটার দেহ মাংসের ভারে অবসন্ন। চল্‌তে, ফির্‌তে, এমন কি ঘাড় ফিরাতে, তার মাংসরাশি তা'কে বাধা দেয়। রাজপুত্রের বল তাঁর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে; বুটার বল ত'ার বাহুতে ও বক্ষে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বুকের উপর টেনে দুই বাহুতে ধরে চাপ দিলে তাঁর পাঁজরা চুরমার হয়ে যায়। দু'জনে দু'দিকে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখ্‌ছিলেন; সঙ্কেত হ'বা মাত্র মল্ল-ভূমির মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। রাজপুত্রের দুই হাত ধরে বুটা তাঁকে নিজের কাছে টেনে আন্‌বার চেষ্টা কল্লে; কিন্তু তিনি এমন ঝাঁকরাণি দিলেন যে, বুটা পাঁচ পা পেছিয়ে গেল। ক্রমে হাতে হাতে, পায়ে পায়ে আঁকড়া আঁকড়ি, বেড়াবেড়ি আরম্ভ হল। কখনও গর্‌দানা, কখনও কোমর, কখনও জানু ধরে উভয়েই উভয়কে কাবু কর্ব্বার চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন। বুটা, চিরদিনের অভ্যাস মত, রাজপুত্রকে টেনে বুকের উপর নিয়ে চাপ দেবার চেষ্টায় রইল। কিন্তু রাজপুত্র লোহার থামের মত অটল হয়ে দাঁড়ালেন। কা'র শক্তি যে

এক পা নড়ায়। বুটা বহু চেষ্টা করে যখন দেখ্‌লে রাজপুত্রকে টেনে বুকের উপর আন্‌তে পারা গেল না, তখন রেগে বল্লে ;—"পরদেশী! এ পালোয়ানকা লড়াই, বান্দর কা খেল নয়। যদি বুকে বুকে না ঠেক্‌ল, তবে কুস্তির আরাম কি হ'ল?

রাজপুত্র বল্লেন ;—"আরাম শীঘ্রই হবে।"

বুটা গর্জ্জে উঠে, রাজপুত্রের ঘাড় ধরে মাটাতে ফেল্‌বার চেষ্টা কল্লে, কিন্তু পাল্লে না। এইরূপে কিছুক্ষণ চল্লে বুটা বুঝ্‌লে এ ভাবের লড়াইএ তা'র জয়লাভের আশা নাই। তখন সে, কুস্তির নিয়ম ভঙ্গ করে, কখনও রাজপুত্রের মুখে, কখনও বুকে ঘুঁসি, থাপ্পড় মার্‌তে আরম্ভ কল্লে। হাঁটু দিয়ে, কনুই দিয়ে তাঁর জানুতে, বাহুতে আঘাত কত্তে লাগ্‌ল। বুটা যে রেগে অন্যায় কাজ কচ্চে সকলেই বুঝ্‌লেন; কিন্তু রাজপুত্র কোন প্রতিবাদ কল্লেন না। তিনি কেবল, তার প্রহার এড়াবার জন্যে, মাঝে মাঝে সরে দাড়াতে লাগ্‌লেন মাত্র। বুটা অন্যায় রূপে তাঁকে প্রহার কচ্চে দেখে রাজবাড়ীর মেয়েরা সকলেই দুঃখিত হ'লেন। রাজকুমারীরও মুখে একটু বিরক্তির লক্ষণ দেখ্‌তে গেল। রাজপুত্র একবার সেই দিকে চেয়ে রাজমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "এইরূপই কি এ দেশের মল্লযুদ্ধের রীতি?" মন্ত্রী বল্লেন ;—"না, এ রীতি নয়; আপনি ইচ্ছা কল্লে যুদ্ধে ক্ষান্ত হতে পারেন বা এইরূপ রীতি অবলম্বন কত্তে পারেন।" রাজপুত্র শুনে কোন কথা বল্লেন না। মল্লযুদ্ধ পূর্ব্বেরই মত চল্‌তে লাগ্‌ল। রাজপুত্র, মাঝে মাঝে, মল্লভূমির এক দিক থেকে আর এক দিকে সরে যান, বুটা তার স্থূল দেহ নিয়ে তাঁকে ধর্‌বার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ক্রমে সে শ্রান্ত হয়ে পড়্‌ল, তার দেহ ঘর্ম্মাক্ত হল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বইতে লাগ্‌ল। রাজপুত্র বুঝ্‌লেন ঠিক সময় এসেছে। তিনি এতক্ষণ বুটার প্রহার সহ্য কচ্ছিলেন। এইবার সুযোগ বুঝে তার কর্ণমূলে আর চোয়ালে উপর্য্যুপরি এমন দু'টা ঘুঁসি দিলেন যে বুটার মাথাটা ঘুরে উঠ্‌ল। মল্লভূমি কোয়াসায় আবৃত বলে

তা'র বোধ হল। মুষ্টিপ্রহারের সঙ্গে সঙ্গে বুটার পা টা পায়ে জড়িয়ে রাজপুত্র একটা হেঁচ্কা টান দেওয়া মাত্র সে আড় হয়ে পড়্‌ল। অমনি বিদ্যুৎবেগে তিনি বাঁ হাতে তার গর্দ্দানটা আর ডান হাতে তার জানু দু'টা জড়িয়ে ধ'রে তাকে একবারে ভূঁই ছাড়া কল্লেন। বুটা দু' একবার ছট্‌ফট্ কল্লে; কিন্তু তার মনে হ'ল লোহার সাঁড়াশী দিয়ে কেউ তাকে চেপে রেখেছে। যারা কুস্তি দেখ্‌ছিল, তা'দের মুখে কথা সর্‌ল না; তারা ছবির মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। রাজহস্তী পুরন্দরও বুটাকে ভূঁই ছাড়া কত্তে পারে কিনা লোকের সন্দেহ ছিল। রাজপুত্র বুটাকে ধরে তা'র পিঠ জমীতে ঠেকাতে যান, এমন সময় তার সাক্‌রেতেরা এসে জোড় হাত করে বল্লে; "পরদেশী! ওস্তাদজীর পিঠ কখনও জমীতে ঠেকে নি। আপনি তাঁর এই গৌরব নষ্ট কর্‌বেন না। আমরা তাঁর পরাজয় স্বীকার কচ্চি।" রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ বুটাকে ত্যাগ কল্লেন এবং বুটা ব্রাহ্মণ জেনে তা'র পায়ের ধূলা নিলেন। তাঁর বিনয় দেখে সকলেই মুগ্ধ হ'ল। বুটা দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্লে;—"পরদেশী! আমি হাজার পালোয়ানের সঙ্গে লড়েছি। কারও শরীরে এমন বল কখনও দেখিনে। লোকে আমাকে মহাবীরের অবতার বলে; আমি বুঝ্‌তেছি প্রভু রামচন্দ্রজীর অংশে আপনার জন্ম; আপনার কাছে পরাজয় আমার অপমান নাই। আপনি রাজকুমারীকে বিবাহ ক'রে এ দেশের রাজা হন; আমরা আপনার সেবা করে কৃতার্থ হই।" রাজপুত্র মাথা নুইয়ে তার প্রশংসার উত্তর দিলেন।

মল্লযুদ্ধ শেষ হ'ল। লোকে "পরদেশীর জয়, পরদেশীর জয়" "রাজকুমারীর বিয়ে" "রাজকুমারীর বিয়ে" বল্‌তে বল্‌তে ছুট্‌ল। মল্লযুদ্ধটাই রাজকুমারীর বিবাহের প্রধান বাধা ছিল। সে বাধা দূর হ'ল দেখে লোকের আনন্দের সীমা রইল না। অন্তঃপুরেও সে আনন্দের তরঙ্গ পঁহুছিল। স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি হ'লেও রাজকুমারীর অধরপ্রান্তে হাস্যের রেখা তাঁর মনোগত ভাব প্রকাশ কল্লে। বৃদ্ধা পূজারিণী রাজান্তঃপুর থেকে এই দৃশ্য

দেখ্‌ছিলেন। তিনি আর স্থির থাক্‌তে পাল্লেন না; বেরিয়ে রাজপুত্রের কাছে এলেন। রাজপুত্র তাঁকে দেখ্‌বামাত্র ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম কল্লেন। বৃদ্ধার দুই চক্ষু দিয়ে জল পড়্‌ছিল; তিনি, রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করে, আঁচল দিয়ে তাঁর গায়ের ঘাম মুছিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। পূজারিণীকে রাজ্যের সকল লোকই ভক্তি কর্‌ত। তাঁর এইরূপ ব্যবহারে সকলেই "ধন্য, ধন্য" বল্‌তে লাগ্‌ল। অন্তঃপুর থেকে একজন কর্ম্মচারী এসে রাজপুত্রকে বল্লেন; "আপনি বহু ক্লেশ স্বীকার করেছেন। কাল মধ্যাহ্নে একবার রাজসভায় শুভাগমন কর্ব্বেন; কালই আপনার পরীক্ষা শেষ হবে।"

সেদিন অজানা রাজ্যের রাজধানীতে এই মল্লযুদ্ধের কথা ছাড়া আর কোন কথা হ'ল না।

৬

পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই এক সুসজ্জিত রথ এসে পূজারিণীর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াল। রাজপুত্র পূর্ব্ব দিন মল্লোচিত পরিচ্ছদ পরে রাজবাড়ীতে গিয়েছিলেন; আজ সুন্দর, মূল্যবান্ বেশভূষায় সেজে রথে আরোহণ কল্লেন। যিনি প্রকৃত সুন্দর, সকল বেশেই তাঁকে সুন্দর দেখায়। তবুও পরিচ্ছদের গুণে তাঁর সৌন্দর্য্য যেন আরও পরিস্ফুট হল। তাঁকে দেখ্‌বার জন্য অসংখ্য লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। যারা পূর্ব্বদিন তাঁকে বুটার সঙ্গে লড়্‌তে দেখেছিলেন, আজ, তাঁকে দেখে, তাঁরা বুঝ্‌তে পাল্লেন না যে, ঐ কমনীয় মূর্ত্তির মধ্যে কিরূপে তেমন অসুরের মত বল ছিল। তাঁকে দেখ্‌বামাত্র লোকে "জয় পরদেশীর জয়" বলে চীৎকার করে উঠ্‌ল। তাঁর বেশভূষা দেখেই হ'ক, বা তাঁর মূর্ত্তি দেখেই হ'ক, দু'চার জন "জয় রাজপুত্রের জয়" বলে তাঁর অভ্যর্থনা কল্লে। অমনি শোন্‌বামাত্র সকলেই "জয় রাজপুত্রের জয়" বল্‌তে লাগ্‌ল। তিনি সভায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই এ সংবাদ সেখানে গেল। তিনি কোন্ দেশের রাজপুত্র জান্‌বার জন্য তখন সকলেরই মনে একটা ঔৎসুক্য জন্মিল।

রাজসভা লোকে পূর্ণ। সাধারণ লোকে নয়; রাজকুটুম্ব, রাজকর্ম্মচারী এবং নগরের সম্ভ্রান্ত লোকে পূর্ণ। রাজপুত্র, রথ হ'তে অবতরণ করে, ধীরপদক্ষেপে, সভায় প্রবেশ কল্লেন। তাঁর অঙ্গে স্বর্ণখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ; উষ্ণীষে, বাহুতে, বক্ষে হীরকালঙ্কার, কণ্ঠে স্থূল মুক্তামালা; তাঁর মুখের সুবিমল কান্তিতে সভাগৃহ উজ্জ্বল হল। রাজকুমারী, মনোহর বেশভূষায় সজ্জিতা হয়ে, একটী মঞ্চের উপর সিংহাসনে উপবিষ্টা ছিলেন। রাজকুমার আর রাজকুমারী পরস্পরকে আজ উত্তমরূপ দেখ্লেন। উভয়েরই মনে হ'ল বিধাতার সৃষ্টিতে এর চেয়ে সুন্দর কিছু নাই। রাজকুমারের জন্য একটী স্বতন্ত্র আসন প্রস্তুত ছিল। তিনি, সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করে, উপবেশন কল্লে রাজমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বল্লেন;—"বৈদেশিক! আপনার পরিচয়ের অভাবে আমরা আপনাকে এই বলেই সম্বোধন কত্তে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু আমাদের সকলেরই ইচ্ছা, ঈশ্বরকৃপায়, যেন আমরা আপনাকে স্বদেশী বল্তে পারি। আপনার অস্ত্রচালনে নৈপুণ্য, আপনার শারীরিক বল, ততোধিক আপনার সৌজন্য দেখে আমরা সকলেই পরম আনন্দ লাভ করেছি। আমাদের ইচ্ছা আমাদের এই রাজ্য সংক্রান্ত দুই একটী বিষয় আপনার সঙ্গে আলোচনা করি। আপনার অভিপ্রায় কি?"

রাজপুত্র। "উত্তম কথা! কি আলোচনা কত্তে চান বলুন।"

মন্ত্রী। "আমাদের প্রজা আর কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটী বিষয় নিয়ে গুরুতর মতভেদ ও পার্থক্য আছে। এক সম্প্রদায় বলেন;—"আমরা অপর দেশের সঙ্গে যেরূপ নিঃসম্পর্ক আছি, চিরদিনই সেইরূপ থাকি। তা'তেই আমাদের কল্যাণ। আমাদের পাষাণ-প্রাচীর ভেঙ্গে যদি আমরা অপর দেশে যাতায়াতের পথ করি, অপর দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করি, আমাদের মহা অনিষ্ট হ'বে।" আর এক সম্প্রদায় বলেন;—"পাষাণ-প্রাচীর ভেঙ্গে যাতায়াতের পথ এবং ভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপন না করায় আমরা পৃথিবী সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে রয়েছি;

বহুবিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।” “আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, এ বিষয়ে আপনার মত কি?”

রাজপুত্র। এই উভয় মতেরই সপক্ষে ও বিপক্ষে, কতকগুলি কথা বলা যেতে পারে। এই পাষাণপ্রাচীর আছে বলে শত্রুরা আপনাদের রাজ্য সহজে আক্রমণ কত্তে পারে না। এর জন্য অপর দেশের অনাচার, কদাচার, সংক্রামক ব্যাধি আপনাদের রাজ্যে প্রবেশ করে না। এর জন্য আপনাদের প্রজার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় শস্য অপর দেশে যায় না; সুতরাং প্রজার অন্নাভাব হয় না। এরই জন্য আপনারা কোন বিষয়ে অপর জাতির উপর নির্ভর করেন না, নিজেদের শক্তিসামর্থ্যে যা' হয় তাতেই তৃপ্ত থাকেন।” এই কথাগুলি শোনবামাত্র এক দল লোক আনন্দধ্বনি কল্লে। তা'রা নীরব হলে রাজপুত্র বল্লেন;—

“এগুলি অনুকূল কথা; কিন্তু প্রতিকূল কথাও আছে। আমি উভয়েরই দোষগুণ আলোচনা কচ্চি। অনুকূল কথা গুলির মধ্যে প্রধান এই যে, অপর জাতি আপনাদের রাজ্য সহজে আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু সে কেবল পাষাণ-প্রাচীরের গুণে নয়, আপনাদের বলবীর্য্যের গুণেও বটে। প্রতি-বাসীরা যদি জানতে পারে যে আপনাদের রাজ্য ধনধান্যে পূর্ণ, কিন্তু আপনারা কাপুরুষ, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, তা হলে পাষাণ-প্রাচীর কেন, লৌহের প্রাচীরেও রক্ষা হবে না। পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করে পথনির্ম্মাণের পর যদি সে পথ দুর্গদ্বারা রক্ষা করা হয়, আপনাদের সৈনিকেরা যদি অপরের আক্রমণ নিবারণে সর্ব্বদা সযত্ন ও সমর্থ থাকে, তবে বৈদেশিক আক্রমণের ত আশঙ্কা থাকেনা। পৃথিবীর অনেক দেশই ত এইরূপে আত্মরক্ষা করে; কর্কটের মত ত মৃত্তিকার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায়না। নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করাতেই ত প্রকৃত মনুষ্যত্ব। পাষাণ প্রাচীরের উপর চিরদিন নির্ভর কল্লে আপনাদের প্রজাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে না, তারা ক্রমে অলস, জড়বৎ হয়ে পড়বে।

এ অবস্থা হতে তা'দিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে রাজ্যে আমার বাস তা' পাষাণ-প্রাচীরে রক্ষিত নয়; কিন্তু পৃথিবীতে এমন জাতি নাই যে শত্রু-ভাবে তার ভূমি স্পর্শ কর্ত্তে পারে। বৈদেশিক আক্রমণের কথা শুন্‌লে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সমভাবে, লৌহ-প্রাচীরের ন্যায়, দেশরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হবে। দ্বিতীয় কথা, পাষাণ-প্রাচীর অন্য দেশের সংক্রামক ব্যাধি এদেশে প্রবেশ কর্ত্তে দেয় না; কিন্তু প্রবেশপথে উপযুক্ত বৈদ্য ও চিকিৎসক প্রহরীস্বরূপ রাখ্‌লে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রবেশের আশঙ্কা ত থাক্‌বেনা। পাষাণ প্রাচীর একদিকে যেমন অনাচার, কদাচার প্রবেশ কর্ত্তে দেয়না, তেমনি সদাচারের প্রবেশেও বাধা দেয়। অপর দেশের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার কিরূপ তা' আপনারা জান্‌তে পাচ্ছেন না, সমাজের কল্যাণের জন্য যে সংস্কার আবশ্যক তা' হচ্চেনা। পাষাণ-প্রাচীরের জন্য যেমন এ দেশের শস্য বাহিরে যেতে পারে না, প্রয়োজন হলে তেমনি বাহিরের শস্যও এদেশে আন্‌বার উপায় নাই। আপনারা সকল বিষয়ে নিজেদের উপর নির্ভর করেন সত্য; কিন্তু নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য কতটুকু? মানুষকে অন্যের সাহায্যে সহস্র সহস্র প্রয়োজনীয় বিষয় শিখ্‌তে হয়; সে শিক্ষা হ'তে আপনারা বঞ্চিত রয়েছেন।"

এক প্রাচীন সভাসদ দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন;—বৈদেশিক মহাশয়! আমরা বৃদ্ধ; পুরাতন রীতি, নীতিরই পক্ষপাতী; আমরা পূর্ব্বাপর এই কথা শুনে আসছি যে;—

গিয়াছেন যেই পথে পূর্ব্ববর্ত্তী জন,
সেই পথ শুভ, তাহে করিবে গমন।
সে পথ ত্যজিয়া যেবা অন্য পথে যায়,
পরিণামে করে সেই হায়! হায়! হায়!

এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? "হায় হায় হায়" এই কথা তিনটী তিনি, হাত নেড়ে, এমন ভাবে বল্লেন যে অনেকেই হাস্য সম্বরণ কর্ত্তে পাল্লেন না। কিন্তু রাজপুত্র গম্ভীর ভাবে বল্লেন;—"এর প্রত্যুত্তর এই যে;—

কল্যাণ-ঈশ্বর যিনি প্রভু ভগবান্
মানবে বিচার-বুদ্ধি করেছেন দান।
দেশ, কাল, পাত্র বুঝি করিয়া বিচার
মানব গন্তব্য পথ ল'বে আপনার।
বদ্ধনেত্র বলীবর্দ্দ তৈলিকের ঘরে
এক পথে নিরন্তর পর্য্যটন করে।
মানব বিবেকবান্, বলীবর্দ্দ নয়:
যাহে নিজ হয় হিত, সেই পথ লয়॥"

সকলেই বিস্ময়ে রাজপুত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। এক রাজকুটুম্ব বল্লেন;—"তর্ক বিতর্ক থাক্; আমি জিজ্ঞাসা কত্তে চাই, এই বংশের কেউ এ পর্য্যন্ত যা' করেন নি, সেই কার্য্য অর্থাৎ পাষাণ-প্রাচীর ভাঙ্গা কি আমাদের রাজকুমারীর কর্ত্তব্য হ'বে?"

রাজপুত্র বল্লেন;—"বোধ হয় মহাশয় বিস্মৃত হয়েছেন যে, রাজকুমারীর পিতা প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ সদানন্দ সিংহ, এই পাষাণ-প্রাচীর ভেঙ্গে, পথ প্রস্তুত করবার জন্য, সমস্ত আয়োজন করেছিলেন। তাঁর অকাল-মৃত্যুতেই কার্য্য বন্ধ হয়েছে। এখন আপনার বিবেচনায় স্বর্গীয় পিতৃদেবের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করা কি রাজকুমারীর কর্ত্তব্য নয়? আমাদের পিতৃপুরুষগণ স্বর্গ হ'তে আমাদের কার্য্য দেখেন। স্বর্গীয় মহারাজ তাঁর আরব্ধ কার্য্যে কন্যার ঔদাসীন্য দেখ্‌লে কি মনে কর্ব্বেন?"

কিন্তু আর বাদ, প্রতিবাদ না করে আমি আপনাদের পরামর্শ দি' পৃথিবীর সঙ্গে আপনারা যে নিঃসম্বন্ধ হয়ে আছেন, সেটী মঙ্গলজনক নয়। কত নূতন শাস্ত্র, কত নূতন যন্ত্র, কত নিত্য প্রয়োজনীয় নূতন সামগ্রী, মনুষ্যের বুদ্ধি-বলে, দিন দিন উদ্ভাবিত হচ্চে। আপনারা সেগুলি শিখ্‌তে পাচ্ছেন না। কূপের মণ্ডূক মনে করে, এখানেত বেশ আছি, এইটাইত ব্রহ্মাণ্ড; নদী, হ্রদ, সমুদ্র

আবার কি? সেখানে গিয়ে কি লাভ? আপনারাও কি এইরূপ মনের ভাব পোষণ কর্বেন? যে মানবকে আমাদের শাস্ত্র "ব্রহ্মৈবাহং" বল্‌তে শিক্ষা দিয়েছে, তার পক্ষে কূপের মণ্ডূকের ন্যায় জীবন যাপন কি সঙ্গত?"

রাজপুত্র এমন মধুরভাবে এই কথাগুলি বল্লেন্ যে, প্রত্যেকেরই মনে হ'ল তাঁর যুক্তি অকাট্য। সকলেই বুঝ্‌লেন, বৈদেশিক কেবল শারীরিক বলে নয়, বুদ্ধি-বলেও অসাধারণ।

রাজগুরু স্বতন্ত্র উচ্চ আসনে সভাস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এইবার রাজকুমারকে সম্বোধন করে বল্লেন;—"বৈদেশিক! মনে করুন, আপনার যুক্তিগুলি আমরা অকাট্য বলে গ্রহণ কল্লুম। পাষাণ-প্রাচীর ভেঙ্গে অন্যদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল। সে দেশের শিল্প-দ্রব্য, যন্ত্র, ঔষধ আমরা প্রাপ্ত হলুম। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তা' দ্বারা আমাদের আত্মার কি কিছু কল্যাণ হবে? আত্মার কল্যাণেই জীবের প্রকৃত কল্যাণ। অকিঞ্চিৎকর বাহ্য বস্তুর দ্বারা আত্মার কল্যাণ কি সম্ভবপর?"

রাজকুমার গুরুদেবকে প্রণাম করে বিনীতভাবে বল্লেন;—"প্রভো! অন্যদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্য যদি কেবল শিল্প-দ্রব্য বা যন্ত্রাদি লাভের জন্যই হ'ত তা' হলে তত প্রয়োজনীয় মনে কত্তাম না। কিন্তু এই সকলের সঙ্গে যে জ্ঞান অপার্থিব, যা' তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট হতে লভ্য, যা' দ্বারা আত্মার স্বরূপ এবং চরম লক্ষ্য নির্ণয় কত্তে পারা যায় সেই জ্ঞান অর্জ্জনেরও সুযোগ হবে। যে কোন দেশেই হ'ক, বহু শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি থাকলেও, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ত কেউ থাকেন না। সেই জন্যই দেশ বিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ আত্মার কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক। পাষাণ-প্রাচীর থাক্‌লে এরূপ উপদেশ গ্রহণ কিরূপে ঘটবে? আর প্রভু যে শিল্পদ্রব্য, যন্ত্রাদিকে অকিঞ্চিৎকর বল্লেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে গুলিও ত অকিঞ্চিৎকর নয়। শরীরের সঙ্গে আত্মার যেরূপ

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা'তে একের কল্যাণ অপরের কল্যাণের সঙ্গে বিজড়িত। সুতরাং যে যত্ন, বা যে ঔষধ শরীরের পক্ষে কল্যাণকর, সেগুলি, প্রকারান্তরে, আত্মারও পক্ষে কল্যাণকর একথা স্বীকার কত্তেই হবে। ধান্যের তুষ, এবং তণ্ডুল সমতুল্য নয়; কিন্তু তুষ যদি না থাকে, তবে, তণ্ডুলের অঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি থাকে কি? ইহলোকে শরীর যদি কার্য্যক্ষম না থাকে আত্মার কল্যাণ কিরূপে সম্ভবপর হ'বে?

শুনে গুরুদেব বল্লেন;—আমি পরমানন্দে আপনার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার কচ্চি। আপনাকে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে। লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা, সাধারণতঃ, শিষ্টাচার-সম্মত নয়। কিন্তু আমি যখন এই রাজবংশের গুরু, তখন, সে সম্বন্ধে কিছু বল্লে বোধ হয় দোষ হ'বে না। আমার ইচ্ছা নয় যে আমাদের এমন ভক্তিমতী রাজকুমারীর সঙ্গে কোনও নাস্তিকের বিবাহ হয়। আমাদের হিন্দু সমাজ শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অনেক সময় সাম্প্রদায়িক মতভেদের জন্য পারিবারিক অশান্তি উৎপন্ন হয়। রাজকুমারীর কুলগুরুরূপে, তাঁর বিবাহে সম্মতিদানের পূর্ব্বে, সেই জন্য আমি জান্তে চাই আপনি শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর এবং গাণপত্য এই পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত? আর যদি আপনি বিশিষ্টরূপে কোনও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত না হন তবে আপনার ধর্ম্ম-বিশ্বাস কি? আশা করি, এরূপ প্রশ্নে আপনি দোষ গ্রহণ কর্ব্বেন না?"

রাজপুত্র বল্লেন;—আপনার সঙ্গে রাজকুমারীর যে সম্বন্ধ তা'তে আপনার এরূপ প্রশ্ন কর্ব্বার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এতে বিন্দুমাত্রও দোষ নাই। এখন আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস কি, আমি কোন্ দেবতার উপাসক, অকপটে আপনার নিকট নিবেদন কচ্ছি;—

"নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর সাক্ষ্য দেয় মহিমার,
চরাচর যাঁহার সৃজন;

অদৃশ্য, অব্যক্ত হয়ে, জলে, স্থলে, শূন্যে রয়ে,
যিনি বিশ্ব করেন পালন।
যাঁর আজ্ঞা বহি' শিরে অমৃত-সমান নীরে
করে মেঘ সরস ধরায়;
মৃত-সঞ্জীবন কর বসে রবি, শশধর,
সমীরণ গন্ধ লয়ে ধায়।
মহাসিন্ধু কল্লোলিত গায় যাঁর গুণ-গীত,
কীর্ত্তিস্তম্ভ যাঁর মহীধরে,
তিমি, শৈলখণ্ডাকরি, যে কর গড়েছে তাঁর,
ইন্দ্রগোপ* গঠিত সে করে।
নাহি যাঁর রূপ, নাম, ভক্ত-হৃদে যাঁর ধাম,
যথাজ্ঞান পূজে নর যাঁরে;
কেহ নিরালম্ব ধ্যানে† কেহ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে,
ধূপ, দীপ নানা উপচারে।
তিনি স্নেহময়ী মাতা, তিনি রাজা দণ্ডদাতা,
তিনি গুরু দেন উপদেশ;
সর্ব্ব ঘটে বিরাজিত, সর্ব্বগুণ-সমন্বিত,
আদি-অন্ত-বিহীন মহেশ।
ধ্যানে ধরিবার তরে আকার কল্পনা করে
পূজে নর তাঁরে ভিন্ন নামে;

---

* ইন্দ্রগোপ একজাতীয় প্রগাঢ় রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীট; দেখিতে অতি সুদৃশ্য, মখমলের ন্যায় সুপস্পর্শ এবং নবনীতের ন্যায় সুকোমল। বর্ষার প্রারম্ভে শুষ্ক পার্ব্বত্য প্রদেশে দৃষ্ট হয়।

† নিরালম্ব ধ্যানে কোনওরূপ সগুণ বা সাকার মূর্ত্তির চিন্তা অথবা পূজোপকরণের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু যজ্ঞে হয়।

বৃন্দাবনে তিনি শ্যাম, অযোধ্যায় তিনি রাম,
অন্নপূর্ণা তিনি কাশীধামে।
ভক্ত-বাঞ্ছা অনুসরি' চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি ধরি,
ধন্য করি আছেন পুষ্কর ; *
বিকলাঙ্গ নীলাচলে দারু ব্রহ্ম সবে বলে ;
হেথা তিনি কল্যাণ-ঈশ্বর। †
যাঁর গুণ বর্ণিবারে চতুর্ব্বেদ নাহি পারে,
বাক্য, মন স্তব্ধ হয়ে রয় ;
তাঁরি উপাসক আমি, তিনি মোর অন্তর্য্যামী,
অন্তে যাচি তাঁর পদে লয়।"

রাজপুত্র, দণ্ডায়মান হয়ে, এমন ভক্তির সঙ্গে, এমন মধুর কণ্ঠে, এই কথাগুলি বল্লেন যে সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হ'লেন। রাজকুমারী, সিংহাসন ত্যাগ করে, মুদিত নয়নে, করযোড়ে তা' শ্রবণ কল্লেন। রাজগুরু পরমানন্দে গদ্গদ কণ্ঠে বল্লেন ;—"বৈদেশিক ! আর আমার কোন জ্ঞাতব্য নাই। রাজকুমারী আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার পূর্ব্বেই আমি আপনার সহিত তাঁর বিবাহে আমার সম্মতি জানাচ্চি। প্রজাপতি উপযুক্ত পাত্রই নির্ব্বাচন করে এনেছেন ; এখন রাজকুমারীর যা' অভিরুচি।"

রাজপুত্র ভূনত হয়ে তাঁকে পুনর্ব্বার প্রণাম কল্লেন।

রাজমন্ত্রী তখন রাজকুমারীর অভিপ্রায় বুঝে বল্লেন ; "বৈদেশিক মহাশয় ! আমরা সভাস্থ সকলেই একবাক্যে আপনার জ্ঞানের, বিচার-

* পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মাই পুষ্করের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

† নীলাচল পুরীক্ষেত্রের এবং দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দেবের অপর নাম। বিকলাঙ্গ হস্তপদাদি বিরহিত।

শক্তির এবং ভক্তিমত্তার প্রশংসা করি। এই কয় দিন মাত্র এখানে বাস করে আপনি নানা বিষয়ে আমাদের রাজ্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা' প্রকৃতই প্রশংসনীয়। আপনার জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই পরস্পরের উপযুক্ত। আমাদের সৌভাগ্য যে এদেশে আপনার শুভাগমন হয়েছে। আর আমাদের কোন আলোচনার বিষয় নাই। যদি রাজকুমারী কিছু জানতে চান তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন।" "রাজপুত্র বল্লেন ;—"উত্তম কথা।"

৭

সভাস্থ সকলেই নীরবে রাজকুমারীর দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি অতি মধুর অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় বল্লেন ;—"বৈদেশিক! এ পর্য্যন্ত যত পরীক্ষা হয়েছে, সকল গুলিতেই আপনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। আপনাকে পরীক্ষা করার আর প্রয়োজন নাই। এখন আপনার সম্বন্ধে অন্য কিছু জানা আমার অভিপ্রেত। আমার জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং প্রজাগণ আপনার পরিচয় জানবার জন্য উৎসুক ; আপনি সর্ব্বসমক্ষে আপনার পরিচয় দিন।"

রাজপুত্র দণ্ডায়মান হ'য়ে বল্লেন ;—"আপনাদের রাজ্যের উত্তরে যে রাজ্য তার নাম শিলাগড়। পুণ্যকীর্ত্তি মহারাজ বিক্রমজিৎ সিংহ তার অধীশ্বর, আমি তাঁর একমাত্র পুত্র ; আমার নাম অরিজিৎ সিংহ।"

তখন সেই সভার মধ্যে এমন আনন্দকোলাহল উঠল যে, রাজপুরীর বহির্দ্বার হ'তেও তা' শোনা গেল। রাজকুমারী তখন বৈদেশিককে লক্ষ্য করে বল্লেন ;—"কুমার! আমার বিবাহ সম্বন্ধে স্বর্গীয় পিতৃদেব যে আদেশ স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, মন্ত্রী মহাশয় এখনি তা' আপনাকে এবং সভাস্থ সকলকে শোনাবেন। আমার জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং প্রজাগণ সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত আমার নিজের মত প্রকাশ করা আমার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু বিবাহার্থিরূপে আপনি

এই কয়দিন যে ক্লেশস্বীকার করেছেন তার প্রতিদানস্বরূপ আমি আপনার যে কোন একটা প্রার্থনা পূর্ণ কত্তে প্রস্তুত আছি। বিবাহে সম্মতি এই প্রার্থনা ব্যতীত যদি আপনার অপর কোন ঈপ্সিত থাকে, বলুন ”

কুমার বল্লেন ;—“আমার কেবল এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনার বিবাহার্থী হয়ে, যারা আজ বলদের মত লাঙ্গল টান্‌চে, তারা সকলেই মুক্তিলাভ করুক্। আপনার বিবাহের দিন যেন তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে, অশ্রুপাত না করে।”

কুমারের এই প্রার্থনা শুনে সকলেই সাধুবাদ দিতে লাগ্‌লেন। বৃদ্ধ রাজপুরোহিত, মনের বেগ সংযত কত্তে না পেরে, আনন্দে বল্লেন ;—“রাজকুমার! আপনার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত পুরুষ আমরা কখনও দেখি নাই। আপনি দীর্ঘজীবী হ'য়ে সুখে রাজত্ব করুন। আপনাদের উভয়েরই সৌভাগ্য যে আপনারা পরস্পরকে পেলেন ”

রাজকুমারী তখন মন্ত্রীকে বল্লেন ;—“মন্ত্রিবর! বিবাহার্থীদিগের মুক্তির জন্য অদ্যই আদেশ প্রচার করুন। তাঁ'দিগকে উপযুক্ত পাথেয় ও পরিচ্ছদ দিয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন কত্তে বলুন। পিতৃদেব আমার বিবাহসম্বন্ধে যে আদেশ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তা' এই কৌটার মধ্যে আছে ; আপনি সভাস্থ সকলকে শুনিয়ে তাঁদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করুন।”

মন্ত্রী রাজকুমারীর প্রদত্ত কৌটা খুলে, একটী ভূর্জপত্র বার ক'রে সকলকে বল্লেন ;—“স্বর্গীয় মহারাজ স্বহস্তে রাজকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধে এই লিখে রেখেছেন ;—

মহাশক্তি দেহে যাঁর করেন বসতি,
কণ্ঠে যাঁর বিরাজিতা দেবী সরস্বতী।
মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-রূপে মিলি' হরিহর
চিত্ত যাঁর ব্যাপ্ত করি র'ন নিরন্তর,
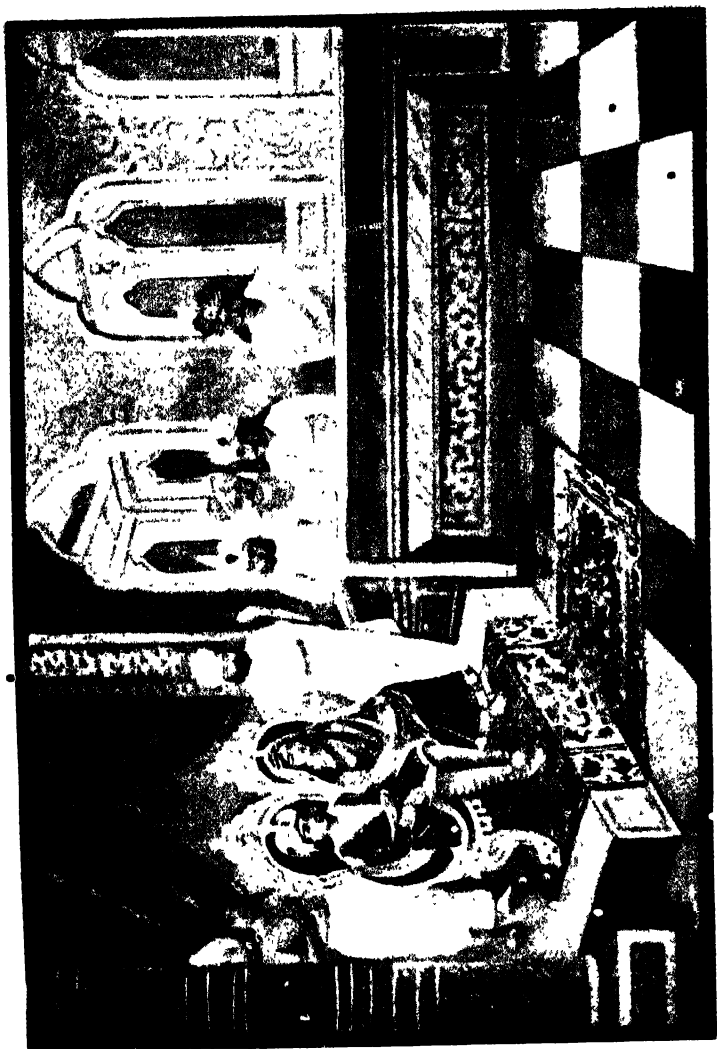
প্রাণাধিকা সুতা মোর, রাখিও স্মরণে,
তিনি তব পতিযোগ্য, নহে অন্য জনে।"

আপনারা সকলেই রাজকুমারের বল, বুদ্ধি, মাধুর্য্য এবং ঔদার্য্যের পরিচয় পেয়েছেন; এখন বলুন, তিনি, সর্ব্বাংশে, রাজকুমারীর যোগ্যপাত্র কি না।"

কাঁ'রও কিছু বল্‌বার প্রয়োজন হ'ল না। আনন্দকোলাহলেই সকলের মনের ভাব ব্যক্ত হল। রাজকুমারীর মাতামহসম্পর্কীয় এক শুক্লকেশ বৃদ্ধ, রাজসভার গাম্ভীর্য্য ভুলে, আনন্দে নৃত্য আরম্ভ কল্লেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরেরা বাদ্য, নর্ত্তক নর্ত্তকীরা নৃত্য কত্তে লাগ্‌ল। রাজকুমারীর ইঙ্গিতে ভৃত্যেরা এক সোণার সিংহাসন তাঁর ডান দিকে রাখ্‌লে। রাজকুমারী সভাস্থ ব্যক্তিগণকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন;—"পিতৃদেবের অভিপ্রায় হ'তে আপনারা বুঝ্‌তে পার্ব্বেন, বিবাহার্থীদিগকে কেন আমি এত কঠোর পরীক্ষা কত্তুম। যখন আপনারা সকলেই কুমারকে আমার যোগ্যপাত্র বলে স্থির কল্লেন, তখন আমি তাঁকে আমার পতিরূপে বরণ কল্লুম। আজ হ'তে তিনি আমার এবং আমার রাজ্যের অধীশ্বর হ'লেন।"

সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী রাজকুমারের দক্ষিণ হস্ত ধ'রে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন। তখন রাজসভার যে কি অপূর্ব্ব শোভা হ'ল, তা' বল্‌বার নয়। লোকে ভাব্‌লে যেন রামসীতাকে একসঙ্গে দেখ্‌লে। রাজসভায় ভাটেরা মিলিত হ'য়ে গান ধল্লে;—

দেখ্‌বি আয় পুরবাসী কি শোভা আজ রাজভবনে;
মিলেছে পুরুষরতন আজ রমণীমণির সনে॥
নদী আজ পারাবারে ঢেলেছে আপনারে,
মাধবী সহকারে বেঁধেছে প্রেম-আলিঙ্গনে।"

গান থাম্‌লে মন্ত্রী কুমার অরিজিৎকে বল্লেন;—"রাজকুমারীর বিবাহের জন্য প্রজারা উৎসুক হয়ে রয়েছে। আপনার সম্মতি পেলেই আমরা বিবাহের এবং সেই সঙ্গে আপনার অভিষেকেরও আয়োজন কত্তে পারি।"

কুমার বল্লেন ;—"আমি এখনও আমার মাতাপিতার সম্মতি পাই নাই। যদিও তাঁরা আমার উপর পাত্রী-নির্ব্বাচনের ভার দিয়েছেন, তথাপি তাঁদের অজ্ঞাত ভাবে বিবাহ করা আমার কর্ত্তব্য নয়। আপনারা শিলাগড়ে দূত পাঠান, আমি তাঁ'দিগকে সমস্ত কথা লিখ্‌ব ; আশা করি তাঁদের অমত হ'বে না।"

একজন সভাসদ বল্লেন ;—"যদি তাঁরা মত না দেন ?"

কুমার বল্লেন ;—"আমি চিরদিন অবিবাহিত থাক্‌ব।"

এই কথা কয়টাতে রাজকুমারের মাতাপিতার প্রতি ভক্তি এবং সেই সঙ্গে রাজকুমারীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বুঝে সকলেই সুখী হ'লেন। রাজকুমারী বল্লেন ;—"মন্ত্রিবর! পিতৃদেব শিলাগড়ে যাবার জন্য যে পথ প্রস্তুত করবার আদেশ দিয়েছিলেন, পাষাণপ্রাচীর ভেঙ্গে, সেই পথ নির্ম্মাণের আয়োজন করুন এবং আপনি উপযুক্ত উপহার দ্রব্য নিয়ে স্বয়ং শিলাগড়ে গিয়ে এই সংবাদ দিন।"

মন্ত্রী "যে আজ্ঞা" বলে বিদায় নিলেন। সভাভঙ্গ হল। রাজভবনের বাইরে বহুসহস্র নাগরিক অপেক্ষা কচ্ছিল। এই সংবাদ শোন্‌বামাত্র তারা দলে দলে নগরের পথে ধাবিত হ'ল। অমনি কোনও গৃহে নৃত্যগীত, কোনও গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, কোনও গৃহে দেবপূজা আরম্ভ হ'ল। উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত নগর মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। পতাকা উড়িয়ে, তুরী, ভেরী বাজিয়ে, হাজার হাজার লোক রাজপুরী প্রদক্ষিণ কত্তে লাগ্‌ল। একপ্রহরের মধ্যে সমস্ত নগর উৎসবানন্দে পূর্ণ হ'ল।

পাঠক পাঠিকা! অজানাদেশ হ'তে এইবার শিলাগড়ে চলুন, সেখানকার সংবাদ শুনুন। রাজকুমার অদৃশ্য হ'লে তাঁর সঙ্গীরা সমস্ত বন তাঁর জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ্‌লেন ; কিন্তু কোথাও তাঁর কোন চিহ্ন পেলেন না। বন্য জন্তুতে রাজকুমারকে বধ কল্লে রক্তের দাগ, তাঁর অস্ত্র শস্ত্র, ছেঁড়া কাপড় কিছু না কিছু পাওয়া যেত ; কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। তখন তাঁরা ফিরে গিয়ে রাজারানীকে এই সংবাদ দিলেন।

শুনে তাঁরা একবারে পাগলের মত হ'লেন। তাঁদের আহার, নিদ্রা চলে গেল। তাঁরা রাজধানী ছেড়ে, সেই বনের মধ্যে, তাঁবু ফেলে বাস কত্তে লাগ্‌লেন। সমস্ত দিন লোক জন নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যাকালে নিরাশ হয়ে তাঁবুতে আসেন। অবশেষে তাঁরা স্থির কল্লেন যে, রাজ্যের একটা ব্যবস্থা করে, কোনও তীর্থে গিয়ে বাস কর্ব্বেন। এই সময় অজানাদেশের রাজমন্ত্রী এসে রাজাকে কুমারের স্বহস্তে লেখা এক পত্র দিলেন। পত্র পেয়ে রাজারাণীর আনন্দের সীমা রইল না। তাঁরা ভাব্‌লেন একি স্বপ্ন না সত্য! তাঁ'দের নিরাশ প্রাণে আশা এল। মন্ত্রীকে কুমারের সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন ক'রে তাঁরা বুঝ্‌লেন যে কুমার, সত্যই, নিজগুণে, অজানাদেশের অনুপম রূপগুণবতী রাজকুমারীকে লাভ করেছেন। তখন সমস্ত রাজ্যে মহোৎসব আরম্ভ হল। এই সময়ের মধ্যে, পাহাড় ভেদ করে, পথ প্রস্তুত হয়েছিল। রাজারাণী, মহাসমারোহে, অজানাদেশে চল্লেন। রাজকুমারীকে দেখে আর তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে তাঁরা ভাব্‌লেন, কুমারের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হয়েছে বটে। শুভদিনে বিবাহ ও তৎপরে অভিষেক সম্পন্ন হ'ল। দুইরাজ্য এক হ'ল; প্রজারা মহাসুখে বাস কত্তে লাগ্‌ল। একসঙ্গে তারা যে এমন রাজা, এমন রাণী পেলে, এতে দুই রাজ্যের লোকই গৌরব বোধ কল্লে। কিন্তু এত গৌরবের মধ্যেও রাজকুমার একটা লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন না। তিনি যে, সুড়ঙ্গপথে, বানরের মত চার হাতপায়ে ভর ক'রে, অজানারাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন, সে কথাটা প্রচার হয়েছিল। রাজকুমারীর একটী ছোট মামাত বোন, সেই কথা শুনে, মাঝে মাঝে, তাঁকে বল্‌ত;—"রাজা ভাই! রাজা ভাই! তুমি কেমন ক'রে সুড়ঙ্গ দিয়ে এসেছিলে, একবার, দেখাও না।" রাজকন্যার সখীদের মধ্যে অমনি হাসির রোল উঠ্‌ত।

শিলাগড়ে এসে রাজকন্যাও একটা লজ্জায় পড়েছিলেন। কুমার অরিজিৎ যখন বনের মধ্যে হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছিলেন, যখন তাঁর কোন সংবাদ

পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন রাজবাড়ীর একটী আদ্যিকালের বুড়ী শুনে বলেছিলেন, "দোষ মহারাজার আর মহারাণীর; তাঁরা কুমারকে ডাকিনীর বনে শিকার কত্তে যেতে মত দিয়েছিলেন কেন? তা' না হ'লে ত এমন ঘটত না। আমি, ভূঁই ছেড়ে, দিব্যি ক'রে, বলতে পারি যে ডাকিনীদের রাণী, কুমারের রূপ দেখে, তাঁকে বিয়ে কর্ব্বে বলে আটক করে রেখেছে।" এখন রাজকুমার ফিরে এলে, রাজকুমারীর প্রতি তাঁর ভালবাসা দেখে, তিনি বল্‌তে আরম্ভ কল্লেন "কেমন! আমি যা বলেছিলুম, তা' মিল্‌ল কি না দেখ! ডাকিনীর রাণী না হলে, যাদুবিদ্যা না জান্‌লে, কি এমন করে স্বামী বশ কত্তে পারে? আমাদেরও ত স্বামী ছিল, কিন্তু আমরা ত এমন বশ কত্তে পারিনে।" কথাটা শুনে রাজকুমারী হেসে কুমার অরিজিৎকে বল্লেন;—"তোমাদের দেশে এসে আমার বেশ সুনামটা হল; আমি ডাকিনী খ্যাতি পেলুম!" রাজকুমার বল্লেন;—"ডাকিনী ত নয়, ডাকিনীদের রাণী। তা' সে কথাটা কি মিথ্যা? ডাকিনীরা চোকোচোকী হলে তবে মানুষকে চতুস্পদ করে তোলে; কিন্তু যে চোকোচোকী হ'বার আগেই মানুষকে চার হাত পায়ে ভর কত্তে বাধ্য করেছিল, তা'কে ডাকিনীদের রাণী বল্লে কি অসঙ্গত হয়? আর স্বয়ং ভগবতী ত ডাকিনীদের রাণী; তবে লজ্জা কি?" রাজকুমারী বল্লেন, "বেশ! আমার গৌরবটা তবে বেড়ে গেল দেখ্‌চি।"

যা'হক রাজপুত্রের আর রাজকন্যার লজ্জার কারণ বেশী দিন রইল না। রাজকন্যার মামাত বোন্‌টী, একটু বড় হয়ে, বুঝ্‌লে যে দেশের রাজাকে সকলের সাম্‌নে চার হাতপায়ে ভর করার কথা বল্‌তে নাই। আর সেই আদ্যিকালের বুড়ীও, সময় হয়েছে বুঝে পৃথিবী থেকে সরে প'ড়লেন। কাজেই রাজকুমার রাজকুমারীর অপবাদ ঘুচ্‌ল; আমার কথাটীও ফুরুল।

——:*:——

দ্বিতীয়।

পাতালবাসী ঋষি।

বিন্ধ্যাচলে, বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির হ'তে পাঁচ ক্রোশ দূরে, একটী ছোট গ্রাম; তার নাম দেবীপুর। প্রায় একশ বছরের কথা, সেই গ্রামে এক বেণিয়া বাস কত্তেন। বেণিয়া বড় গরীব। সকালে উঠে, চাষাদের বাড়ী বাড়ী ঘূরে, তিনি সস্তা দামে, গম, ছোলা, মটর কিনে আন্‌তেন; তাঁর স্ত্রী যাতায় সেগুলি ভেঙ্গে আটা, ময়দা, ডাল, ছাতু তয়ের কত্তেন। বেণিয়া, আবার, তাই মাথায় করে, হাটে বিক্রী করে আস্‌তেন। স্বামী, স্ত্রী দু'জনার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে, সমস্ত দিনে, খরচ বাদ দশ আনা, বার আনার বেশী উপার্জ্জন হ'ত না। তা'তেই তাঁদের খাওয়া, পরা, মান-সম্ভ্রম-রক্ষা সব চল্‌ত।

কিন্তু এমন ঘরে জন্মিলেও তাঁদের মেয়ে হীরামণ ছিল অনুপম সুন্দরী। তেমন সুন্দরী রাজপ্রাসাদেও সর্ব্বদা দেখা যায় না। তা'র রূপ যেন সর্ব্বশরীর থেকে উথ্‌লে বেরুত। বড় বড় দু'টী চোক, টিকোলো নাক, লাল টুক্‌টুকে পাত্‌লা দুটী ঠোঁট, ভুরু দু'টী যেন তুলি দিয়ে আঁকা; কপালটীর গড়ন শুক্ল নবমীর চাঁদের মত; মুখখানির যে কি শোভা তা' বল্‌বার নয়। আঙ্গুলগুলি যেন আধ ফোটা চাঁপা ফুলের কলি; হাত, পা গুলি নধর, গোলাল; সমস্ত অঙ্গ এমনি নরম, যেন মাখম দিয়ে তৈয়ারী। কাঁচা সোণার মত রঙ্। মাথায় এক রাশ চুল; খুলে দিলে যেন ঠাকুরুণের প্রতিমার মত দেখাত। যে তা'কে দেখ্‌ত, বল্‌ত;—"শাপভ্রষ্টা হ'য়ে কোন দেবকন্যা পৃথিবীতে এসেছেন।"

মেয়েটীর যেমন রূপ তেম্‌নি গুণ। পাঁচ বছর বয়স থেকেই সে ঘরের

কাজ কত্তে শিখেছিল। মায়ের সঙ্গে সে কড়াইগুলি রৌদ্রে শুকুতে দিত, তুল্‌ত, বাছ্‌ত। থালা, ঘটী মাজা হ'লে কুয়ার কাছ থেকে বয়ে আন্‌ত। বাপ রৌদ্রে ঘুরে এলে, পাখা নিয়ে, তাঁকে বাতাস কত্তো। উঁচু কথা কা'রে বলে সে জান্‌ত না। খেলা কত্তে কত্তে পাড়ার সমবয়সী ছেলে মেয়েরা কখনও তা'কে মাল্লে সে অবাক্ হয়ে তা'দের মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌ত। তাদেরও কিছু বল্‌ত না, নিজের মা বাপকেও কিছু জানাত না। প্রতিবেশীরা বল্‌ত, "এমন মেয়ে বেণের ঘরে কখনও জন্মেনি।"

হীরামণের পাঁচ বছর বয়স থেকেই বিবাহের কথা চল্‌ছিল। কত লোকই যে তা'কে বউ কত্তে চাইত, তার গণনা নাই। তাদের মধ্যে অনেক ধনী লোকও ছিলেন। তাঁরা বল্‌তেন; 'মেয়েটীর যত ওজন তত সোণা দিয়ে তার গা মুড়ে দেব'। কেউ বল্‌তেন, 'এ মেয়েকে কি আর আমি সংসারের কাজ কত্তে দেব? সিংহাসনে বসিয়ে রাখ্‌ব, দাসীরা ওর সেবা কর্ব্বে। দশজনে দেখে বুঝ্‌বে, আমি কেমন বউ করেছি।'

দু' চার জন হীরামণের বাবাকে টাকার লোভ দেখা'তেন। তাঁকে আর ছাতু, ময়দা বিক্রী কত্তে হবে না; তাঁর খোলার ঘর ঘুচে যাবে; এই রকম নানা কথা বল্‌তেন। কিন্তু হীরামণের মা, বাপ বল্‌তেন;—"আমরা বেণে বটি; ছাতু, ময়দা বিক্রী করি; কসাইত নই যে মাংস বিক্রী করব।" শুনে আর কেউ টাকা কড়ির লোভ দেখাতে ভরসা কত্তোনা। তারপর হীরামণ তাঁদের প্রাণ; তাঁরাও হীরামণের প্রাণ; মা বাপ ভিন্ন সে ত আর কিছু জানেনা। ছোট বেলা বিয়ে দিলে সে যদি শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কাঁদে, তবে তাঁরা কেমন করে প্রাণ ধর্‌বেন! কাজেই তাঁরা পাঁচ বছরের মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেন না। হীরামণের বাবা বল্‌তেন; 'আমার মেয়ের একফোঁটা চোকের জলের দাম এক শ' মতির চেয়েও বেশী; আমি কি তা' ফেলাব? আমি অত ছোট মেয়ের বিয়ে দেবনা।"

এই রকমে ছয়, সাত ক্রমে আট বৎসর পূর্ণ হল। আর ত রাখা যায়

না। দেবীপুরের অন্য বেণেরা হীরামণের বাপকে দেখ্‌লেই বল্‌ত, "কিগো! মেয়ের বিয়ের কি কচ্ছো? তোমার মত্‌লবটা কি?" কেউ বা বল্‌ত, "হীরামণের বাবা একটা দাঁও খুঁজ্‌ছে, এক রাত্তিরে বড় মানুষ হবে এই ইচ্ছে।" একদিন তা'রা সকলে জুটে হীরামণের বাবাকে বল্লে; "তোমায় একটা কথা বল্‌তে এসেছি। আমরা রাজপুত নই যে ঘরে ধেড়ে মেয়ে রাখ্‌ব। যদি তুমি এই মাসের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না দাও, তোমার সঙ্গে আমাদের জল-চল থাক্‌বে না"।

কাজেই হীরামণের বাবা মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হ'লেন।

এই সংবাদটা প্রচার হ'বা মাত্র ঘটকের দল হীরামণের বাবার কুঁড়েখানি একবারে ঘিরে ফেল্‌লে। সকাল, দু'পর, সন্ধ্যা আর কিছু নাই, কেবল ঘটক—ঘটক—ঘটক। তা'দের পান, তামাক যোগান বেচারার পক্ষে কষ্টকর হ'ল। একদিন, একসঙ্গে, সাত যায়গা হ'তে সাতজন ঘটক এল। মিঠাপুর, সেখপুর, করণগড়, পাহাড়পুরা, হাতিশাল, বাঘমারি, সিংভূড়ি এই সাত যায়গার বড় বড় বেণিয়া মহাজনেরা বলে পাঠালে; 'যা কিছু খরচ পড়্‌বে, আমরা সব দেব, কেবল মেয়েটা আন্‌ব, রাজী হও।" কা'রও লাক টাকার কার্‌বার, কা'রও পাঁচটা উট, কা'রও দরোজায় হাতী বাঁধা থাকে; কা'রও গাড়ী, ঘোড়া জেলার হাকিমেরা চড়ে বেড়ান, এই রকম যা'র যা' গুণ ঘটকেরা একে একে বর্ণনা কত্তে লাগ্‌ল। অপর পক্ষের দোষ দিতেও ছাড়্‌লে না। কা'র ছেলেটা ভূতের মত কালো, কা'র ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, কর্ত্তা চোক্‌ বুজ্‌লে বিষয়, সম্পদ কিছুই থাক্‌বে না, কোন ছেলের মা পাড়াকুঁদুলী, এই রকম নানা কথা শুনিয়ে তারা হীরামণের বাবার মন ভাঙ্গ্‌বার চেষ্টা কত্তে লাগ্‌ল। তকাতকিত হ'লই, মারামারি হ'বারও উপক্রম হল। হীরামণের বাবা, বিরক্ত হ'য়ে, সাতজন ঘটককেই বিদায় দিলেন। শেষ হীরামণদের বাড়ীর দশ ক্রোশ পশ্চিমে অজয়গড় বলে যে সহরটা আছে, তার প্রসিদ্ধ সওদাগর হুকুম

চাঁদ শেঠের * ছেলের সঙ্গে বিবাহ স্থির হ'ল। হুকুম চাঁদের টাকা যে কত তা' কেউ গুণে বল্‌তে পার্‌ত না। সে অঞ্চলে এমন রাজা, জমিদার কি মহাজন ছিল না, যে হুকুম চাঁদের দশ, বিশ হাজার না ধার্‌ত। বড় বড় সাহেবেরা তাঁর একবারে মুঠোর ভিতর। কেউ টাকা ধার নিয়ে, কেউ বিনা ভাড়ায় তাঁর বাড়ীতে বাস করে, কেউ দশেরা ও বড়দিনের সওগাৎ খেয়ে, কেউবা মেমসাহেবের জন্যে হীরার-ফুল, মুক্তার কণ্ঠী উপহার পেয়ে তাঁর বাধ্য ছিলেন। রাজার মত তাঁর বাড়ী ঘর, রাজার মত তাঁর চাল চলন। দুটো দাসী দু'বেলা কেবল রূপার বাসন মাজ্‌বার জন্য নিযুক্ত ছিল। হাতী, ঘোড়া, উট, হরিণ, ময়ূর, বলদ, ছেলেদের পড়াবার জন্যে গুরুজী, সিপাই, শাস্ত্রী বড়মানুষী আসবাব কিছুরই অভাব ছিল না। হুকুম চাঁদের একটী মাত্র ছেলে; নাম ইন্দরচাঁদ; বয়স তের বৎসর, দেখ্‌তে কার্ত্তিকের মত। অতি শান্ত, সুবোধ, এই বয়সেই বাপের ডান হাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত দিন গদিতে বসে কাজ কত্তো; বড় মানুষের ছেলে বলে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দিন কাটা'ত না। হুকুমচাঁদ অতি সজ্জন, দাতা, পরোপকারী ছিলেন। সুতরাং আপত্তির কোনও কারণ ছিল না। দোষের মধ্যে এই যে হুকুম চাঁদের স্ত্রী কিছু বদ্‌রাগী; রাগ্‌লে তাঁর জ্ঞান থাকৃত না; নিজের ছেলে ইন্দরচাঁদকেও "বাঁদীর বাচ্ছা" বল্‌তেন। কিন্তু অত দেখ্‌লেত আর সম্বন্ধই হয় না। আর হীরামণের যেমন স্বভাব তা'তে তার উপর কারও রাগ যে বেশীক্ষণ থাকৃবে সে ভয় ছিল না। একটী মাত্র বউ, আদর হ'বেই হ'বে, এই ভেবে হীরামণের মা, বাপ মত দিলেন। সকলেই বল্লে;—"যেমন মেয়ে তেম্‌নি সম্বন্ধই জুটেছে।" এক বুড়ী

* পশ্চিমাঞ্চলের অনেক বেণিয়া যতদিন মাথায় মোট বহিয়া বা স্বহস্তে দাঁড়ী পাল্লা ধরিয়া ক্রয় বিক্রয় করে, ততদিন "সা" থাকে; দোকান পাতিয়া, চাকর রাখিয়া ব্যবসা চালাইলে "সাউকর" হয়; জমিদারী কিনিলে, হুণ্ডী ছাড়িলে ও টাকা লেনা দেনা করিলে "শেঠ" হইয়া দাঁড়ায়। মারোয়ারী শেঠ স্বতন্ত্র।

কেবল, যেচে এসে, হীরামণের মাকে বল্লে; "দেখ! অতবড় ঘরে কুটুম্বিতা করো না। জামাই এলে তুমি বসাবে কোথায়? খাওয়াবে কি? যদি তোমাদের কখনও মেয়ের বাড়ী যেতে হয়, এই হালে, কেমন করে যাবে? তুমি যেমন লোক তেমনি কুটুম্ব কর, সুখ হবে। ঘোড়ার সঙ্গে গাড়ীতে মেড়া জুত্‌লে মেড়ারই প্রাণ যায়!"

লোকে এটা ঈর্ষার কথা বলে উড়িয়ে দিলে।

মহাসমারোহে হীরামণের বিবাহ হ'ল। কত সোণার আসাসোটা, কত জরীর নিশান, কত রঙিণ খাসগেলাস, কত দেশী বিলাতী বাজনা যে এল তা' আর কি বলব? হীরামণের বাবা গরীব; তাঁর এমন শক্তি ছিল না যে বরযাত্রীদের থাওয়ান, উপযুক্ত আদর, অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু হুকুমচাঁদ নিজে সকল ব্যবস্থা কল্লেন। হীরামণদের বাড়ীর সাম্‌নে খোলা মাঠে বড় বড় তাঁবু পড়্‌ল। সেখানে বরযাত্রীদের বস্‌বার, থাক্‌বার, খাবার যায়গা হল। কাশী, লক্ষ্মৌ, দিল্লী থেকে প্রসিদ্ধ বাইজীরা এসে সেখানেই নাচ, গান কল্লে। বরযাত্রীদের, কন্যাযাত্রীদের সকলেরই ভোজনের আয়োজন হুকুম চাঁদ কল্লেন। দেবীপুরের ছো'ট বড় প্রত্যেক বেণিয়ার বাড়ীতে রূপার থালায় খাজা, ল'ড্ডু আর সেই সঙ্গে একসুট মির্জ্জাপুরি বাসন ও একখানা রেশমী কাপড় পাঠান হল। কাঙ্গাল, গরীব পেঠভরে পুরী, কচুরী খেয়ে তৃপ্ত হল। লোকে ধন্য ধন্য কত্তে লাগ্‌ল। মেয়েকে হীরা মুক্তায় মুড়ে, সোণালি কাজ করা তাঞ্জামে বসিয়ে, ঘরে নিয়ে যা'বার ব্যবস্থা হল। আগে, পাছে বিশ জন ঘোড়সওয়ার আর আটটা বড় বড় হাতী চল্‌ল। কাণে মুক্তার বীরবৌলি, গলায় পান্নার কণ্ঠী, রঙ-বেরঙের পোষাক পরা হুকুম চাঁদের বড় বড় কুটুম্ব আর বন্ধুর দল গরু-ঘোড়া-উটের গাড়ীতে ঝক্‌ মক্‌ কত্তে কত্তে মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন। দেবীপুর হতে অজয়গড় দশ ক্রোশ পথের দু'পাশে যত গ্রাম ছিল, তা' হ'তে হাজার হাজার লোক এসে মেয়ে দেখ্‌বে ব'লে সার দিয়ে দাঁড়াল।

মেয়ের রূপ আর হুকুমচাঁদের ঐশ্বর্য্য কোন্‌টার তারা অধিক প্রশংসা করবে তা বুঝ্‌তে পাল্লে না। বউ যখন অজয়গড়ে পৌঁছিল, তখন সেখানকার হাট, বাজার, পথ একবারে লোকে ভরে গেল। হুকুমচাঁদের গৃহিণী হীরার বালা আর মতির মালা দিয়ে বউ দেখ্‌লেন। বউ দেখে তাঁর আর আহ্লাদের সীমা রইল না। এমন মুখ, এমন গড়ন, এমন চুল, এমন রঙ কোন মেয়ের তিনি এ পর্য্যন্ত দেখেননি। হুকুমচাঁদ সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন ব'লে, মাসে দশ বিশ হাজার টাকা রোজগার কল্লেও, গৃহিণী তঁকে একজন অকর্ম্মা পুরুষ মনে কত্তেন। বৌ দেখা মাত্র তাঁর সে ভাবটা দূরে গেল। তিনি ভাব্‌লেন, কর্ত্তার বুদ্ধিশুদ্ধি, পছন্দ আছে বটে। তিনি আলপনা দেওয়া পীড়িতে হীরামণকে দাঁড় করিয়ে, সোণার ঝারি আর অখণ্ড তাম্বুল নিয়ে, বরণ করে ঘরে তুল্লেন। দিল্লী থেকে মুঙ্গের পর্য্যন্ত হুকুমচাঁদের স্বজাতীয় বড় বড় বেণিয়া সে যেখানে ছিল, সকলে এসে, বহুমূল্য যৌতুক দিয়ে, হীরামণকে দেখে গেল। নাচ, গান, ভূরিভোজন এক মাস অবধি চল্‌ল। হালুইকর ব্রাহ্মণেরা আর দাস দাসীরা শ্রান্ত হয়ে পড়্‌লে উৎসব শেষ হল। কিন্তু ছ' মাস পর্য্যন্ত "অজয়গড়ে এমন বউ কা'রও কখনও হয়নি" যে এই কথা বল্‌ত, গৃহিণী তার বাড়ীতে একথালা মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দিতেন।

এত বড় ঘরের বউ কি আর গরীব মা বাপের কাছে থাকা শোভা পায়? কাজেই, অল্পদিনের মধ্যে, হীরামণ শ্বশুর বাড়ীতে ঘর কত্তে এল। প্রথম প্রথম বেচারা বড় অসুবিধায় পড়্‌ল। বাপের একখানি মাত্র ঘর, তা'তেই তাদের খাওয়া, বসা, শোয়া সব হ'ত। এখানে তার এক এক কাজের জন্য এক একখানি ঘর। শোয়ার জন্য একখানি, কাপড়-ছাড়ার জন্য একখানি, চুল বাঁধবার জন্য একখানি, পূজো আহ্নিকের জন্য আর একখানি। এত ঘরে কি হবে, কোন ঘরে কোন জিনিসটা রাখা হবে, সে ঠিক কত্তে পাত্তোনা। তার পর ঘর চিন্‌তে, সিঁড়ি

চিন্‌তে তার বিপদ বোধ হ'ত। ঘরের পাশে দরদালান, দরদালানের পাশে বারাণ্ডা, বারাণ্ডার পাশে সরু গলি, গলির শেষে সিঁড়ী। একটা সিড়ী রান্নামহলের, একটা সদরবাড়ীর, একটা অন্দরের, একটা পূজাবাড়ীর। কোন্‌টা দিয়ে কোথায় যেতে হয় ঠিক করতে না পেরে সে হয়ত অন্দর মহলে না গিয়ে পূজাবাড়ীতেই গিয়ে পড়্‌ত। গয়না, কাপড় নিয়েত আরও বিপদ হ'ত। গয়নার ভারে রাত্রিতে তার সুনিদ্রা হ'ত না। তা'র উপর তাদের নাম পর্য্যন্ত সে কখনও শোনেনি, চেনা ত দূরের কথা। রতনচূড় আর গুলবাঁধ কোন্‌টা কোথায় পরে বেচারা তা' জান্‌ত না। শাশুড়ীর ইচ্ছা যে রোজ তা'কে নূতন রকমের কাপড় পড়িয়ে সাজান। তিনি বল্‌তেন আজ ফিরোজা রঙের, আজ পেঁয়াজী রঙের, আজ কাকড়িমা রঙের সাড়ী খানি পর। কোন রঙটা যে কি সে তা বুঝ্‌তনা। যে রঙের কাপড় সেই রঙের কাঁচুলি, ওড়না না পল্লে যে কি দোষ তা' তার মাথার ভিতর প্রবেশ কত্তো না। জরীর কাপড়ের কোন পিঠটা সদর, আর কোন পিঠটা অন্দর এ বুঝ্‌তে তার সাতবার কাপড় খানি উল্টে পাল্টে দেখ্‌তে হ'ত। আত্মীয় কুটুম্বের মেয়েদের এক এক জনের এক এক রকম পছন্দ। হুকুমচাঁদের ভগ্নীর দিল্লীতে বিবাহ হয়েছিল। তিনি বল্‌তেন "মোগলাই সাজে বৌকে যেমন দেখায় এমন আর কিছুতেই দেখায় না।" হুকুমচাঁদের শ্বশুরবাড়ী ছিল কাশীতে। তাঁর শাশুড়ী বল্‌তেন ;—"বেনারসী সাড়ী না পর্‌লে কি হিন্দুর মেয়ের শোভা হয় ?" কাজেই হীরামণকে দিনে তিনবার পোষাক বদ্‌লাবার কষ্ট স্বীকার কত্তে হ'ত। এর চেয়েও তা'র কষ্ট হত যে, সে দেখ্‌ত তার হাত, পা গুলো ক্রমশঃ অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেউ তা'কে খাইয়ে, কেউ আঁচিয়ে, কেউ কাপড় পরিয়ে দেয়। চুল বেঁধে দিবার, আল্‌তা পরাবার লোকত আছেই। কোন কাজই নিজে কর্ব্বার তার সুযোগ হয় না। বিয়ের তিন

দিন আগে সে কূয়া থেকে জল তুলেছে; আর এখন যদি সে কুঁজো থেকে একটু জল গড়ায়, অমনি, তিনটা চাকরাণী এসে তাকে উপদেশ দেয়, যে বড় মানুষের বউএর কি কাজ কত্তে আছে? তবে আমরা রয়েছি কেন? নিজের হাত, পা চালানর ত তার অধিকার নাই, সে দেখ্‌লে যে ভগবানের আলো, বাতাস হ'তেও তার অধিকারটুকু ঘুচে যাচ্চে। সে মাঠে ছুটাছুটি কত্তো, এখন জানালার ধারে দাঁড়ালেই একটা চাকরাণী এসে বলে যে, অমন যায়গায় কি দাঁড়াতে আছে? লোকে যে দেখ্‌তে পাবে। সে রোদে বসে ডাল বাছ্‌ত; রোদে তার মুখটা লাল হ'লে তার মা ভাব্‌ত মেয়ের আমার রূপ বাড়্‌চে। এখন সে খোলা ছাদে পা দিলেই একটা চাক্‌রাণী এসে বলে, "গায়ে রোদ লাগ্‌লে রঙ যে ময়লা হয়ে যাবে; সরে আসুন।" এখন সে রোদে দাঁড়িয়ে মাথার ভিজা চুল শুকুতে পায় না; কূয়াতলায় বসে তাজা জলে প্রাণভরে স্নান কত্তে পায় না। এই দুটো তার বড় অভাব বলে বোধ হ'ত; কিন্তু বোধ হলে উপায় কি? সে যে বড় মানুষের বউ হয়েছে। ফাগুন মাসে সে, জ্যোছনা রাত্রে, উঠানে বসে, আমের মুকুলের, লেবুফুলের গন্ধে পুলকিত হ'ত। সে দিন ত আর আস্‌বার নয়; কিন্তু উপায় কি? সে যে বড় মানুষের বউ হয়েছে। মানুষ ঠেকেই শেখে। হীরামণ ক্রমে সিঁড়ি চিন্‌লে, কোন্ গয়না কোথায় পর্‌তে হয় শিখ্‌লে, বড় মানুষের বউএর গায়ে আলো, বাতাস লাগা যে দোষ তাও বুঝ্‌লে। এক বৎসরের মধ্যে বড় মানুষের বউএর যা' হওয়া উচিত সে তাই হল।

অন্য বিষয়ে কিন্তু হীরামণের সুখের সীমা ছিল না। তার শ্বশুর, শাশুড়ী তাকে প্রাণের চেয়েও ভাল বাস্‌তেন। হুকুমচাঁদ পূর্ব্বে গদির কাজ না সেরে অন্দরমহলে আস্‌তেন না; এখন প্রহরে প্রহরে এসে খবর নেন "বউ মা কোথায়, কেমন আছেন?" একটী মাত্র বউ, তাকে নিতান্ত কচিবেলা এনেছিলেন ব'লে তিনি তার সঙ্গে কথা কইতেন। হীরামণের

আধ আধ মিষ্ট কথায় তাঁর কাণ জুড়িয়ে যেত। তাঁর বড় সাধ হ'ত যে হীরামণ তাঁর কাছে মতির সাতনরী কি হীরের কণ্ঠী, যা'হক একটা কিছু, মাঝে মাঝে চায়; তিনি দিয়ে তার হাসি মুখ দেখেন। কিন্তু হীরামণের যা' গয়না ছিল তাই সে পরতে পার্ত না; নূতন আর কি চাইবে! বউ যে কিছুই চায় না হুকুমচাঁদের এই একটা বড় ক্ষোভ ছিল। তবু তিনি তাঁর জন্মতিথির দিন, নূতন খাতা পত্তনের দিন, দশেরার দিন তাকে এক একখানা নূতন গয়না দিতেন। হীরামণ সেই গয়না পরে, হাস্‌তে হাস্‌তে, যখন তাঁকে প্রণাম কত্তো, তখন, তিনি একবারে পুলকিত হ'তেন। হুকুমচাঁদের স্ত্রী হীরামণের মুখে নিজের হাতে দুধের বাটী ধর্‌তেন, সে ঘুমিয়ে পড়্‌লে তাকে কোলে তুলে খাওয়াতেন, চুল বেঁধে দিয়ে, গয়না কাপড় পরিয়ে দশজনকে ডেকে ডেকে দেখাতেন। হীরামণের এক ননদ ছিল, তার নাম বসুমতী। বসুমতী ইন্দরচাঁদের চেয়ে ছোট কিন্তু হীরামনের চেয়ে তিন বছরের বড় ছিল। তার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না বলে সে প্রায়ই বাপের বাড়ীতে থাক্‌ত। মা, বাপের মত সেও হীরামণকে প্রাণ-ভরে ভালবাস্‌ত। সে তার পায়ে আল্‌তা পরিয়ে দিত; খোপায় মালা জড়াত; রাত্তিরে তার বিছানায় ফুল আর গোলাপজল ছড়িয়ে আস্‌ত। হীরামণের আদরের সীমা ছিল না।

কিন্তু যার আদরে স্ত্রীলোকের প্রকৃত আদর সে হীরামণকে সকলের চেয়ে বেশী আদর কর্‌ত। তার স্বামী ইন্দরচাঁদ তাকে যে কি চোকে দেখেছিল তা' বলে বুঝাবার নয়। হীরামণের বয়স আট, ইন্দরচাঁদের বয়স তের বৎসর মাত্র; বালক, বালিকা বল্লেই হয়। কিন্তু পরস্পরের প্রতি ভাল-বাসায় তারা প্রবীণকেও হারিয়েছিল। দু'জনে এক প্রাণ, এক মন; কেউ কারুকে চোকের আড়াল কত্তে চাইত না। ইন্দরচাঁদ গদির কাজ কত্তে কত্তে অন্দরমহলে চলে আস্‌ত। যেখানে হীরামণ আছে, একটা না ছল করে, সেখানে এসে তার সঙ্গে একবার চোকাচোকি করে আবার গিয়ে

কাজে বসত। হীরামনও যে জান্‌লা থেকে বা'রমহল দেখা যায়, মাঝে মাঝে, লুকিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াত। যদি ইন্দরচাঁদকে একবার দেখ্‌তে পায়। হুকুমচাঁদের আর তাঁর স্ত্রীর সাধ ছিল, বউ, বেটা একসঙ্গে বসুক, খেলুক, গল্প করুক; তাঁদের সে সাধ পূর্ণমাত্রায় মিটেছিল। একটা সাধ কেবল মিটে নাই; তাঁদের ইচ্ছে ছিল যে, তারা, মাঝে মাঝে, ছেলে-মানুষী ঝগড়া করুক, আর তাঁরা মিটিয়ে দিন। সেইটে হ'ত না; স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ঝগড়া হতে পারে সেটা তারা জান্‌ত না।

নয়, দশ, এগার, বার ক'রে হীরামণ ক্রমে পনর বৎসরে পা দিলে। পূর্ণিমার চাঁদের মত এইবার তার রূপ পূর্ণ হল। সে রূপ যে দেখ্‌ত সেই মুগ্ধ হ'ত; হুকুমচাঁদের ঘর সেই রূপে আলো কল্লে। কিন্তু কেবলই কি রূপ? ছেলেবেলা থেকে হীরামণের প্রকৃতিতে যে সকল গুণ দেখা গিয়েছিল, বয়সের সঙ্গে সেগুলিও পূর্ণতা লাভ কল্লে। হিন্দুর মেয়ের গুণ বাহিরে প্রকাশ কর্‌বার সুযোগ নাই; হীরামণেরও ছিল না। হিন্দুর মেয়ে, রোগীর সেবার জন্য, হাঁসপাতালে যেতে পারে না; বিদ্যালয় স্থাপন করে শিশুদের শিক্ষা দিতে জানে না; জলপ্লাবনে বা অগ্নিদাহে সর্ব্বস্বান্ত লোকের সাহায্যের জন্য চাঁদার খাতা নিয়ে বা'র হতেও শেখে না। কিন্তু সে পারে তার ক্ষুদ্র জগৎ অন্তঃপুরের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন কত্তে। সে হাঁসপাতালের রোগীর সেবা করে না, কিন্তু সেবা করে আপনার বৃদ্ধ বাপ মায়ের, শ্বশুর শাশুড়ীর, দেবর ননন্দার। সমস্তরাত্রি জেগে তাঁদের বাতাস কত্তে, অবিকৃত মুখে ডান হাত দিয়ে তাঁদের মলমূত্র পরিষ্কার কত্তে, তার বিরক্তি বোধ হয় না; একটা কিছু অসাধারণ কাজ কচ্চি এও সে ভাবে না। মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে যায়; সে গুরুজনের আহার হয়নি বলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা সহ্য ক'রে বসে থাকে। তাঁদের খাওয়া হলে পাতে যা' থাকে, অনেক সময়, তাই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সে অন্যের বালিকাকে শিক্ষা দেবার সুযোগ পায় না, কিন্তু নিজের দৃষ্টান্তে শিক্ষা দেয় আপনার

বালিকাগুলিকে। প্রভাতে গৃহদেবতাকে প্রণাম ক'রে, তুলসীর মূলে জল দিয়ে, অতিথি অভ্যাগতের জন্য অন্ন, ব্যঞ্জন পাক ক'রে, সায়াহ্নে হরি-কথা-শ্রবণে অশ্রুপাত ক'রে সে যে শিক্ষা দেয়, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মপ্রসঙ্গহীন পুস্তক পাঠে সে শিক্ষা হয় না। যাঁরা চাঁদার খাতা নিয়ে বার হন, তাঁদেরই মধ্যে* অনেকে, হয়ত, বাটিতে ভিখারী ঢুক্‌লে পুলিশ ডাকেন; রুগ্ণ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবার জন্য বেতনভোগী শুশ্রূষাকারীর প্রয়োজন দেখেন। হীরামণ হিন্দুর ঘরে জন্মেছিল, সুতরাং তার গুণ হুকুমচাঁদের অন্তঃপুরেরই মধ্যে আবদ্ধ ছিল। হুকুমচাঁদের গৃহে দাস দাসীর অভাব ছিল না; তবু হীরামণ শাশুড়ীর পা টিপে দিত; গায়ের ঘামাচি মার্‌ত, মাথার পাকা চুল তুলত। কোন বার ব্রতে তিনি উপবাস কল্লে, পরদিন, স্বহস্তে তাঁর জলখাবার সাজিয়ে রাখ্‌ত; তাঁকে না খাইয়ে নিজে জলস্পর্শ কর্‌ত না। এখন আর দাসীদের কথায় সে চল্‌ত না, ফিরত না, বড় মানুষের বউএর কাজ কত্তে নাই শুনে অবাক হ'ত না। সে শ্বশুরের সন্ধ্যাহ্নিকের আসন পাত্‌ত, পূজার ফুল, বিল্বপত্র সাজাত, চন্দন ঘস্‌ত। হীরামণের কাজগুলিও তার শ্বশুর শাশুড়ীর এমন মনোমত হ'ত যে আর কারও কাজ তেমন হ'ত না। সে সর্ব্বৎ তৈয়ার কল্লে যেমন ঠাণ্ডা, যেমন সুগন্ধ হয়, রুটীতে ঘি জল মাখালে যেমন মোলায়েম, যেমন সুস্বাদ হয়, তাঁরা দু'জনেই ভাবতেন, আর কা'রও হাতে তেমন হয় না। এত লোকজন থাক্‌তে হীরামণ কাজ করুক্ এ তাঁদের ইচ্ছা নয়। কিন্তু হীরামণ কাজ না করে থাক্‌তে পারে না, আর তার মত কাজও অন্যে কত্তে পারে না, ভেবে দু'জনেই তার মতে মত দিতেন। শাশুড়ীর মুখে হীরামণের সুখ্যাতি ধরত না। কেউ জিজ্ঞাসা কল্লে বল্‌তেন; "হীরামণের সেবাতেই আমি বেঁচে আছি।" কিন্তু তাঁর মনটা ভিতরে ভিতরে বল্‌ত, "গরীবের মেয়ে এনেছিলুম বলেইত এত সেবা কচ্চে; সমান ঘরের মেয়ে হ'লে কি এত কত্তো?" হীরামণের দিন এইরূপে গত হচ্ছিল।

হীরামণের গুণের কথা বলেছি। একটা দোষের কথা বলি; তা'কে দোষ বা গুণ পাঠক পাঠিকারা যা ইচ্ছা বল্‌তে পারেন। সেটা তার বাপের বাড়ার প্রতি অতিরিক্ত টান। হীরামণের বাপের সম্পদের মধ্যে ছিল একখানি শোয়ার ঘর আর একখানি রাঁধবার চালা, একটী আমের, আর দু' তিনটী সর্‌বতিয়া লেবুর গাছ। কিন্তু হীরামণের কাছে রাজার ঐশ্বর্য্যের চেয়েও সেগুলি আদরের ছিল। শ্বশুরের রাজপ্রাসাদের মত বাড়ীর মধ্যে থেকেও সে ভাব্‌ত তার বাপের সেই পাঁচচালা ঘরখানি। তার শ্বশুরের বাগান থেকে কত রকমের আম ঝুড়ি ঝুড়ি ভাঁড়ারে জমে থাক্‌ত। কিন্তু সে যে জ্যৈষ্ঠ মাসে, মায়ের সঙ্গে, গাছপাকা আমগুলি তলা থেকে কুড়িয়ে আন্‌ত, শ্বশুরের বাগানের আম তার তেমন মিষ্টি বোধ হ'ত না। কখন্ তাদের সর্‌বতিয়া লেবুগাছে ফুল ধরে, কখন ফল হয়, কখন ফল পাকে, তা' তার মনে পাথরে ক্ষোদা অক্ষরের মত লেখা ছিল; খাওয়া, পরা সকল বিষয়েই তার মনে পড়্‌ত বাপের বাড়ীর কথা। সে কা'রও কাছে মনের ভাব প্রকাশ কত্তে পাত্তোনা, কিন্তু বাপের বাড়ীর দৃশ্য, দিনরাত তার চোকের কাছে ভাস্‌ত। ক্ষীর, ছানা, মাখমের স্বাদ পেয়েও তার মনে পড়্‌ত তার মায়ের হাতগড়া সেই আটার রুটীগুলি। আধপোড়া হ'লেও কেমন নরম, তাতে কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ। দু'পর বেলা দাসীরা যখন তাকে গোলাপ দেওয়া সর্ব্বৎ খাওয়াতে আস্‌ত, তখন তার মনে হত তার বাবা, এমনি সময়, গমের থলে মাথায় নিয়ে, ঘরে ফিরে আসেন। মা কাজে ব্যস্ত থাক্‌লে তাঁর হাত, মুখ ধোবার জল দেওয়ারও লোক থাকে না; তিনি নিজেই কূয়া থেকে জল তুলে হাত, মুখ ধোন। তার চোক্‌জলে ভরে যেত; সে সর্ব্বতের বাটী মুখে তুলে নামিয়ে রাখ্‌ত। তার স্নানের ঘরে বোতল বোতল ফুলল তেল সাজান থাকৃত; সে যেন চোকের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেত, তার মায়ের মাথায়, তেলের অভাবে, রুক্ষ চুলগুলি উড়্‌চে। তার পেট্‌রীতে কাপড় ধরে না; একটু ছিঁড়্‌লে বা মচ্‌কালে দাসীরা বলে, "ও কাপড় কি

পর্‌তে আছে? নিন্দা হ'বে যে; ও কাপড় আমাদের দিন।" বউএর কাপড় ছিঁড়েছে শোন্‌বামাত্র শাশুড়ী গাঁট গাঁট রঙবেরঙের কাপড় আনিয়ে দিতেন; রাখ্‌বার স্থান হ'ত না। হীরামণের তখন মনে হ'ত, মা আমার কতদিন ভিজা কাপড়ে দিন কাটান; অর্দ্ধেক কাপড় পরে বাকী অর্দ্ধেক রৌদ্রে শুকিয়ে নেন। সকল সময়ই তার মনে এইরূপ চিন্তা হ'ত। মা বাপের কথাত ভাব্‌তই; বাপের বাড়ীর পায়রাগুলির কথা, মঙ্গ্‌লি গাইএর কথা, গাছগুলির কথাও সে ভুল্‌তে পাত্তোনা। বাপের বাড়ী থেকে কেউ কখন এলে সে, লুকিয়ে লুকিয়ে, এগুলিরও খবর নিত। তার সর্ব্বদা ইচ্ছে হ'ত বাপের বাড়ী যায়; মায়ের কাছে, পা ছড়িয়ে বসে, শ্বশুরবাড়ীর কথা গল্প ক'রে; তাঁর রুক্ষ মাথায় তেল মাখিয়ে দেয়; রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত বাপকে বাতাস করে; নিজে যে সর্ব্বত্‌ তয়ের কত্তে শিখেছে, তাই একটু তাঁকে খাওয়ায়। কিন্তু হুকুমচাঁদ শেঠের বউএর পক্ষে কোথাও যাওয়া আসা ত সহজ ব্যাপার নয়। বউ কোথায় গিয়ে থাক্‌বে, কি খাবে, কি করে আব্‌রু রক্ষে হ'বে, অনেক ভাব্‌নার কথা। তাঁবু, চাকর, চাকরাণী, সান্ত্রী, পাহারা পাঠাতে হ'বে; মুখের কথাত নয়, অনেক আয়োজন আবশুক। তবুও হুকুমচাঁদ, বৎসরে একবার, বউকে, সাজ, সরঞ্জাম সঙ্গে দিয়ে, বাপের বাড়ী পাঠাতেন; কিন্তু, হীরামণের মন তা'তে তৃপ্ত হ'ত না। সে চাইত, দু'এক মাস অন্তর, এক এক বার যায়। বেশী দিনের জন্য নয়; এক ঘণ্টার জন্যও মা বাপকে দেখ্‌লে, "মা, বাবা" বলে ডাক্‌তে পাল্লে, তার প্রাণ জুড়ুত। কিন্তু সে সাধ ত পূর্ণ হ'বার নয়; সে যে বড় মানুষের বউ হয়েছে। মনের সাধ তাকে মনেই চেপে রাখ্‌তে হ'ত।

বাপের বাড়ীর প্রতি এই অতিরিক্ত টানের জন্য সত্যই একটা দোষ জন্মেছিল। তার ইচ্ছা হ'ত, নিজের পুরাণ কাপড়গুলি যা' দাসীরা নিত, তা' আর দু'এক বোতল তেল মায়ের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। অনেক দিন

মনের ইচ্ছা চেপে রেখে রেখে সে, একবার, সুযোগ পেয়ে, আপনার এক-খানি পুরাণ কাপড় মায়ের জন্যে পাঠিয়ে দিলে। এক দাসীর সেই কাপড় খানির উপর লোভ ছিল। সে জানতে পেরে হীরামণের শাশুড়ীকে গিয়ে জানা'ল ; কিন্তু বউ লজ্জা পাবে ব'লে তিনি কোন কথা বল্লেন না। তাঁর ক্ষোভ হ'ল, বউ আমায় বল্লেনা কেন ; আমি যে কাপড়ের বস্তা পাঠিয়ে দিতে পাত্তুম। কিন্তু বউ যে মুখফুটে তাঁর কাছে, বাপের বাড়ীর জন্য, কিছু চাইতে পারে না, সে কথা তাঁর মনে উদয় হ'ল না।

একবারের পর দু'বার, দু'বারের পর তিন বার, কখনও, পুরাণ কাপড়, কখনও তেল, কখনও বা তেলমাখা শ্বেত পাথরের একটা বাটী হীরামণ বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিত। তার বাবা গরীব হ'লেও লোভী ছিলেন না ; মেয়ের পাঠান জিনিস নিতে তাঁর ইচ্ছা হ'ত না। কিন্তু পাছে হীরামণ মনে কষ্ট করে, আর অতি সামান্য জিনিস, এই ভেবে নিতেন। কিন্তু এই নিয়ে হুকুমচাঁদের দাসীমহলে একটা আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। হীরা-মণ ভাবত কেউ কোন কথা জানে না ; কিন্তু দাসীরা যে সর্ব্বজ্ঞ বেচারার সে বোধ ছিল না। তা'দের আক্রোশেরও কারণ ছিল। তারা জানত পুরাণ কাপড়গুলিতে তাদেরই অধিকার ; তেলের খালি বোতল-গুলি তাদের নিজস্ব। এখন বউ যদি সেগুলি থেকে তা'দিগকে বঞ্চিত করেন, তবে তা'দের উপরি পাওনা কি রইল ? উপরি পাওনার জন্যেই ত চাকর, দাসীরা বড় মানুষের বাড়ী রাত দিন পড়ে থাকে, লাথি, ঝাঁটা খায় ; কাজেই তা'দের রাগ হ'ত। সুযোগ পেয়ে তারা আপনারাই পরস্পরের অজ্ঞাতে দু'একটী জিনিষ সরাতে আরম্ভ কল্লে ; ভাবলে বউএরি উপর দোষ চাপাবে। একখানি মির্জ্জাপুরী আসন আর একখানি পদ্মকাটা জগন্নাথী রেকাব পাওয়া গেল না। হীরামণ তার কিছুই জানত না ; কিন্তু যে দাসী নিজে স'রিয়েছিল, সে আর সকলকে বোঝালে ও বউঠাকুরুণেরই কাজ। এই সকল দেখে গৃহিণীর প্রিয় দাসী শঙ্করী

একদিন তাঁকে বল্লে ; "গিন্নী মা! আমাদের আর কাজ করা হ'ল না। বউঠাকৃরুণ রোজ রোজ বাপের বাড়ীতে তেল, গামচা, বাসন, কাপড় পাঠাবেন, আর বদ্‌নাম হ'বে আমাদের। কোন্ দিন সোণা দানা পাঠাবেন, আর আমাদের হাতে দড়ী পড়্‌বে।"

গৃহিণী শঙ্করীকে ধমক দিয়ে বল্লেন "চুপ! আমার বউ আমার জিনিস পাঠাবে, তোর বাবার কি? ফের যদি বউএর নামে কিছু বল্‌বি, তোর জিব কেটে দেব।" গৃহিণী শঙ্করীকে শাসন কল্লেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাব্‌লেন, ছোট লোকের মেয়ে ঘরে এনে কি অন্যায় কাজই করেছি। রূপ দেখে ভুলেছিলুম, এখন গুণ বেরুচ্চে। হীরামণ এর বিন্দু বিসর্গও জান্‌তে পাল্লে না। শঙ্করী গজ্‌গজ্ কত্তে কত্তে চলে গেল।

হীরামণের মায়ের, কখনও, রেশমী কাপড় অঙ্গে ওঠেনি। হুকুমচাঁদের বাড়ীতে রেশমী কাপড়ের ত ছড়াছড়ি। হীরামণ দেখ্‌ত, পূজা আহ্নিকের সময়ে, সকলেই রেশমী কাপড় পরে। সে ভাব্‌ত মার যদি একখানি রেশমী কাপড় হয়, মহাষ্টমীর দিন প'রে তিনি বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা কত্তে যেতে পারেন। আমার ত পেট্‌রি ভরা রেশমা কাপড় রয়েছে। একখানি কম দামের সাদাসিধা কাপড় তাঁর জন্যে পাঠিয়ে দিই, পরে শাশুড়ীকে বল্‌ব। পাঠাবার একটা সুযোগও ঘট্‌ল। হীরামণের বাবা গাছের গোটা কত সর্‌বতিয়া লেবু, একজন লোকের সঙ্গে, কুটুম্ববাড়ীতে তত্ত্ব পাঠিয়েছিলেন। হীরামণ তার কাছে লুকিয়ে একখানি রেশমী কাপড় মায়ের জন্যে পাঠা'ল। সর্ব্বজ্ঞ দাসী শঙ্করী জান্‌তে পেরে দেউড়ীর দরোয়ানকে টিপে দিলে। দরোয়ান লোকটা বেরিয়ে যাবার সময় ধ'রে তার পুঁটুলি খুলে সেই কাপড় বার কল্লে। দু'একটা চড় চাপড় খেয়ে বেচারা বলে ফেল্লে যে, হীরামণ তার মায়ের জন্যে সেই কাপড় পাঠিয়েছে। কথাটা ক্রমে দরোয়ান, চাকর, কর্ম্মচারী সকলের কাণ হ'তে হুকুমচাঁদের কাণে গেল। হুকুমচাঁদ কাপড়খানি লুকিয়ে রেখে সকলকে বলে দিলেন,

এ কথা যেন আর প্রচার না হয়; গিন্নী যেন এ কথা জান্‌তে না পারেন। কিন্তু যা' এত লোকের কাণে গিয়েছে, তা' কি আর গিন্নীর কাণে যেতে বাকী থাকে? শঙ্করী তাঁকে গিয়ে বল্লে; "মা! আমার জিব কেটে দিতে চেয়েছিলেন, এখন কত লোকের জিব কাট্‌বেন? হাটে, বাজারে যে টি টি পড়ে গেছে। গরীব লোকেরাই চোর, আর বড় লোকেরাই সাধু।" গিন্নী কোন উত্তর দিলেন না; তিনি শঙ্করীর সাহায্যে কর্ত্তার গদির তাকিয়ার নীচে থেকে সেই কাপড়খানি উদ্ধার কল্লেন। পূর্ব্বদিন কি একটা ব্রতের জন্য তিনি ফলমূল খেয়ে ছিলেন, আজ আহার কত্তে যাবার পূর্ব্বে এই সংবাদ পেয়ে তাঁর আপাদমস্তক জ্বলে উঠ্‌ল। এমন ছোটলোকের মেয়ে ত হুকুমচাঁদের কুলে কখনও আসে নি। লোক, জন, কর্ম্মচারী সকলের কাছে মাথা কাটা গেল। ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌! এর একটা প্রতীকার করা আবশ্যক এই ভেবে তিনি কাপড়খানি হাতে নিয়ে হীরামণের ঘরে প্রবেশ কল্লেন। তাঁর কন্যা বসুমতী আর এক পাল দাসী সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। তাঁর চণ্ডীমূর্ত্তি দেখে কার'ও কোন কথা বল্‌বার সাহস ছিল না। তিনি কাপড়খানি ঘরের মেজেয় ফেলে দিয়ে হীরামণকে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"বউ! এ কাপড় তোমার বাপের বাড়ীর লোকের কাছে কেমন করে গেল?"

হীরামণ ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লে, "মা! আমি দিয়েছি।"

গৃহিণী। "তুমি দিলে কেন?"

হীরামণ। "আমার মা কখনও রেশমী কাপড় পরেন নি। একখানি পেলে তাঁর পূজাপাঠের সুবিধা হবে ভেবে পাঠিয়েছিলুম; ভেবেছিলুম পরে আপনাকে বল্‌ব।"

গৃহিণী। "তোমার মা ভিকিরীর ঘরে জন্মেছে, ভিকিরীর হাতে পড়েছে। তার রেশমী কাপড় পরবার সাধ কেন? ছেঁড়া ন্যাকড়ায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন!"

হীরামণের বুকে শেল ফুট্‌তেছিল; কিন্তু সে ধীর ভাবে বল্লে;—"মা! তিনি নিজে রেশমী কাপড় পর্‌তে চান নি; আমিই তাঁর জন্যে পাঠিয়েছিলুম। কাপড়খানির এক কোণ একটু ছেঁড়া ছিল; অমন কাপড় আপনি কতবার দাসীদের দিয়েছেন!"

গৃহিণী। "তোমার মা যখন আমার বাড়ীর দাসী হবে, তখন তাকে পুরাণ কাপড় দেব।"

এইবার হীরামণের চক্ষুতে জল এল। সে হাতযোড় করে বল্লে;—"মা! আমি অন্যায় কাজ করেছি।"

গৃহিণী। "অন্যায় কাজ একবার করেছ? এক শ' বার করেছ। মির্জ্জাপুরী আসনখানি কি হল?"

হীরামণ। "মা। আমি তার কিছুই জানি না। আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, আমি তা' কারুকে দিই নি।"

যে দাসী সেখানি সরিয়েছিল, সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে;—"বউঠাকরুণ, মায়ের পূজোপাঠের জন্যে, রেশমী কাপড় পাঠিয়েছিলেন, বাপের সন্ধ্যাহ্নিকের জন্যে কি কিছু দেন নি? আসনখানি বোধ হয় তিনিই পাঠিয়েছেন।"

নিকটে একখানি ময়ূরপুচ্ছের পাখা ছিল। গৃহিণী সেইখানি নিয়ে যে দাসী এই কথা বলেছিল, তার পিঠে দু'ঘা দিয়ে বল্লেন; "হতভাগি! ভাল্‌কি! * আমি আমার বউকে শাসন কচ্চি; তুই কথা কইবার কে রে? শঙ্করি! শুভাসিংকে বল্‌, ওর গলা টিপে দেউড়ী পার করে দেয়।"

গৃহিণী তার পর হীরামণের দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "বউ! শোন; তুমি গরীবের মেয়ে জেনেও আমি তোমায় ঘরে এনেছি; কিন্তু তুমি যে চোর তা'ত জানতুম না; আমি দুধ কলা দিয়ে কি কালসাপ পুষ্‌চি!"

"তুমি যে চোর" একথাটা হীরামণের মনে বড় লাগ্‌ল। সে একটু

* ভল্লুকীর অপভ্রংশ।

উত্তেজিত ভাবে বল্লে ;—"মা! আমায় চোর বল্‌চেন কেন? আমিত অন্য কা'রও জিনিস নিইনি, আমার নিজের জিনিস আমার মার জন্যে পাঠিয়েছিলুম।"

গৃহিণী। "তোমার নিজের জিনিস! তোমার বাবা তোমায় দিয়েছিল?"

হীরামণ ভাব্‌লে একটু রহস্য কল্লে হয়ত গৃহিণীর রাগ পড়্‌বে। বাপ আর শ্বশুর ত ভিন্ন ন'ন। সে একটু হেসে বল্লে ;—"হাঁ! আমার বাবা আমায় দিয়েছিলেন।"

গৃহিণী ভাব্‌লেন, আমার কথায় সমান উত্তর! চুরী করে আবার জোর! বলে কিনা আমার বাবা আমায় দিয়েছেন! তাঁর ধৈর্য্য লোপ হ'ল। তিনি চীৎকার করে বল্লেন ;—"বাঁদীর বাচ্ছা! আমার কথায় সমান উত্তর! যাও তোমার বাপের বাড়ী; দেখি তোমার কোন্‌ বাবা তোমায় কেমন ভাত কাপড় দেয়।"

হীরামণের স্বামী ইন্দরচাঁদ এই সময়ে সেখানে এসেছিল। মায়ের চেহারা দেখে সে ভয়ে কাঁপ্‌ছিল; একটা কথা বল্‌বারও তার সাহস ছিল না। গৃহিণী ইন্দরচাঁদকে দেখে বল্লেন ;—"দ্যাখ্‌ ইন্দিরে! যতদিন না তুই তোর স্ত্রীকে এ বাড়ী থেকে বিদেয় কর্ব্বি, ততদিন আমি জলস্পর্শ কর্‌ব না। যদি করি আমি গন্দোরি শেঠের মেয়ে নই। কর্ত্তাকে গিয়ে এখনই বল্‌।"

ইন্দরচাঁদ ভয়ে সে স্থান ত্যাগ কল্লে। তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হয়েছে। ইন্দরচাঁদ, বসুমতী; কা'রও তখনও আহার হয় নি। গৃহিণী পূর্ব্বদিন অর্দ্ধাশনে ছিলেন; তিনি আহার কর্ব্বেন না শুনে কেউ আহার কত্তে চাইলে না। স্বয়ং কর্ত্তা থেকে দাস, দাসী সকলেই উপবাসী রইল। উপরোধ অনুরোধের ত্রুটি হ'ল না, কিন্তু গৃহিণী কা'রও কথায় কর্ণপাত কল্লেন না। তাঁর যে কথা সেই কাজ গৃহিণীর এই অভিমান ছিল। তার উপর তাঁর প্রিয় দাসী, শঙ্করী, নুন্‌কী, লছ্‌মণিয়া সকলেই সেখানে

উপস্থিত ছিল; তাঁর প্রতিজ্ঞা শুনেছিল; তারা কি মনে কর্ব্বে এই তাঁর ভাব্‌না হল। সেই জন্য উদরে ক্ষুধা ও মনে ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি জলস্পর্শ কল্লেন না।

সেদিন এইভাবে কাট্‌ল। পরদিনও গৃহিণী স্নানাহারের কোনও ইচ্ছা প্রকাশ কল্লেন না। রাগ তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা-দমনের শক্তিটাকে বাড়িয়েছিল; কিন্তু অপর সকলের পক্ষে উপবাস অসহ্য হল। বসুমতীর মাসদুই পূর্ব্বে একটী পুত্র হয়েছিল; একদিনের উপবাসে তার স্তনের দুধ শুকিয়ে গেল; শিশুটী কেঁদে বাড়ী মাথায় করে তুল্লে। হুকুমচাঁদ অনেকদিন অবধি শিরঃপীড়ায় কাতর ছিলেন। হাতে একখানি পাখা আর মাথায় একখানি ভিজা গামচা এই তাঁর সাথের সাথী ছিল। উপবাস তাঁর পক্ষে একবারে বিষবৎ জ্ঞান হ'ত। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে তিনি গৃহিণীর কাছে এসে বল্লেন;—"তোমার ইচ্ছাটা কি? বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া? তা' দাও; এমন করে নিজেও খুন হয়োনা, আমাদেরও খুন করোনা।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই হীরামণের বাপের বাড়ী যাওয়ার বন্দোবস্ত হল। বন্দোবস্ত এবার বৃহৎ নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে হীরামণের সঙ্গে তাঁবু যেত, দাসদাসী যেত, পাহারা দেবার জন্যে তলোয়ার হাতে সিপাহী যেত। এবার সে সকলের কিছুই ছিল না। যে লোকটা হীরামণের বাপের বাড়ী থেকে সর্ব্বতিয়া লেবু এনে ছিল, তার বাজারে কি কাজ ছিল বলে তখনও যায় নি। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল। তারই সঙ্গে, যে বয়েলগাড়ীতে হুকুমচাঁদের চাকরাণীরা যাতায়াত করত, সেই গাড়ীতে পোয়াল খড়ের উপর বসিয়ে, ছত্রীর উপর একখানা কম্বল ঢেকে, হীরামণকে পাঠান স্থির হ'ল। হুকুমচাঁদের এভাবে বউকে পাঠাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু গৃহিণীর পণ ছিল, হীরামণকে আর সেই সঙ্গে তার মা বাপকেও শাসন করা। তিনি কর্ত্তার মনের ভাব বুঝে বলে পাঠালেন;—"বউকে আবার ফিরে নেবেন বলে বুঝি ভিতরে ভিতরে ইচ্ছে আছে?

আমি বেঁচে থাকতে তা' হবে না। যে বউকে ত্যাগ কল্লুম, তার আবার খাতির কি? ভিকিরীর মেয়ে, ভিকিরীর মত যা'ক।" অনাহারের ভয়ে হুকুমচাঁদ এই ব্যবস্থাতেই সম্মত হ'লেন। গৃহিণী ভেবেছিলেন যে, হীরামণ, দাসীদের সাম্‌নে, তাঁর পায়ে পড়ে, ক্ষমা চাইবে। তা'হলে তিনি তাকে, আপাততঃ, বাপের বাড়ী পাঠিয়ে আবার ঘরে আন্‌বেন। কিন্তু লজ্জায়, ভয়ে আর মনের কষ্টে হীরামণ তাঁর কাছে এগুতে সাহস কল্লে না। তিনি শঙ্করীকে বল্লেন;—"দেখেছিস্! এইটুকু মেয়ে তার কত বড় তেজ! আমার কাছে এল না। আচ্ছা আমিও গন্দোরি শেঠের মেয়ে, দেখ্‌ব, কত দিন তেজ থাকে। আমি এই মাসের মধ্যে আবার ছেলের বিয়ে দেব।" শঙ্করী বল্লে;—"তোমাদের বড় ঘরের কথায় আমরা কি বল্‌ব? আমাদের ছোটলোকের ঘরের বউ যদি শাশুড়ীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে, আমরা তার দাঁত ভেঙ্গে দি। রূপের গুমর কদ্দিন গো; একবার দেবী-মায়ের অনুগ্রহ হ'লে রূপ ত বেরিয়ে যাবে।"

গৃহিণী বল্লেন;—"ছাখ্ শঙ্করি! তোরে সাবধান করে দিচ্চি; আমার বউএর যদি ও রকম অমঙ্গলের কথা বল্‌বি, তোর মুখ-দর্শন কর্ব্ব না। আমার বউকে আমি গাল মন্দ দেব, তোরা কথা কইবার কে? খবরদার! তুই ত যত নষ্টের মূল। তোকে যে আমি, খরচ দিয়ে, একমাস দেবীপুরে রেখেছিলুম, সে কি কেবল মেয়ের চুল, চেহারা দেখবার জন্যে, না তা'র চাল, চলন, মেজাজ সমস্ত বোঝবার জন্যে? আমি রাগী মানুষ, ভেবেছিলুম শান্ত মেয়ে ঘরে আন্‌লে ঝগড়া, বিবাদ হ'বে না। তুই এসে আমায় বল্লি যে, 'এমন ঠাণ্ডা মেয়ে বেণের ঘরে কখনও জন্মেনি।' তাইত আমার মন গলে গেল; তা' না হলে কি আমি একটা পথ ভিকিরীর ঘর থেকে মেয়ে আনি? এই তোর ঠাণ্ডা মেয়ে! শাশুড়ীর কথায় সমান উত্তর দেয়! আমি বউকে আজ বিদেয় কল্লুম, কাল তোকেও দূর কর্ব্ব।" শঙ্করী তাঁকে চিন্‌ত, কোন জবাব দিলে না।

হীরামণের দামী কাপড় আর গহনার সিন্ধুকের চাবি তার শাশুড়ীর কাছেই থাকৃত। গায়ে বারমেসে কয়খানি গহনা ছিল। হীরামণ সেগুলি খুলতে যাচ্চে দেখে বসুমতী বল্লে ;—"বউ! তোমার পায়ে ধরি, অমন কাজ করো না। আজ একাদশী, গায়ের গহনা খুলো না, দাদার অমঙ্গল হবে।" শুনে হীরামণ গায়ের গহনা খুললে না; গৃহিণীও সেজন্য তাকে কিছু বল্লেন না। গরুর গাড়ী খিড়কীর দরোজায় দাঁড়িয়ে ছিল। শুনে গৃহিণী অন্য ঘরে চলে গেলেন। হীরামণের শুষ্ক মুখ আর জলভরা চোক দেখে তাঁরও চোকে জল এসেছিল; কিন্তু দাসীরা পাছে দেখে, এই ভয়ে তিনি আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। একখানি মাত্র কাপড় পরে, চোকের জল মুছ্তে মুছ্তে, হীরামণ গিয়ে গাড়ীতে উঠ্ল। শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম কর্ব্বার, স্বামীর নিকট বিদায় নেবার তার সুযোগ হ'ল না। হীরামণ যখন গাড়ীতে ওঠে, তখন একটা লোক রাস্তার পাশে কূয়া থেকে জল তুল্‌ছিল। শেঠের বাড়ীর কোনও মেয়ে যাবে বুঝে সে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে ছিল। হীরামণের গায়ে অধিক গহনা না থাকৃলেও, যা' ছিল, তার দাম দু' তিন হাজার টাকার কম নয়। তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যগুণে তাকে অলঙ্কারে ভূষিতার মত দেখাচ্ছিল। সেই লোকটা বিড়াল যেমন আমিষ দেখে, তেমনি হীরামণকে দেখ্‌লে; তার পর গাড়োয়ানের কাছে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে,—"ভাইয়া! গাড়ী কোথা যাবে?" গাড়োয়ান বল্লে "দেবীপুর।"

"কতক্ষণে পঁহুছিবে?"

গাড়োয়ান উত্তর দিল ;—"দশ ক্রোশ পথ; ডাইনের গরুটার পায়ে একটু বেদনা আছে, আজ যে পঁহুছিতে পার্ব্বে এমন বোধ হয় না। দেখ্‌চি, আজ পাতালপুরেই রাত কাটাতে হবে। কাল এক ঘড়ীর মধ্যে পঁহুছিবে।"

সেই লোকটা শুনে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

হীরামণ চলে যাওয়ার পর গৃহিণী স্নানাহার কল্লেন; অপর সকলেও

কল্লে। শরীরটা ঠাণ্ডা হ'লে মনও ঠাণ্ডা হয়। গৃহিনী তখন বুঝ্‌লেন যে, হীরামণকে ওরূপ ভাবে বিদায় দেওয়া অতি গর্হিত কাজ হয়েছে। বালিকার অশ্রুমাখা মুখখানি তাঁর মনে পড়্‌ছিল। আর সেই সঙ্গে মনে হচ্ছিল, একটীমাত্র বউকে এমন করে বিদায় দিয়ে, তিনি কেমন করে সমাজে মুখ দেখাবেন? হীরামণের কষ্ট না বুঝুন, অত বড় ধনী, মানী স্বামীর মর্য্যাদাটা বোঝা কি তাঁর উচিত ছিল না? একদণ্ড পূর্ব্বে তিনি যে সকল কথা বলেছিলেন, তা' ভেবে তিনি মুখে কিছু ব্যক্ত কল্লেন না, কিন্তু তাঁর বুকের ভিতর চিতা জল্‌ছিল। ইন্দরচাঁদ ত পাগলের মত হয়েছিল। সে ভিতর, বাহির কচ্ছিল; আর এক একবার ছাদে উঠে যে দিকে গরুর গাড়ী গিয়েছিল, সেই দিকে তাকাচ্ছিল। বসুমতী গোপনে তার কাছে গিয়ে বল্লে;—"দাদা! মা ত বউকে ভিকিরীর মত বিদায় কল্লেন; কিন্তু বউ যে একটা জঙ্গ্‌লী লোকের সঙ্গে এই দূর পথ গেল, সেটা ত ভাল হল না।" ইন্দরচাঁদ কোন উত্তর দিল না; কিন্তু তখনি আস্তাবলে গিয়ে নিজের হাতে আপনার ঘোড়াটী সাজালে। কারুকে কিছু না বলে, বাক্স থেকে গোটা কত মোহর থলের মধ্যে পূরে, যে পথে গাড়ী গিয়েছিল, সে, ঘোড়া চড়ে, সেই পথে ছুট্‌ল।

গাড়োয়ান বলেছিল, "দেখ্‌চি আজ পাতালপুরেই রাত কাটাতে হবে।" এই পাতালপুরটার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। হীরামণ যে গ্রামে জন্মেছিল, তারই কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে এই পাতালপুর; নির্জ্জন পাহাড়ে গ্রাম। বিন্ধ্যাচল হ'তেই পাহাড় আরম্ভ হয়েছে; সমস্ত অঞ্চলটাই পাহাড়ে গড়া, পাহাড়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে খানিকটা সমতল, তারই পরে একটা মস্ত পাহাড়, অসুরের মত মাথা উঁচু করে, দাঁড়িয়ে আছে। বিন্ধ্যাচলের পাশ দিয়ে একটা পথ, এই সকল পাহাড় অতিক্রম করে, প্রয়াগের দিকে গিয়েছে। রেল হওয়ায় এখন সে পথে লোকের যাতায়াত কম হয়েছে; কিন্তু তখন প্রতিদিন শত শত যাত্রী এই পথ দিয়ে যাওয়া, আসা কত্তো। পথ,

কোথাও পাহাড়ের ধার দিয়ে, কোথাও বা পাহাড়ের উপর দিয়ে, গিয়েছে। তারই উপর দিয়ে মানুষ চলে, গরুর গাড়ী যায়। এক জায়গায় পথটা খুব উঁচু থেকে নীচে নেমেছে, আর তার চার দিকেই পাহাড়; দু'পর ভিন্ন, অন্য সময়ে সেখানে সূর্য্যের আলো ভালরূপ আসে না; এইজন্য লোকে তার নাম পাতালপুর রেখেছিল। দু'তিনটা রাস্তা সেখানে মিলেছিল বলে সেটা পথিকদের একটা আড্ডা ছিল। গোটাকত বট ও অশ্বত্থের গাছ ছিল; তা'দের তলায় গরমের সময়ে বেশ ছায়া পাওয়া যেত। একটা দোকান ছিল, তা'তে ঘি, ময়দা, আটা, চাউল, শক্কর প্রভৃতি সাধারণ গৃহস্থের প্রয়োজনীয় খাদ্য আর ঠাকুর-সেবার ধূপ, ধূনা, কাপড় ইত্যাদি সর্ব্বদা মজুত থাকৃত। দোকানদার অতি মিষ্টভাষী ও অমায়িক লোক ছিল; আদেশমাত্র পথিকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে দিত। একটা কূয়া ছিল; তার জল অতি মিষ্ট। দোকানে আবশ্যক মত জিনিস আর কূয়ার মিষ্ট জল পেয়ে পথিকেরা সেখানে গাছতলায় রেঁধে-বেড়ে খেত; তার পর যে যার জায়গায় চলে যেত। এই হ'তে পাতালপুর ঐ অঞ্চলে সুপরিচিত হয়েছিল। অজয়গড় হ'তে দেবীপুরে আস্‌তে হলে পাতালপুর দিয়ে আস্‌তে হ'ত।

আরও একটী কারণে পাতালপুরের নাম প্রচারিত হয়েছিল। কয়েক বৎসর হ'ল, এক সাধুপুরুষ এসে, সেখানে, আশ্রম নির্ম্মাণ করেছিলেন। সঙ্গে অনেক শিষ্য, সেবক। তিনি সেখানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, অতিথিশালা স্থাপন, পুষ্পবাটিকা নির্ম্মাণ ক'রে সগৌরবে বাস কত্তেন। সাধু মৌনী; কা'রও সঙ্গে বাক্যালাপ কত্তেন না; কিন্তু তাঁকে দর্শন কল্লেই লোকের মনস্কাম সিদ্ধ হ'ত। সাধুর বয়স্ যে কত, তা' কেউ বল্‌তে পাত্তো না। তাঁর শিষ্যেরা বল্‌তেন যে, "তিনি অমর। নারায়ণ যখন প্রলয়কালের সমুদ্রে বটপত্রে ভাস্‌তেন, তিনিও তখন তাঁ'র সঙ্গে বর্ত্তমান ছিলেন।" কেউ বল্‌তেন, "তিনি সপ্তর্ষির একজন—স্বয়ং বশিষ্ঠ।" যা' হ'ক তাঁ'র বয়স্ যে বহু শত বৎসর, তা'তে কা'রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এত

বয়স্ হ'লেও তাঁর মূর্ত্তি এমন সুন্দর, এমন প্রশান্ত ছিল যে, দেখ্‌লেই ভক্তিতে প্রাণ গলে যেত। বর্ণ যেন চাঁপাফুলের মত; মাথার চুলগুলি গঙ্গাজলি চামরের মত ধপ্ ধপ্ কত্তো। মুখে ঈষৎ হাসি লেগেই ছিল। পদ্মাসনে বসে, চক্ষু মুদে, সর্ব্বদা ধ্যান কত্তেন। তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে স্নান করিয়ে দিত, আহার করাত, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় তাঁর পূজা ও আরতি কত্তো। সাধারণ লোকে তাঁর নিকটে যেতে বা তাঁকে স্পর্শ কত্তে পাত্তো না। মাসের মধ্যে একটীবার মাত্র তিনি চক্ষু উন্মীলন কত্তেন; কিন্তু যার উপর তাঁ'র প্রথম দৃষ্টি পড়্‌ত, তার কোন রোগ, কোন দুঃখ, কোন অভাব থাক্‌তো না। কবে যে তিনি চোক খুলবেন, তার কোন নিয়ম ছিল না; কাজেই তাঁর দর্শনে পড়্‌বার আশায় সকল সময়েই দলে দলে লোক নানা স্থান হ'তে তাঁর আশ্রমে আস্‌ত। পূর্ব্বেই বলেছি, সাধারণ লোকের তাঁর নিকটে যা'বার অধিকার ছিল না। কিন্তু যাঁ'রা তাঁ'র কৃপার বিশেষ অধিকারী বলে তাঁর শিষ্যেরা স্থির কত্তেন, তাঁরা রাত্রিতে, আরতির সময়ে, মন্দিরে প্রবেশ কত্তে পাত্তেন। তখনই মন্দিরের প্রধান দ্বার রুদ্ধ হ'ত; পূজা, পাঠ শেষ হ'লে ভক্তেরা মন্দিরের অপর একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে বাহিরে যেতেন। সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁদের তখন দেখা হ'ত না। তাঁর অর্থের অভাব ছিল না; প্রতিদিন শত শত লোক তাঁকে দর্শনী, প্রণামী দিত। কেউ রূপার খড়ম, কেউ সোণার কমণ্ডলু, কেউ মুক্তার জপমালা দিয়ে পূজা কর্‌ত। তা'তে আশ্রমের সকল প্রকার ব্যয়, শিষ্য-সেবকদের ভরণপোষণ চল্‌ত। অতিথিসেবার বন্দোবস্ত অতি উৎকৃষ্ট ছিল। পাত্র-বিবেচনায় খিচুড়ী, পুরী, মোহনভোগ, পরিষ্কৃত শয্যা পর্য্যন্ত দেওয়া হ'ত। তাঁর শিষ্যেরা দীন দুঃখীকে অন্ন, বস্ত্র এবং রোগীকে ঔষধ, পথ্যাদি দিতেন। ক্ষুধাতুর কখনও সে আশ্রম থেকে নিরাশ হয়ে চলে যেত না। এইজন্য চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা সকলেই সাধুর শিষ্য-দের একান্ত বশীভূত ছিল। পাতালপুরের অধিষ্ঠাতা বলে লোকে তাঁর

নাম দিয়েছিল "পাতালবাসী ঋষি"। পথিকেরা, পাতালপুর দিয়ে যাবার সময়ে, তাঁর পূজা না দিয়ে, তাঁকে প্রণাম না করে কখনই যেত না।

পাতালপুরের পরিচয় দিয়ে আমরা আবার হীরামণের কথা বল্‌ব। হীরামণ একা গরুর গাড়ীতে বসে চলেছিল। চোকের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছিল। এক ক্রোশ, দু'ক্রোশ, তিন, চার, পাঁচ ক্রোশ গেল; পথ যেন ফুরায় না। সে ভাব্‌ছিল, কেন আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হল। মা ত আমার কাছে কখনও কিছুই চান নি; তবে আমি কেন যেচে এই বিপদ ঘটালুম? যদি দেবারই ইচ্ছা ছিল, তবে শাশুড়ীকে, না হয় আমার ননদ বসুমতীকে বল্লুম না কেন? শাশুড়ী যখন বক্‌ছিলেন, তখন, আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌লুম না কেন? হাতযোড় করে ক্ষমা চাইলে ত তাঁর রাগ থাক্‌ত না? দাসীরা ছিল, ক্ষতি কি? এত লজ্জা কেন হল? দোষ করে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ব, তা'তে আবার লজ্জা! তিনি কি আমার মায়ের চেয়ে আমায় কম ভাল বাস্‌তেন? অসুখের সময় আমায় কোলে নিয়ে সমস্ত রাত্রি কাটিয়েছেন, একটা বারও চক্ষু বুজেন নি। ঘুমুলে ডেকে নিজের হাতে দুধ খাইয়েছেন; যে খাবারটা ভাল লাগত, তা' নিজে না খেয়ে বসুমতীকে আর আমাকে সমান ভাগ করে দিয়েছেন। লোকের কাছে দশমুখে আমার সুখ্যাতি কত্তেন। হায়! এমন মায়ের পায়ে পড়্‌তে আমার লজ্জা হল! আমার যদি শাস্তি না হবে ত হবে কার? শ্বশুর যখন আমায় জিজ্ঞাসা কত্তেন, 'হীরামণ! তুমি কি চাও? কি কল্লে তুমি খুসী হও?' তখন যদি আমি বল্‌তুম, 'আমার মায়ের জন্য একখানা রেশমী কাপড় পাঠিয়ে দিন, তিনি কত সুখী হ'তেন। একখানার যায়গায় দশখানা দিতেন। হায় আমার লজ্জা! তাঁকে মুখ ফুটে কোনও দিন কিছু বল্‌তে পারিনি। তার পর যাঁর কাছে স্ত্রীলোকের কোন লজ্জাই থাকে না, তাঁকেও ত কোন দিন কিছু বলিনি। আসবার সময় একবার তাঁকে দেখেও আসা হল না। একবার চোকোচোকি হ'লেও ত কষ্ট কম হ'ত;

'আমায় ভুলনা' এই কথা বলে বিদায় নিতে পাল্লেও ত দুঃখ দূর হ'ত। কিছুই হ'ল না। না জানি, তিনি কতই কষ্ট পাচ্ছেন। আমাকে ছেড়ে তিনি যে একদণ্ড থাক্‌তে পাত্তেন না। যেখানে আমি থাকৃতুম, তিনি তার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন; আমি বাপের বাড়ী গেলে রাত্রিতে তাঁর ঘুম হ'ত না। এতক্ষণ তিনি কি কচ্চেন! শ্বশুর মহাশয় আমার হাতের সর্ব্বৎ, আমার গড়া রুটী খেতে ভাল বাস্‌তেন; আর কেউ কল্লে তাঁর পছন্দ হ'ত না; কে তবে কর্‌বে? হয় ত তাঁর তৃপ্তি হ'বে না। কখন কখন হীরামণের মনে হচ্ছিল, শ্বশুর, শাশুড়ী আমায় এত ভাল বাস্‌তেন, সত্যি সত্যি কি তাঁরা আমায় ত্যাগ কর্ব্বেন? এতক্ষণে হয়ত শাশুড়ীর রাগ পড়েছে; আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে লোকজন, গাড়ী পাঠিয়েছেন। এই ভেবে সে কম্বলের ঢাকা সরিয়ে, পথের দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু লোক, জন, গাড়ী কিছুই তার চোকে পড়্‌ল না; তার বুকে যেন বেদনা বোধ হ'ল। এই সময় দূর থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ তার কাণে গেল; সে দেখ্‌তে পেলে ইন্দরচাঁদ ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দিকে আস্‌চে। তার বুকখানা যেন দশ হাত হ'ল; নিমেষের মধ্যে পূর্ব্বের ঘটনা সে সব ভুলে গেল। গাড়ী থামালে ইন্দরচাঁদ সহিসের কাছে ঘোড়া দিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। পরস্পরকে দেখে দু'জনারই দুঃখ যেন উথ্‌লে উঠ্‌ল; দর্ দর্ করে দু'জনারই চোক দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল; কারও কথা কইবার শক্তি রইল না। খানিকক্ষণ পরে ইন্দরচাঁদ হীরামণের হাত ধরে বল্লে;—"যদি মাকে একখানি কাপড় দেবার তোমার ইচ্ছা ছিল, আমায় বল্লেনা কেন?"

হীরামণ বল্লে;—"আমি লজ্জায় পারিনি; যদি আমরা গরীব না হ'তুম, হয়ত বল্‌তে পাত্তুম।"

ইন্দর। "তা' যা' হ'বার তা' হয়েছে, এখন ফিরে চল।"

হীরা। "বাবা কি তোমায় আমাকে ফিরিয়ে নিতে পাঠিয়েছেন?"

ইন্দর। "না, তিনি পাঠান নি।"

হীরা। "তবে মা কি পাঠিয়েছেন ?"

ইন্দর। "না তিনিও নয়। আমি নিজেই এসেছি।"

হীরা। "তবে আমি কি করে যাব ? আবার যদি আমায় তাড়িয়ে দেন ?"

হীরামণকে পোয়াল খড়ের উপর বস্‌তে দেখে ইন্দরচাঁদের সর্ব্বশরীর জ্বল্‌ছিল ; সে উত্তেজিতভাবে বল্লে ;—"যে তোমায় তাড়াবার কথা বল্‌বে, আমি তার মাথা ভেঙ্গে দেব।"

হীরা। "মায়ের গায়ে হাত তুল্‌বে নাকি ?"

ইন্দর। "প্রয়োজন হয়, তুল্‌ব। তোমার জন্যে নরকে যেতে আমার ভয় নাই।"

হীরা। "তবে আমি যাবনা, প্রাণ গেলেও যাবনা ?"

ইন্দরচাঁদ হীরামণের হাত ছেড়ে দিয়ে বল্লে ;—"তবে কি তুমি আমায় চাও না ?"

হীরা। "তোমায় চাই কি না, অন্তর্য্যামী যিনি তিনিই জানেন। তোমার পায়ের ধূলো হয়ে থাক্‌তে পাল্লেও জন্ম সার্থক হ'ল মনে করি। কিন্তু আমার জন্যে তুমি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া কর্ব্বে, গায়ে হাত তোলা ত দূরের কথা, তা' কখনই হবে না।"

ইন্দর। "তবে তুমি কি কত্তে চাও ?"

হীরা। যা' কত্তে চাই, বল্‌চি ; ধীর হয়ে শোন ; রাগ করোনা। এখান থেকে তোমাদের বাড়ী যতদূর, আমার বাপের বাড়ী তার চেয়ে কম দূর। গরুগুলো হাঁট্‌তে পাচ্চে না, পীড়াপীড়ি কল্লে আমার বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত, সন্ধ্যার পর, পঁহুছিতে পারে ; কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে আজ কিছুতেই ফিরে যেতে পার্ব্বে না। সেই জন্যে আমার ইচ্ছে, যখন এতদূর এসেছি, তখন আমার বাপের বাড়ীতেই দু'জনে যাই। তুমি আমার

সঙ্গে রয়েছ দেখ্‌লে, এই সব কথা শুন্‌লেও, বাবা মার কষ্ট কম হবে। তুমি আমাকে সেখানে রেখে বাড়ীতে ফিরে যেও; তার পরে তোমার বাবা মার মত করে আমায় নেবার জন্যে লোক পাঠিও। আমি তাঁদের মন জানি, আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁরা কখনই সুখী হ'বেন না। নিশ্চয়ই আবার ফিরে নেবেন। এই কল্লে সব গোল মিঠে যাবে।'

ইন্দর। "আচ্ছা বেশ! তাই হবে। ঐ পাতালপুরের পাহাড় দেখা যাচ্চে। গরুগুলো যে রকম চল্‌চে, তা'তে তোমার বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পার্ব্বে কি না সন্দেহ। অন্ধকার রাত্রি; এ পথে রাত্রিতে না যাওয়াই ভাল; নেকড়ে বাঘের উপদ্রব আছে; আজ বোধ হয় পাতালপুরেই রাত কাটাতে হবে। তুমি কি পাতালপুরের ঋষি মহাশয়কে দেখেছ? অনেক দিন হ'ল আমি একবার তাঁকে দূর থেকে প্রণাম করেছিলুম। মানুষের যে এমন সুন্দর মূর্ত্তি হয়, তা' আমার জ্ঞান ছিল না। তাঁর আশ্রমে অতিথিসেবার উত্তম বন্দোবস্ত আছে। থাক্‌বার ঘর আছে; যে ভোগ পাওয়া যাবে, তা'তে কোন কষ্ট হবে না।"

হীরা। "কষ্ট আবার কি? দু'জনে যদি একসঙ্গে থাক্‌তে পাই, খাওয়া, শোয়া, কোন বিষয়েই কষ্টবোধ হ'বেনা। অনেক দিন থেকে আমার সাধ ছিল, ঋষি মহাশয়কে দেখ্‌ব; কতবার এই পথ দিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাবাকে না বলে কোথাও যেতে পারিনা বলে দেখ্‌বার সুবিধা হয় নাই। আজ দু'জনে আছি; মনের সাধ মিটিয়ে দেখ্‌ব। শুনেছি তাঁর কাছে যে যা' মনস্কাম জানায় তা' পূর্ণ হয়; মার যাতে রাগ যায় আমরা দু'জনে সেই মনস্কাম জানাব।"

এই স্থির হ'ল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাড়ী পাতালপুরের সেই দোকানের সাম্‌নে এল। দোকানে আশ্রমের কয়জন পূজারি বসে কথা কচ্ছিল। দোকানদার একজন পূজারিকে বল্লে;—"আমি খবর পেয়েছি, অজয়গড় থেকে খাসা খোস্‌বুদার ঘি আস্‌চে; তোমাদের যদি দরকার হয় নিতে

পার।” পূজারি বল্লে;—“খুবই দরকারি, হোমের ঘি কম পড়েছে।” গাড়ী দাঁড়ালে দোকানদার বল্লে;—“ঘি পঁহুছেছে।”

ইন্দরচাঁদ গাড়ী থেকে নাম্‌বার সময় কম্বলের ঢাকাটা একটু সরে গেল; হীরামণের স্বর্ণালঙ্কারযুক্ত হাত সকলের চোকে পড়্‌ল। দু'তিন জন পূজারি, ইন্দরচাঁদের কাছে এসে, হাতযোড় করে, বল্লে;—“হুজুর বড় ভাগ্যবান্; আজ গোসাঁইএর চক্ষু মেলবার সম্ভাবনা। অগ্রে গিয়ে পূজা দিলে আপনাদের উপর তাঁর প্রথম দৃষ্টি পড়্‌বে, যা' মনস্কাম আছে, তা' সিদ্ধ হবে। হুজুর দর্শন কত্তে যাবেন কি?”

ইন্দর। “হাঁ! আমরা দর্শন কর্‌ব বলেই এসেছি। রাত্রিতে আশ্রমে আমাদের থাক্‌বার মত স্থান হবে?”

পূজারি। “উত্তম স্থান হবে। আশ্রমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটীতে হুজুর থাক্‌বেন। পুরী, মিঠাই, রাবৃড়ী, যা, হুজুরের আহার করার ইচ্ছা, আদেশ কল্লেই, প্রস্তুত হবে। যদি কেউ সস্ত্রীক আশ্রমে আসেন, যা'তে তাঁর কোনরূপ কষ্ট না হয়, তা'র জন্যে আমাদের উপর ঠাকুরের বিশেষ আদেশ আছে। হুজুর ত জানেন, তিনি হ'লেন সপ্তর্ষির প্রধান ঋষি বশিষ্ঠদেব; এই জন্য সধবা নারীমাত্রকে অরুন্ধতীর মত সমাদর করেন।”

ইন্দর। “পূজা দিবার কি নিয়ম? তা'তে কত ব্যয় হবে?”

পূজারি। “কোন নিয়ম নাই, ব্যয়েরও কিছু পরিমাণ স্থির নাই। কাশীর মহারাজ তাঁকে সোণার কমণ্ডলু দিয়েছেন, গরীব চাষা ক্ষেতের নূতন ভুট্টা দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে। উভয়েরই তাঁর কাছে সমান আদর। হুজুরের যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ পূজা দিতে পারেন। অনুমতি হ'লেই আমরা সব আয়োজন করে দেব।

ইন্দর। “আমার সঙ্গে অপর লোক নাই। আপনারা, যোড়শোপচার পূজার জন্য, ধূপ, দীপ, বস্ত্র আর যা' যা আবশ্যক, আয়োজন করুন। যা' খরচ পড়্‌বে কাল প্রাতে বিদায় নেবার সময় দেব।”

পূজারি "যে আজ্ঞা" বলে চলে গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আশ্রমে ঘৃতের প্রদীপ জ্বল্‌চে; ধূপ, ধূনা পুড়্‌ছে; সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধে মন্দির আমোদিত হ'তেছে; দামামার শব্দে স্বভাবতঃ নীরব পাতালপুর প্রতিধ্বনিত হচ্চে। ঋষিমহাশয় একখানি সিংহাসনের উপর ধ্যানস্থ রয়েছেন। সাধারণ পূজার্থীরা দূর থেকে তাঁকে প্রণাম কচ্চে; তা'দের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশের অধিকার নাই। শতাধিক পূজার্থী, মন্দিরের সম্মুখস্থ অঙ্গনে মিলিত হয়ে, ঋষি-মহাশয়ের দৃষ্টিপাতের জন্য অপেক্ষা কচ্চে। সে দিনের প্রধান পূজার্থী সস্ত্রীক ইন্দরচাঁদ; তাঁরাই, কেবল, সেদিন, মন্দিরে প্রবেশ করে, ঋষি-মহাশয়ের পূজা কত্তে পার্ব্বেন। পূজারিরা বল্লেন;—একটু ভিড় কম্‌লেই তাঁদের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁরা দ্বার রুদ্ধ করে ইচ্ছামত পূজা ও দর্শন কর্ব্বেন। ক্রমে রাত্রি প্রহরাতীত হল; সাধারণ পূজার্থীরা অতিথিশালায় ভোগ বিতরণ হচ্চে শুনে সেই দিকে চলে গেলেন। পূজারিরা, অতি সমাদরে, সস্ত্রীক ইন্দরচাঁদকে মন্দিরের মধ্যে আহ্বান কল্লেন। তাঁরা দেখ্‌লেন ঋষি মহাশয় পূর্ব্ববৎ ধ্যানস্থ আছেন। প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, মুখ মধুর হাস্যে উজ্জ্বল; ধ্যানাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গ এমনই ধীর ও স্থির যে, জীবনের কোনও লক্ষণ আছে এরূপ বোধ হয় না। মন্দিরের প্রধান দ্বার বন্ধ হ'বার সঙ্গে পূজা আরম্ভ হ'ল। পূজারিরা, মিলিত হয়ে, অতি মধুর স্বরে এই স্তব গান কর্‌তে লাগ্‌লেন;—

নমো ব্রহ্মরূপী ঋষি! প্রণমি তোমায়।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি আগত ধরায়॥
কেবা আছে এ সংসারে যে তোমা চিনিতে পারে,
ধর্ম্ম, অর্থ একাধারে মিলে সাধনায়॥
যাচি মোরা কায়মনে, মুক্তি দেহ ভক্তজনে,
অন্তে যেন শ্রীচরণে স্থান সবে পায়॥

সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ, ঘণ্টা আর কাঁশীর শব্দে মন্দির প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগ্‌ল। ধূপ ধুনার ধোঁয়ায় চারদিক্ অন্ধকারময় হ'ল। ইন্দরচাঁদ ও হীরামণ, উভয়েই, তন্ময় হয়ে, স্তবপাঠ শুন্‌তে লাগ্‌লেন। এই সময়ে পাশের একটা ছোট দরজা দিয়ে দু'জন বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকার পুরুষ এসে ইন্দরচাঁদ আর হীরামণের পিছনে দাঁড়াল। তা'দের হাতে এক একগাছি শক্ত শণের দড়ী, হাত দুই মাত্র লম্বা। তাঁরা ভাব্‌লেন, মন্দিরের কোন ভৃত্য হ'বে। অকস্মাৎ মন্দিরের প্রদীপটা নিবে গেল ও সেই সঙ্গে একটা করুণ আর্ত্তধ্বনি উঠ্‌ল। তার পর যখন প্রদীপ জ্বেলে প্রধান দরোজা খোলা হ'ল, তখন দেখা গেল, ইন্দরচাঁদ বা হীরামণ কেউ সেখানে নাই। একজন পূজারি বাহিরের লোকেরা শুন্‌তে পায় এরূপ উচ্চ স্বরে বল্লে;—"শেঠজী! আপনার মনস্কাম সিদ্ধ হ'বে। এমন দর্শন সকলের ভাগ্যে হয় না। আপনাদের জন্যে অতিথি-শালায় শয্যা প্রস্তুত আছে। আপনারা গিয়ে বিশ্রাম করুন। সেখানে ভোগ্ পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

এদিকে হুকুমচাঁদের বাড়ীতে সে রাত্রিতে কা'রও চোকে নিদ্রা এলনা। গৃহিণী পাগলের মত ছুটাছুটি কত্তে লাগ্‌লেন। তিনি এক একবার হীরা-মণের শয়ন-ঘরে আসেন, কখনও বউ, কখনও হীরা, কখনও আমার লক্ষ টাকার হীরা বলে ডাকেন; আর নিজের কপালে, বুকে আঘাত করেন। হুকুমচাঁদ সে রাত্রিতে অন্দরমহলে এলেন না; বাহির বাটীতেই রইলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, ইন্দরচাঁদের বিবাহের সময়, তিনি বাড়ীর ঝাড়ুদারকেও রেশমী কাপড় দিয়েছিলেন; আর তারই জন্যে তিনি হীরামণের মত বউকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অমন লক্ষ্মী বউ কি কা'রও হয়? আট বছর বয়স থেকে সে তাঁর সেবা আরম্ভ করেছিল; একটা দিনের জন্যও কোন কাজ পার্‌ব না কি কর্‌ব না বলেনি। তাঁর জলখাবার সাজাতে, পূজা-হ্নিকের আয়োজন কত্তে, এমন কি তাঁর খড়ম জোড়াটা পর্য্যন্ত মুছতে, সে আর কারুকে দিত না,:নিজেই কত্তো। সেই বউকে তিনি, ভিখারিণীর মত,

পোয়াল খড়ের উপর বসিয়ে, বিদায় দিলেন। বিধাতা কি এ পাপ সইবেন? তার পর তাঁর একমাত্র পুত্র ইন্দরচাঁদ—যার রূপ, গুণ দেখে সকলে বল্‌ত, ইন্দরচাঁদ নাম সার্থক হয়েছে, সেই বা কোথায় গেল? আর কি তা'দের দেখা পাবেন? যদি তারা চোর, ডাকাত কি ঠগের হাতে পড়ে, দু'জনেই মারা যা'বে। চোর, ডাকাত টাকা কড়ি পেলে প্রাণে মারে না; কিন্তু ঠগদের ব্যবহার ত সেরূপ নয়। তারা আগে মানুষকে মারে, তার পর তার টাকা কড়ি খোঁজে।" তাঁর একজন কর্ম্মচারী, কয়দিন পূর্ব্বে, জব্বলপুরে গিয়েছিল; সে সেখানে ঠগদের কথা শুনে এসেছিল। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন; "ঠগদের সম্বন্ধে যা' শোনা যায়, তা' কি সত্য?"

কর্ম্মচারী বল্লে;—"সবই সত্য, হুজুর! এমন নিষ্ঠুর, এমন রক্তপিপাসু দস্যু পৃথিবীতে আর নাই। কার'ও সাধ্য নয় যে, তাদের চেনে। কেউ দোকানদার, কেউ দরোয়ান, কেউ চাষা, কেউ পূজারি, কেউ পথিক সেজে, যেমন সুযোগ পায়, মানুষের গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেয়। এমনি তাদের শিক্ষা যে, চোখের নিমেষ না পড়্‌তে পড়্‌তে, মানুষকে মার্‌বে আর সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে পুত্‌বে। মারবার আগেই পোত্‌বার গর্ত্ত তৈয়ার করে রাখে। তা'দের কাছে কোন অস্ত্র, শস্ত্র থাকে না। এক গাছি শণের দড়ী, কখনও একখানি গামছা, কি কাপড় এইমাত্র থাকে। কিন্তু এমন তা'দের কৌশল, এমন তা'দের কব্‌জীর জোর যে, সেইটে গলায় ফাঁসের মত লাগিয়ে টান্‌লে অতি বলিষ্ঠ লোকও রক্ষা পায় না, গলার নালি ভেঙ্গে, নিঃশ্বাস রোধ হয়ে, তৎক্ষণাৎ মরে। এমন নিঃশব্দে, এমন দক্ষতার সঙ্গে, সমস্ত কাজ করে যে, যাকে মারে তার পাশের লোকও কিছু জান্‌তে পারে না। বাঘের হাতে পড়্‌লে রক্ষা আছে, কিন্তু ঠগের হাতে পড়লে রক্ষা নাই।"

হুকুমচাঁদ কর্ম্মচারীকে বিদায় দিলেন। তাঁর শরীর যেন অবশ হয়ে এল। তিনি বৈঠকখানায়, একটী বালিস বুকে দিয়ে, ফরাস বিছানার

উপর পড়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। গৃহিণী যখন এই খবর পেলেন, তখন তাঁ'র লজ্জা, সরম রইল না। তিনি, বার বাড়ীতে ছুটে এসে, হুকুমচাঁদের পায়ে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে, বল্লেন ;—"ওগো! তুমি আমায় ফাঁসী দাও ; আমি বেটা বউকে খুন করেছি, তুমি আমায় ফাঁসী দাও" হায়! মানুষ আপনার কাজের ফলাফল আগে বুঝ্‌তে পারে না ; পাল্লে, পৃথিবীর ইতিহাসটা আর এক রকমে লেখা হ'ত।

ভোর না হ'তেই হুকুমচাঁদ, লোকজন নিয়ে, পুত্র ও পুত্রবধূর খোঁজ কত্তে বেরুলেন। পাতালপুরে পৌছিবার পূর্ব্বেই যে গাড়ীতে হীরামণ গিয়েছিল, সেই গাড়ীর গাড়োয়ান আর ইন্দরচাঁদের সহিসের সঙ্গে পথে দেখা হ'ল। উভয়েই বল্লে ;—"হীরামণ ও ইন্দরচাঁদ, পাতালবাসী ঋষির পূজা দিয়ে, কারুকে কিছু না বলে, কোথায় চলে গিয়েছেন। কোন সন্ধান না পেয়ে তারা তাঁকে জানাবার জন্যে ফিরে আস্‌ছে।" হুকুমচাঁদ পাতালপুরে গেলেন। সেই দোকানদার বল্লে ;—"কাল একটী সুন্দর যুবা পুরুষ ও একটী সুন্দরী বউ এসেছিলেন বটে ; কিন্তু আজ তাঁ'দের সঙ্গে দেখা হয় নি। ঋষিমহাশয়কে দেখে, বোধ হয়, তাঁ'দের মনে বৈরাগ্য জন্মেছে; তাঁ'রা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নেবেন বলে, হয়ত, কোথাও চলে গিয়েছেন।" হুকুমচাঁদ আশ্রমে গিয়ে পূজারিদের কাছে ঠিক এইরূপ কথাই শুন্‌লেন। বেশীর ভাগ একজন পূজারি, তাঁ'কে একটী ঘরে একটী বিছানা দেখিয়ে, বল্লে ;— "তাঁরা কাল রাত্রিতে এই ঘরে, এই বিছানায়, শুয়ে ছিলেন। ভোর না হ'তে কোথায় উঠে চলে গিয়েছেন। ঋষি মহাশয় তাঁ'দের প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করেছেন ; তাঁদের মনস্কাম সিদ্ধ হবে।" হুকুমচাঁদ লক্ষ্য কল্লেন, বিছানার চাদরখানি যেরূপ রয়েচে, তাতে যে রাত্তিরে কেউ তার উপর শুয়েছিল, এমন বোধ হয় না। তিনি নিরাশ হয়ে দেবীপুরে হীরামণের বাপের বাড়ীতে গেলেন ; সেখানে কোন সংবাদ পেলেন না। হীরামণের মা, সমস্ত শুনে, চীৎকার করে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্লেন। যদি সত্যিই তা'রা সন্ন্যাসধর্ম্ম নিতে

ইচ্ছা করে থাকে, তবে বিন্ধ্যাচলের সন্ন্যাসীদের কাছে যেতেও পারে, এই ভেবে হুকুমচাঁদ বিন্ধ্যাচলে গেলেন। পাণ্ডাদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে চিন্‌তেন; তারা তাঁকে আদর, অভ্যর্থনা করে বল্লেন;—"আমাদের বড় সৌভাগ্য, তাই হুজুরের আগমন হয়েছে। কাল পাতালবাসী ঋষির পূজারিরা মায়ের যোড়শ উপচারে পূজা দিয়ে গিয়েছেন, আজ হুজুরের পূজাও যোড়শ উপচারে হবে।" পূজা দিয়ে হুকুমচাঁদ, যত সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন, সকলের নিকট ইন্দরচাঁদের সংবাদ নিলেন, কিন্তু কেউ কিছু বল্‌তে পাল্লেন না। তিনি বিদায় নেবার পূর্ব্বে একজন পাণ্ডা জিজ্ঞাসা কল্লেন;—"হুজুর! আকবরী মোহর কোম্পানীর কত টাকায় বিক্রী হয়?" হুকুমচাঁদ উত্তর দিলেন;—"আকবরী মোহর ত সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। দু'টী একটী পেলে লোকে রামচন্দ্রী মোহরের মত লক্ষ্মীর কৌটায় রাখে। তার মূল্য সোণার পরিমাণ অনুসারে স্থির হয় না; খরিদ্দারের পছন্দ হ'লে পঞ্চাশ, ষাট, এমন কি এক শত টাকাতেও বিক্রয় হয়। আপনি আকবরী মোহরের মূল্য জিজ্ঞাসা কল্লেন কেন?"

পাণ্ডা বল্লেন;—"কাল পাতালবাসী ঋষির পূজারিরা এই দু'টী আকবরী মোহর আমাদের তিন অংশীকে দক্ষিণা দিয়েছেন। সেইটা ভাগ কর্‌বার জন্যই মূল্য জিজ্ঞাসা কচ্ছি।" এই বলে তাঁরা মোহর দু'টী হুকুমচাঁদকে দেখালেন। হুকুমচাঁদ মোহর দু'টী ভাল করে দেখ্‌লেন; কিন্তু কোন কথা বল্লেন না। তিনি নিরাশ হয়ে অজয়গড়ে ফিরে এলেন। সেই দিন হ'তে তাঁ'র আর গৃহিণীর আহার, নিদ্রা চলে গেল। উভয়ে দিন দিন শীর্ণ হ'তে লাগ্‌লেন। দশ দিনে দু'জনের চেহারা ছ'মাসের রোগীর মত হ'ল।

পূর্ব্বে বলেছি যে, হুকুমচাঁদের সঙ্গে জিলার পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ইংরাজদের সকলেরই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর ভদ্র ব্যবহারের গুণে, ততোধিক তাঁর কাছে নানারূপ উপকার পেয়ে, সকলেই তাঁর খাতির কত্তেন। তাঁর এই বিপদের সংবাদে অনেকেই খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। কালেক্টর সাহেব, নিজে, তাঁর

বাড়ীতে এসে, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন। দিন পনর পরে পুলিসের বড় সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করে বল্লেন ;—"শেঠজী! আমরা ত আপনার পুত্র ও পুত্রবধূর কোন উদ্দেশ পেলুম না। কর্ণেল স্লিমান কাল এখানে এসেছেন ; তিনি ঠগী বিভাগের কর্ত্তা ; যেমন চতুর, তেমনই কর্ম্মিষ্ঠ। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, তাঁকে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাই, যদি তিনি কোনও উপায় কত্তে পারেন।" হুকুমচাঁদ সম্মত হয়ে স্লিমানের সঙ্গে দেখা ক'রে সমস্ত জানালেন। স্লিমান মন দিয়ে আদ্যন্ত শুনে বল্লেন ;—"পাতালপুরে না এক ঋষির আশ্রম আছে?"

হুকুম। "হাঁ আছে। আমার পুত্র ও পুত্রবধূ সেই আশ্রমের অতিথি-শালাতেই রাত্রি যাপন করেছিল। তার পর তা'রা কোথায় গেল, কেউ বল্‌তে পারে না।"

স্লিমান। "তাঁরা কখন্ অতিথিশালায় গিয়ে শুয়েছিলেন?"

হুকুম। "আরতি দেখার পর।"

স্লিমান। "যে ঘরে, যে বিছানায় তাঁরা শুয়েছিলেন, আপনি কি দেখেছেন? ঘরটী ও বিছানাটী কি অবস্থায় ছিল?"

হুকুম। ঘরটী ছোট বটে কিন্তু বেশ পরিষ্কার ; বিছানাটীও একখানি ধোয়া চাদরে ঢাকা। বিছানা সম্বন্ধে একটা কথা আপনাকে বলা আবশ্যক মনে কচ্চি। একটী ধোয়া চাদরে ঢাকা বিছানার উপর যদি দু'জন লোক রাত্রি কাটায়, তবে তা'র যেরূপ অবস্থা হয়, আমার পুত্র ও পুত্রবধূর বিছানার সে অবস্থা দেখিনি। আমার মনে হয়, তারা আদৌ বিছানায় শোয় নাই। ভোরের সময় চলে যাওয়ার কথাটা আমার ঠিক বোধ হয় না ; তারা পূর্ব্বেই কোথায় গিয়েছে।"

স্লিমান। "আর কোনওরূপ জান্‌বার মত সংবাদ আছে কি?"

হুকুম। "একটী আছে। বিন্ধ্যাচলের পাণ্ডারা আমায় দু'টী আকবরী মোহর দেখিয়ে বলেছিলেন যে, পাতালবাসী ঋষির পূজারিরা তাঁ'দিগকে

সেই মোহর দু'টী দক্ষিণা দিয়েছিলেন। আকবরী মোহর সচরাচর পাওয়া যায় না। আমি কয়েকটী মোহর পেয়ে ইন্দরচাঁদকে তুলে রাখ্‌তে দিয়েছিলুম। আমার মনে হয়, সে, যাবার সময়, ব্যস্ততায়, সেই মোহরগুলিই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল; ঋষির পূজারিদের হাতে কোনওরূপে সেই মোহরগুলি পড়েছে।"

স্লিমান। "নিঃসন্দেহ। আপনার এই সংবাদগুলিতে আমার অনুসন্ধানের খুব সাহায্য হ'বে।"

হুকুম। "সমস্ত শুনে আপনার কি সন্দেহ হয়?"

স্লিমান। "আমার যা' সন্দেহ হয়, পরে জান্‌তে পার্ব্বেন। আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকে যে সশরীরে পাওয়া যাবে, সে আশা করি না। তবে আপনার এই বিপদ হ'তে সাধারণের মহৎ উপকার হ'বে। এ অঞ্চল হ'তে ঠগ নির্ম্মূল হ'বে।"

হুকুমচাঁদ স্লিমানকে অভিবাদন করে বিদায় নিলেন।

আরও কয়দিন গত হ'ল। পৃথিবী যেমন চল্‌ছিল, সেইরূপই চল্‌তে লাগ্‌ল। হুকুমচাঁদের গৃহ শ্মশান হয়েছে, তা'তে পৃথিবীর কি? চন্দ্র, সূর্য্য তেম্‌নি আলো ঢাল্‌ছিল, বাতাস তেম্‌নি বইছিল, পাখীরা তেম্‌নি গান কচ্ছিল, মানুষ তেম্‌নি 'হো হো' করে উচ্চহাসি হাস্‌ছিল। যা'র বিপদ্ তা'রই বিপদ্, অপরের তা'তে কি? দৈবদুর্ব্বিপাকে তুমি সর্ব্বস্বান্ত; তোমার মর্ম্মপীড়িতা পত্নীর দীর্ঘশ্বাসে গৃহ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে; ভূলুণ্ঠিত, ক্ষুধাতুর শিশুদের ক্রন্দনে অঙ্গন মুখরিত হ'তেছে; কিন্তু তোমার প্রতিবেশীর গৃহ হ'তে মদিরামত্তের কোলাহল-মিশ্রিত ভূরিভোজনের উল্লাসধ্বনি শোনা যাচ্চে। এইরূপই সংসার! তুমি তোমার প্রাণাধিককে শ্মশানে রেখে গৃহে ফিরে আস্‌চ; তোমার বুকের ভিতর তা'র চিতার আগুন তখনও জ্বল্‌চে; এই সময়, অপর এক জন, বাদ্যভাণ্ড, বাইজী নিয়ে, রাজপথে শোভাযাত্রা করে চলেছে, কঠোর ভাষায় তোমাকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য আদেশ দিচ্চে। এইরূপই সংসার! ক্ষোভ কল্লে, অভিমান কল্লে কি হ'বে? যা'র বিপদ্

তা'রই বিপদ্, অপরের তা'তে কি? পাতালপুরের ঋষি মহাশয়ের পূজা পূর্ব্বের মতই চল্‌ছে। কত পূজক আস্‌চে, কত পূজক যাচ্চে। তেম্‌নি ধূপ, ধূনা পুড়্‌চে, তেম্‌নি দামামা বাজ্‌চে; অতিথিরা পুরী, হালুয়া খেয়ে পূজারিদের ধন্য ধন্য বল্‌চে। হুকুমচাঁদের সংসার যে ছারখার হ'য়েছে, সেজন্য কা'রও একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়্‌চে না! এইরূপই সংসার!

একদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে এক সুবেশ, বলিষ্ঠ পুরুষ, ঘোড়ায় চড়ে, পাতালপুরের দোকানের সাম্‌নে এলেন। তাঁর মাথায় জরীর পাগ্‌ড়ী, গায়ে দামী রেশমী কাপড়ের পোষাক, গলায় এক ছড়া মোটা সোণার হার, কোমরে লোহার খাপের মধ্যে লম্বা কিরীচ। তিনি দোকানীকে বল্লেন;—"আমি যোধপুরের রাজকুমার, তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছি। ঋষিমশাইকে দর্শন করে বিন্ধ্যাচলে যাব। বারবেলার আশঙ্কা আছে বলে আমি একা অতি দ্রুত এসেছি; এখনি গিয়ে ঋষি মশাইকে দর্শন কর্‌ব। আমার লোক জন, তাঁবু সরঞ্জাম নিয়ে, পিছনে আস্‌চে। এক ঘড়ি বিলম্ব হতে পারে। তুমি এরি মধ্যে তাদের জন্য একমণ পুরী, আর আধ মণ হালুয়া তৈয়ার কর। ব্রাহ্মণের হাতে যেন তৈয়ার হয়।" এই বলে তিনি দোকানদারকে কয়েকটা টাকা ফেলে দিলেন। দোকানী "যে আজ্ঞা" বলে টাকাগুলি তুলে নিলে। নিকটে একজন পূজারি ছিল, তাকে অনুচ্চস্বরে বল্‌লে, "বড়া ভারী রুহু, জাল না ছেড়ে।"

পূজারি হেসে বল্লে;—"আধ ঘড়ির মধ্যে সব সাফ কর্‌ব। লোকজন পঁহুছিলে বল্লেই হবে যে কুমার সাহেব ঋষি মশাইএর পূজা দিয়ে বিন্ধ্যাচলের দিকে চলে গিয়েছেন। তুমি পুরী, হালুয়াটা ভাল করে তৈয়ার করো; আর সেই সঙ্গে কিছু কচোরী, ভাজী রাখো। যারওয়ারী সিপাহী তা' হলেই খুসী হ'বে।"

আগন্তুক পূজারিদের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ কল্লেন। যোধপুরের রাজকুমার এসেছেন শুনে পূজারিরা আর আশ্রমের ভৃত্যেরা, দক্ষিণা

ও পুরস্কারের লোভে, যে যেখানে ছিল, সব একত্র হ'ল। তখন সন্ধ্যার দীপ জ্বালা হয়েছিল। আগন্তুক, দূর হ'তে, দীপালোকে ঋষিমশাইকে দর্শন কল্লেন। কি প্রশান্ত, পবিত্র মূর্ত্তি! কি মধুর হাস্যে উজ্জ্বল মুখ। দেখ্‌বামাত্র ভক্তের প্রাণ পুলকিত হয়। পূজারিরা রাজকুমারকে বল্লে;—"পৃথ্বীনাথ! এই সময় ভিড় নাই, আপনি মন্দিরের মধ্যে চলুন, আমরা দরজা বন্ধ করে দিই, উত্তমরূপ দর্শন ও পূজা হ'বে।" রাজকুমার কোনও উত্তর দিলেন না। ঠিক সেই সময় বিশ জন ঘোড়সোয়ার, সঙ্গিনওয়ালা বন্দুক হাতে নিয়ে, মন্দিরের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। তারা রাজকুমারের অনুচর ভেবে কা'রও মনে কোন সন্দেহ হলনা। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল শতাধিক সিপাহী, চতুর্দ্দিক হ'তে এসে, আশ্রমের পথগুলি ঘিরে দাঁড়াচ্চে। পূজারিরা, তখন, চম্‌কে উঠে, পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগল। রাজকুমার, বাছা বাছা কয় জন সিপাহী সঙ্গে নিয়ে, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। পূজারিরা ভিতরে যাবার চেষ্টা কল্লে সিপাহীরা পথ রোধ করে দাঁড়াল। রাজকুমার তাঁর খাপশুদ্ধ কিরীচখানি ঋষিমশাইএর বুকে লাগিয়ে জোরে এক ধাক্কা দিলেন। পূজারিরা অমনি চীৎকার করে বল্লে;—"সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল, এখনি মহাপ্রলয় হবে; ক্ষান্ত হন, ক্ষান্ত হন।" কিন্তু রাজকুমার তা'দের কথায় কর্ণপাত না করে, আরও জোরে একটা ধাক্কা দিলেন; অমনি ঋষিমশাই চীৎপাত হয়ে পিছনে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরা পূজারিদের বাঁধ্‌তে আরম্ভ কল্লে। আশ্রমের পথে পূর্ব্ব হতেই সান্ত্রী, পাহারা ছিল; একটা প্রাণীও বেরুতে পাল্লেনা। যারা বেরুবার চেষ্টা কল্লে বা বাধা দিতে গেল, তারা সঙ্গিনের খোঁচায় রক্তাক্ত হ'ল। দু'একজন পলাতক বন্দুকের ছিটা গুলি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল। সে রাত্রিতে পাতালপুর নরকপুর হয়ে দাঁড়াল। নরকে পাপীরা যেমন, যমদূতের প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে, আর্ত্তনাদ করে; পূজারিরাও তেম্‌নি সিপাহী-

দের প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ক্রন্দন, বিলাপ আরম্ভ কল্লে। "আর নয়, বাবা!" "প্রাণ যায়, বাবা" "একটু জল দে, বাবা" এইরূপ ধ্বনি আশ্রম হতে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। পরদিন প্রাতে কর্ণেল স্লিমান হুকুমচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে এলেন। তাঁর আদেশে ঋষিমশাইকে সশরীরে সকলের সাম্‌নে আনা হল। দেখা গেল একটী সুন্দর কাষ্ঠের মূর্ত্তি, অঙ্গরাগ করে, কাপড়, চুল, দাড়ী পরিয়ে, জপমালা হাতে দিয়ে, এমন সাজান হয়েছে যে দেখ্‌লে অবিকল মানুষ বলে বোধ হয়; কিছুতেই চেনা যায় না। স্লিমান বল্লেন;—"বহু দিন হ'তেই পতালপুরের এই আশ্রম সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু হিন্দুর তীর্থের উপর পাছে অকারণ অত্যাচার হয়, এই ভেবে কিছু কত্তে পারিনে। পাপিষ্ঠেরা এমন চতুর যে, তা'দের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া কঠিন ছিল। সকলকে তারা বধ কত্তো না, বেচে বেচে লোক মাত্তো। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে শত শত লোককে বশীভূত রেখেছিল। পাতালপুরে পূজা দিয়ে তাঁদের মনস্কাম সিদ্ধ হয়েছে, অনেক পদস্থ লোকের মুখে আমি একথা শুনেছি! যা হ'ক, এতদিন পরে, তাদের মায়াজাল যে ছিন্ন হ'ল এই সুখের। এখন মন্দিরের মেজে আর আশ্রমের বাগান খুঁড়ে দেখ, কি কি জিনিস পাওয়া যায়।" আজ্ঞামাত্র শতাধিক লোক এসে খুঁড়্‌তে আরম্ভ কল্লে। কোথাও একটী সম্পূর্ণ কঙ্কাল, কোথাও মানুষের মাথা, হাত পায়ের হাড়, কোথাও সোণারূপার গহ্না, প্রচুর, বেরুতে লাগ্‌ল। একটা নূতন গর্ত্ত থেকে দু'টী কঙ্কাল একসঙ্গে বেরুল। তা'দের মাংস পচে গিয়েছিল, কিন্তু মাথার চুল, দাঁত, হাড় সব ঠিক ছিল। দেখে বোঝা গেল—একটী পুরুষের,—একটী নারীর কঙ্কাল। যা'দের রূপে তাঁর গৃহ একদিন উজ্জ্বল হয়েছিল, হুকুমচাঁদ বুঝ্‌লেন, তাঁর সেই পুত্রপুত্রবধূর পরিণাম এই হয়েছে। তিনি ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। স্লিমানের আদেশে পাতালবাসী ঋষির আশ্রম চুরমার করা হল। এখন তার চিহ্ন মাত্র নাই।

পূজারি মহাশয়দের আর তাঁ'দের সহযোগী সেই দোকানদারের পরিণাম

কি হ'ল, তা' বলা নিষ্প্রয়োজন। কা'রও ফাঁসী, কা'রও দ্বীপান্তর, কা'রও সুদীর্ঘ কারাবাস হ'ল। স্লিমানের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফল্‌ল; পাতাল বাসী ঋষির আশ্রম আর মির্জ্জাপুর অঞ্চলের ঠগের দল একসঙ্গে নির্ম্মূল হ'ল। *

* বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ঠগদের একটা প্রধান বিহারক্ষেত্র ছিল। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তারা বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা দিত বলে প্রবাদ আছে। ঠগেরা একজাতীয় লোক ছিল না; হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, নানাজাতীয় ছিল। সাধারণ লোকে তা'দের চিন্‌তে পাত্তো না; কিন্তু কি একটা গুপ্ত সঙ্কেত ছিল, তা'দ্বারা তারা পরস্পরকে চিনে নিত; তার্‌পর সকলে একসঙ্গে কাজ কর্ত্তো।

তৃতীয়।

বিক্রমাদিত্য ও তাল, বেতাল।

রাজার রাজা ছিলেন বিক্রমাদিত্য; তাঁ'র প্রকৃত নাম ছিল যশোধর্ম্ম-দেব; কিন্তু বিক্রমে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যতুল্য ছিলেন বলে তাঁর উপাধিটাই তাঁর নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমন ছিল তাঁর বিভব, তেম্নি ছিল তাঁর বাহুবল, তারই উপযুক্ত ছিল তাঁর বিদ্যা। শত্রুরা যে কোন্‌টার গুণে হার মান্‌ত, তা বলা কঠিন। প্রথমে তাঁর বিভবের কথা বলি। তাঁর ভাণ্ডারে কেবল হীরা, মুক্তা ও সোণাই থাকৃত; রূপা, তাঁমা রাখ্‌বার তা'তে স্থান হ'ত না। প্রবাদ আছে যে এক মাণিক সাত রাজার ধন; বিক্রমাদিত্যের ভাণ্ডারে যে কত মাণিক ছিল, তার সংখ্যা নাই। লোকে বল্‌ত, আকাশের তারা বরং গণনা করা যায় কিন্তু বিক্রমাদিত্যের ভাণ্ডারের মণি, মুক্তা গণনা করা যায় না। এ কথাটা সত্য হ'ক আর নাই হ'ক, তাঁর ভাণ্ডার যে অক্ষয়, দানে, ব্যয়ে যে তার হ্রাস হ'ত না, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। তাঁর বাহুবল ছিল তাঁর এই অতুল বিভব রক্ষার উপযুক্ত। তিনি নিজে ছিলেন একজন অদ্বিতীয় বীর, তাঁর সৈনিকেরাও ছিল এক এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। হাতী, ঘোড়া, রথ, পদাতি, নৌকা, যুদ্ধের উপকরণ যে কত ছিল, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। যুদ্ধের হাতীগুলো দাঁড়ালে মনে হ'ত, পাহাড়ের সার চলেছে; ঘোড়াগুলো রণক্ষেত্রে ছুট্‌লে তা'দের পায়ের ধূলোতে আকাশ ভরে যেত। তূরী, ভেরী, শিঙা বাজ্‌লে আষাঢ়ের মেঘ গর্জ্জন কচ্চে বলে মনে হ'ত। তার পর বিদ্যায় সে সময়ের কোন রাজা তাঁ'র সমকক্ষ ছিলেন না। কেবল রাজা, রাজপুত্র নয়, সাধারণ লোকদের মধ্যেও তাঁর মত

বিদ্বান্ দুর্লভ ছিলেন। কি করে পীড়িত হাতী ঘোড়ার চিকিৎসা কত্তে হয়, রত্নের দোষ গুণ পরীক্ষা কত্তে হয়, তা' হ'তে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতি পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি নিজেও যেমন বিদ্বান্ ছিলেন, বিদ্বানেরও তেম্‌নি সমাদর কত্তেন। এইজন্য সে সময়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা, নানা দেশ, হ'তে এসে, তাঁ'র সভায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু কেবল এইগুলিতেই বিক্রমাদিত্যের গৌরব ছিল না। ধর্ম্মের প্রতি তাঁর এমন প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, ভোগ-সুখে তাঁর এমন বৈরাগ্য ছিল যে, ঋষি-তপস্বীদেরও তেমন দেখা যায় না। তিনি যে কত ব্রত, কত যজ্ঞ, কত দান করেছিলেন, তার ইয়ত্তা নাই। কখনও প্রকৃতির শোভার মধ্যে, হয়ত কোন নির্জ্জন গিরিগুহায়, না হয় কোন নদীতীরে, ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, কখনও দেবালয়ে বসে স্তবপাঠ কত্তেন, কখনও হোমকুণ্ডে আহুতি দিতেন। বাহিরে তিনি প্রতাপশালী সম্রাট্, কিন্তু অন্তরে তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। রাজ্যস্থিতির জন্য তিনি স্বর্ণময় সিংহাসনে বস্‌তেন, রত্নময় পরিচ্ছদ পরিধান কত্তেন, কিন্তু রাজসভা থেকে এলেই তিনি দীনের দীন হয়ে যেতেন। তখন তাঁর কক্ষে তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য একটী মৃন্ময় কলসীতে জল এবং বিশ্রামের জন্য একটী মাদুর ভিন্ন আর কিছু স্থান পেত না। তাঁর কোন্ গুণের অধিক প্রশংসা কর্‌ব, ভেবে পাই না। ভারতবর্ষে অনেক বড় বড় রাজা রাজত্ব করেছেন, কিন্তু, সকল বিষয় বিবেচনা কল্লে, কেউ বিক্রমাদিত্যকে অতিক্রম করেছেন, এমন বোধ হয় না।

একদিন রাজা সভায় বসে রাজকার্য্য কচ্চেন, এমন সময়ে, এক সন্ন্যাসী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর চেহারা আর তাঁর বেশভূষা দেখে তাঁকে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বলে বোধ হ'ল। তাঁর এক হাতে একটা মড়ার মাথার খুলি, আর এক হাতে একটা প্রকাণ্ড ত্রিশূল। সর্ব্বাঙ্গে চিতার ভস্ম মাখা, গলায় মড়ার হাড়ে গাঁথা মালা, কপালে রক্ত চন্দনের রেখা, দু'টী ভ্রূর মধ্যে সিন্দূরের টিপ, মাথার জটা সাপের মত কুণ্ডলী করে বাঁধা। বয়স বোধ

হ'ল, আশী বৎসরের উপর; কিন্তু তিনি এমন সুস্থ, সবল যেন যুবাপুরুষকেও মল্লযুদ্ধে আহ্বান কত্তে পারেন। তাঁকে দেখ্‌বামাত্র রাজা, সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে, প্রণাম কল্লেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন;—"মহারাজ! আপনার কল্যাণ হ'ক। আমি বহুদূর হ'তে এসেছি, আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে একটু আলাপ কত্তে চাই।" শোন্‌বামাত্র রাজা, অন্য কার্য্য রেখে, সন্ন্যাসীকে নিয়ে একটী নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ কল্লেন। উভয়ে উপবেশন কল্লে সন্ন্যাসী বল্লেন;—"মহারাজ! আমি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করেছি। যেখানেই গিয়েছি, আপনার যশ শুনেছি। কেউ আপনার বিদ্যার, কেউ আপনার বলের, কেউ বা আপনার বিভবের প্রশংসা করে। আমার তাই কৌতূহল হয়েছে যে আপনি কিরূপে, একসঙ্গে, এই তিনটী সমান অর্জ্জন কল্লেন। যে যে গুণে আপনি এইগুলি লাভ করেছেন, আমাকে একে একে বলুন। প্রথমে বলুন আপনার বিদ্যা-লাভের প্রধান উপায় কি?"

রাজা বল্লেন;—"প্রভো! আমার নিজের কি গুণ আছে বা না আছে, সাধারণেই তার বিচারক; আমার পক্ষে কোন কথা না বলাই সঙ্গত। তবে আপনি যখন আদেশ কচ্চেন, তখন, নীরব থাকাও কর্ত্তব্য নয়। সেই-জন্যই বল্‌চি, আমার বিদ্যালাভের প্রধান উপায় এই যে, আমি কা'রও নিকট হ'তে শিক্ষালাভ কত্তে সঙ্কোচ বোধ করি না। "নীচ হ'তেও উত্তম বিদ্যা অর্জ্জন কর্ব্বে" এই নীতিবাক্য আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। কৃষকের নিকট বীজ-বপনের প্রণালী যেমন শিক্ষা করি, চিকিৎসকের নিকট রোগের লক্ষণ ও প্রতীকারের উপায় যেমন অবগত হই, দার্শনিক পণ্ডিতের নিকট আত্মার ও পরমাত্মার সম্বন্ধ, পুনর্জ্জন্ম আছে কি না, তত্তদ্বিষয়েও তেমনই উপদেশ লই। অতি দীন হীন, নিরক্ষর ব্যক্তি—লোকে যা'দিগকে সাপুড়ে, ভূতুড়ে বলে ঘৃণা করে, তা'দেরও মধ্যে আমার গুরু আছেন। আমার বিদ্যালাভের এই প্রধান উপায় বলেই আমার বিবেচনা হয়।"

সন্ন্যাসী। আপনার উত্তরে আমি তৃপ্ত হ'লুম। আপনার বিভবের কারণ কি, এখন আমায় বলুন।

রাজা। "আমার বিভব অর্থে আমার রাজ্যের বিভব বলাই, বোধ হয়, আপনার অভিপ্রেত ?

সন্ন্যাসী। "হাঁ তাই বটে। প্রজার বিভব ব্যতীত রাজার বিভব কোথা হ'তে আস্‌বে।"

রাজা। নিজের দৃষ্টান্তে আমি আমার প্রজাদিগকে অনলস হ'তে শিক্ষা দিয়েছি। আলস্যই দারিদ্র্যের মূল। আমার প্রজারা পরিশ্রমী বলে দারিদ্র্য-দুঃখ বা অভাব জানেনা। তা'র উপর আমি উৎকৃষ্ট দ্রব্য পেলেই সংগ্রহের চেষ্টা করি। তা'তে, আপাততঃ কিঞ্চিৎ ব্যয়াধিক্য হ'লেও, পরিণামে, প্রচুর লাভ হয়। আমার হস্তী, অশ্ব, ভাণ্ডারের রত্ন সকলই অত্যুৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট দ্রব্যের প্রতি আমার এই অনুরাগ দেখে আমার প্রজারা ক্ষেত্রের ফল, মূল হ'তে শিল্পদ্রব্য পর্য্যন্ত সমস্তই উত্তমরূপে প্রস্তুত কত্তে অভ্যাস করেছে। অপর দেশের লোকেরা সেই সকল দ্রব্য অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করে নিয়ে যায়। একদিকে আমার প্রজাদের শ্রমশীলতার, অপরদিকে তা'দের কর্ম্মনৈপুণ্যের গুণেই আমার রাজ্য এরূপ সমৃদ্ধিশালী এবং ভাণ্ডার এরূপ রত্নপূর্ণ হয়েছে।"

সন্ন্যাসী। "রাজোচিত কার্য্যই আপনি করেন। আপনার বিভবের কারণ আমি বেশ বুঝলুম। এখন আপনার বল কিরূপে অর্জ্জন করেছেন, সেইটী শুন্‌লেই আমি তৃপ্ত হই।"

রাজা। "বল কেবল দেহে নয়; বল মনে। নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা আমি যেমন আমার দেহকে বলিষ্ঠ করেছি, সংযম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা আমি আমার মনকেও তেমনি সবল রেখেছি। বিপদের সম্মুখীন হ'তে আমার ভয় হয় না; বিপদ আমাকে অবসন্ন কত্তে পারেনা। আমি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছি, আবার বহু যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি। কিন্তু সর্ব্বত্র মনের

সাম্য রক্ষা করে চলেছি। সম্পদে বিপদে, সাম্যই, আমার বিবেচনায়, আমার বলের প্রকৃত কারণ।"

সন্ন্যাসী। "অতি সুন্দর উত্তর আপনি দিয়েছেন। আমি সন্ন্যাসী, আপনি আমাকেও শিক্ষা দিলেন। বিধাতা যে আপনার প্রতি এত কৃপা করেছেন, তার উপযুক্ত পাত্রই আপনি। আমি এতক্ষণ আপনার কার্য্যের ব্যাঘাত কল্লুম, এক্ষণে বিদায় নেব। কিন্তু যা'বার পূর্ব্বে আপনার কিছু উপকার করে যেতে চাই। আগামী আষাঢ়ী অমাবস্যায় আপনি সিপ্রার কূলে যে মহাশ্মশান আছে, একাকী সেখানে গমন কর্ব্বেন। সেখানে এমন কিছু পা'বেন, যা' আপনার এই বিশাল রাজ্যেও দুর্ল্লভ। আপনার বিদ্যা, বিভব, বল তিনই সার্থক' হবে।"

রাজা। "আপনার আদেশ পালন কর্‌ব।"

"আপনার মঙ্গল হ'ক" বলে সন্ন্যাসী বিদায় নিলেন।

আষাঢ়ী অমাবস্যা এসেছে। আকাশ, মেঘে আচ্ছন্ন হওয়ায়, সন্ধ্যা না হ'তেই, চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হয়েছে। একটীও নক্ষত্র দেখা যাচ্চেনা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্চে আর সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবী বিদীর্ণ করে, বজ্র হান্‌চে। শোঁ শোঁ করে বাতাস বইচে, মাঝে মাঝে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়্‌চে। পথ জনশূন্য, পিচ্ছিল; কেউ ঘর থেকে বেরুতে সাহস কচ্চেনা। কিন্তু রাজা সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন; সে প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তেই হবে. তিনি নিজের ঢাল, তলোয়ার নিয়ে বেরুলেন এবং একটী নির্জ্জন পথ দিয়ে একা শ্মশানের দিকে চল্লেন। শ্মশানের তিন দিকে গুল্মবন, একদিকে নদী। কোথাও মড়ার মাথা, মড়ার হাড় রাশীকৃত কয়লার সঙ্গে পড়ে আছে। ছেঁড়া কাঁথা, খাটিয়া, ভাঙ্গা কলসী যেখানে, সেখানে পড়ে রয়েছে। এক যায়গায় একটা মড়া পড়েছিল; ঝড় বৃষ্টিতে কাঠ যোগাড় কত্তে না পেরে সঙ্গের লোকেরা তার মুখাগ্নি করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। শিয়ালের পাল সেটাকে ঘিরে

দাঁড়িয়ে খ্যাক্ খ্যাক্ করে ডাক্‌ছিল; কখনও বা পরস্পর কামড়া-কামড়ি কচ্ছিল। আধ নিবন্ত দু' একটা চিতা থেকে এমন দুর্গন্ধ উঠ্‌ছিল যে নিকটে দাঁড়ান যায় না। শ্মশানে যে গাছগুলো ছিল, বাতাসে ঘন ঘন দুল্‌ছিল, আর তা'দের ছায়া চিতার অস্পষ্ট আলোকে যেন ভূতের মত নাচ্‌ছিল। সাঁই গাছের ডালে বাতাস লেগে এমন বিকট শব্দ হচ্ছিল, যেন কেউ রোগের যন্ত্রণায় গোঙাচ্চে। রাজার বোধ হল যেন কেউ তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল; যেন কেউ তাঁর পিছু পিছু আস্‌চে! নির্ভীক হলেও তাঁর বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে কাঁপতে লাগ্‌ল। তবুও তিনি সাহসে ভর করে চল্লেন। এক যায়গায় একটা আলো জ্বল্‌ছিল; সেখানে গিয়ে তিনি যা' দেখ্‌লেন, তা'তে তাঁর সর্ব্বশরীরের লোম একসঙ্গে খাড়া হয়ে উঠ্‌ল। তিনি দেখতে পেলেন, একটা বিকটমূর্ত্তি মড়া পড়ে আছে। তার গলায় ফাঁসী লাগান, জিবটা বেরিয়ে পড়েছে, চোক দুটো যেন কপালে উঠেছে। মড়াটার কপালে, বুকে রক্তচন্দন, গলায় রক্ত করবীর মালা, কোমরে রক্ত বস্ত্র জড়ান। মড়ার কাছে অসুরের মত চেহারার দুটা লোক বসে আছে। একজন একটা নারিকেলের মালায় ভরে মদ, মাংস এগিয়ে দিচ্ছে আর একজন, বিড়্ বিড়্ করে কি মন্ত্র পড়তে পড়তে, সেগুলো মড়াটার মুখে ঢেলে দিচ্চে। রাজা তন্ত্রের শবসাধনের কথা শুনেছিলেন; বুঝ্‌লেন এরা অমাবস্যা তিথিতে শ্মশানে বসে শবসাধন কচ্চে। তিনি নিঃশব্দে তা'দের কাজ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। সাধন শেষ হলে সেই লোক দু'টো রাজাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। কি বিকট মূর্ত্তি! ছোট খাট তালগাছের মত লম্বা, মাথায় গোছা গোছা জটা, আলো পড়ে সে গুলো তামার শলার মত ঝক ঝক কচ্ছিল, কোমরে গুলবাঘের চামড়া জড়ান, হাতে প্রকাণ্ড ত্রিশূল। চোক দু'টো যেন তপ্ত অঙ্গারের মত জ্বল্‌ছিল, দাঁতে দাঁতে ঘসায় কড়্ কড়্ করে শব্দ হ'চ্ছিল। রাজা ভাব্‌লেন, এরা নিশ্চিত প্রেত, এই শ্মশানে বাস করে। তারা রাজাকে একবার আপাদমস্তক দেখ্‌লে। তাদের মধ্যে একজন

প্রেতের মত স্বরে বল্‌লে ;—তুঁই এঁসেছিস্ ; বেঁশ বেঁশ ! আঁমরা তোঁকে দেঁখ্‌তে চেঁয়েছিলুম।

রাজা। "কি জন্য ?"

প্রেত। "তুঁই দেঁশের রাঁজা ! সঁকলকে খেঁতে, পঁরতে দেঁওয়ার ভাঁর তোঁর উঁপর। আঁমরা খেঁতে চাঁই, পেঁট ভঁরে খেঁতে চাঁই ; তুঁই দিঁবি ?"

রাজা "দেব ! কি চাও বল।"

প্রেত। আঁগে সঁত্যি কঁর্। বঁল দেঁব, দেঁব, দেঁব।"

রাজা। "সত্য কচ্চি, দেব, দেব, দেব। কি চাও ?"

প্রেত। "এঁকটা মাঁনুষ ; এঁকটা আঁস্ত, জ্যাঁন্ত মাঁনুষ।"

রাজা। "সে কি ! তোমরা মানুষ খাবে ? আমি মানুষ কেমন করে দেব ? ছাগল, ভাড়া যা চাও দিতে পারি।"

প্রেত। ছিঁ ছিঁ ! তোঁর কঁথার ঠিঁক নাই ? তঁবে কেঁন সঁত্যি কঁল্লি ? তোঁর এঁত প্রঁজা, তুঁই এঁকটা মাঁনুষ দিঁতে পাঁর্ব্বিনা !

রাজা। "আমি প্রজাদের পালক, ঘাতক ত নই ? তবে কেমন করে দেব ?"

প্রেত। "প্রঁজা-রঁক্ষা ধঁর্ম্ম ; সঁত্য-রঁক্ষাটা কিঁ ধঁর্ম্ম নঁয় ?"

রাজা। "সত্য-রক্ষা প্রজাপালন হতেও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।"

প্রেত। "ভাঁল কঁথা ; দেঁখ্‌ছি তোঁর ধঁর্ম্মজ্ঞান আঁছে। যখঁন তুঁই প্রঁজা দিঁতে পাঁর্ব্বিনা, অঁথচ সঁত্যি কঁরেছিস, তঁখন নিঁজেকে দেঁ।"

রাজা। "একথা বল্‌তে, পার। আমি আমার এই শরীর দিলুম, তোমাদের যা' ইচ্ছা হয় কর।"

রাজা, এই বলে, আপনার অস্ত্র, শস্ত্র, পরিচ্ছদ খুলে দাঁড়ালেন। প্রেতেরা তখন দু'দিক হতে বজ্রমুষ্টিতে তাঁর দুই হাত ধল্লে। একজন তাঁর বুকে মার্‌বে বলে আপনার প্রকাণ্ড ত্রিশূলটা উঠালে। রাজা স্থির, ধীর, নির্ভীক, নিশ্চল ! একটী বারও তাঁর চোকের পলক পড়্‌ল না, পা কাঁপ্‌ল না ; মুখে

প্রশান্ত, পবিত্র জ্যোতি দেখা গেল। আকাশের দিকে চেয়ে যেন তিনি ধ্যানস্থ হলেন। প্রেতেরা তাঁর ভাব দেখে একবারে অবাক হ'ল। আস্তে আস্তে তাঁর হাত ছেড়ে দিয়ে, ত্রিশূল নামিয়ে, ছু'জনে তাঁর পায়ের কাছে বস্‌ল। হাতজোড় করে প্রথম প্রেত বল্লে ;—

"মহারাজ! আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আমরা এতক্ষণ আপনাকে পরীক্ষা কচ্ছিলুম। বুঝ্‌লুম, আপনি আমাদের প্রভু হ'বার যোগ্য বটেন। আপনি আমাদিগকে আশ্রয় দিন। আমরা সত্যই আপনার নিকট ভোজ্যার্থী।"

রাজা দেখ্‌লেন, প্রেতের কণ্ঠে সেই বিকৃত স্বর নাই, মুখে সে উগ্র ভাব নাই। তিনি বল্লেন; "তোমরা কে? তোমাদের পরিচয় দাও"

প্রথম প্রেত। "মহারাজ! আমার নাম তাল, এইটী আমার কনিষ্ঠ, এঁর নাম বেতাল। আমরা যমজ। কে আমাদের মাতা, পিতা, কোথায় আমাদের জন্মভূমি, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞান নাই। শৈশব হ'তে আমাদের গুরুদেবই আমাদের লালন পালন করেছেন। তিনিই আমাদিগকে মল্লযুদ্ধ হতে শবসাধন পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর সমাধিগ্রহণের সময় হয়েছে বলে তিনি আমাদিগকে কোন যোগ্যব্যক্তির আশ্রয়ে রাখ্‌তে চান। কিন্তু আমরা প্রভু বলে স্বীকার কত্তে পারি এমন কোনও ব্যক্তিকে আজ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাইনে। তাই তাঁর সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি। গুরুদেব আপনার সঙ্গে পরিচয়ে আপনাকে আমাদের প্রভু হ'বার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করে এই শ্মশানে আস্‌তে বলেছিলেন। আমরা এতক্ষণ আপনাকে পরীক্ষা কচ্ছিলুম। যিনি নিজে সাহসী নন, তিনি কেমন করে আমাদিগকে কোন দুঃসাহসের কাজে পাঠাবেন? যিনি আশ্রিতের জন্য নিজের প্রাণ দিতে না পারেন, তাঁর কাজে আমরা কেন প্রাণ দেব? আপনার সাহস, আপনার সত্যনিষ্ঠা, ততোধিক আপনার

প্রজাবাৎসল্য দেখে আমরা বুঝেছি, গুরুদেব যে আপনাকে আমাদের প্রভু হ'বার যোগ্যপাত্র বলে নির্দ্দেশ করেছেন, তা' ঠিকই হয়েছে।"

রাজা। "তোমরা কি কাজ কত্তে পার্ব্বে?"

প্র প্রেত। "আপনার পাদ-প্রক্ষালন থেকে শত্রুধ্বংস পর্য্যন্ত যে কোন কার্য্যে আপনি আমাদিগকে নিযুক্ত কর্ব্বেন, তা'তেই আমরা আপনাকে সন্তুষ্ট কত্তে পার্‌ব। যে কার্য্য সাধারণ লোকের দুঃসাধ্য আমরা তা' সম্পন্ন কর্‌ব।"

রাজা। "উত্তম! এখন আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে এই শবসাধন কচ্ছিলে, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? মারণ না বশীকরণ?"

প্র প্রেত। "মহারাজ! আমরা এমন নীচ নই যে, কা'কেও নিহত কর্‌বার জন্যে বা কোন ব্যক্তিকে অবৈধ উপায়ে বশীভূত কর্ব্বার জন্যে, এমন কাজ কর্‌ব। সেরূপ সাধনে ধর্ম্মহানি হয়, সাধকের শক্তি ক্রমে লোপ পায়। আপনার অবিদিত নাই কেউ রাজ্যের জন্য, কেউ ঐশ্বর্য্যের জন্য, কেউ সুন্দরী রমণীর জন্য, কেউ বা স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বিচরণের শক্তিলাভের জন্য শবসাধন করে। কিন্তু আমরা এ সকলকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা উচ্চতর। আমরা অমর হ'তে চাই।"

রাজা। "মর জীব হয়ে তোমরা অমর হ'তে চাও? এ আশা কিরূপে পূর্ণ হবে?"

প্র-প্রেত। "হ'বে, মহারাজ! হ'বে। সেইজন্যই আমরা আপনার আশ্রয়প্রার্থী। আমরা আপনার সেবক হয়ে এমন ভাবে কাজ কর্‌ব যে, আপনার নামের সঙ্গে, অনন্তকাল আমাদেরও নাম জড়িত থাকবে। আমাদের আশা পূর্ণ হ'বে।"

রাজা। "তাই হ'ক। মহাকাল করুন, যেন আমরা পরস্পরের যোগ্য হ'তে পারি।"

পরদিন প্রাতে নগরের লোক দেখ্‌লে, প্রাসাদের বহির্দ্দ্বারে, দুই নূতন

প্রহরী ঢাল, তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তেমন আকার, তেমন বলিষ্ঠ গঠন রাজার লক্ষাধিক সৈনিকের মধ্যে এক জনেরও নাই। অত বড় দরজার চৌকাঠ যেন তা'দের মাথায় ঠেকে; পাগুলো যেন এক একটা মোটা কলা গাছ; হাত দু'টো যেন হাতীর শুঁড়। যখন তা'রা হাঁক দেয় সমস্ত রাজবাড়ী যেন কেঁপে ওঠে। দু'চার দিনের মধ্যে লোকে তা'দের গায়ের জোরেরও পরিচয় পেলে। শিকারে গেলে বড় বড় শিংওয়ালা হরিণ জ্যান্ত ধরে আনে। বুনো মহিষের শিং ধরে ঘাড়টা মুচ্‌ড়ে ভাঙ্গে। তা'দের যুদ্ধ কর্‌বার রীতিও স্বতন্ত্র। শত্রুরা হয়ত পাহাড়ের পথ দিয়ে আস্‌বার আয়োজন করেছে। তারা দুই ভাই, চুপি চুপি, পাহাড়ের উপর বড় বড় পাথর সাজিয়ে রাখ্‌লে। তার পর শত্রুদের উপর সেগুলি এমন গড়িয়ে দিতে লাগ্‌ল যে হাতী, ঘোড়া, মানুষ কত যে আহত হ'ল, বল্‌বার নয়। রণক্ষেত্রে তাদের দেখ্‌লে মনে হ'ত দু'টো সিংহ যুদ্ধ কচ্চে। তা'দের সামনে যে দাঁড়াত তার রক্ষা ছিল না। হাতীর উপর লাফিয়ে উঠে মাহুতকে নীচে ফেলে দিত; লাথি মেরে হাওদা চুরমার কত্তো; ঘোড়া থেকে সোয়ারকে চুল ধরে নামাত; পদাতিকে এমন শূলের আঘাত কত্তো যে, তার বুক ভেদ করে, পিঠের দিকে ফলাটা বেরুত। যুদ্ধের সময় ছিল তা'দের ব্যবহার এইরূপ; কিন্তু অন্য সময় তাদের দেখ্‌লে মনে হ'ত এমন শান্ত, শিষ্ট লোক বুঝি আর পৃথিবীতে নাই। পথে যেতে যেতে যদি তারা দেখ্‌ত মুটেরা মোটটা তুল্‌তে না পেরে দাঁড়িয়ে আছে, না বল্‌তে তারা গিয়ে ধর্‌ত; ছোট ছেলে আছাড় খেয়ে মাটীতে পড়েছে দেখ্‌লেই কোলে তুলে আদর কর্‌ত। তাদের মত রাজার সেবা কত্তেও কেউ জান্‌ত না। অনুমানে মনের ভাব বুঝেই তারা তাঁর কাজ কত্তো; মুখে কিছু বল্‌বার প্রয়োজন হ'ত না। মহাষ্টমীর দিন রাজার ইচ্ছা হ'ল, ভগবতীর চরণে একশ' আট পদ্ম অঞ্জলি দেন। তখন শরদের শেষ, পদ্ম প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। তাল, বেতাল সন্ধান করে, কোথায় পাহাড়ের মধ্যে একটা হ্রদে পদ্ম ফুটে ছিল, রাত্রির মধ্যে

এসে উপস্থিত কল্লে। আর একবার রাজা এক দূর বনে শিকারে যাবেন বলে সব ঠিক করেছিলেন। লোক, জন, তাঁবু বেরুবার উদ্‌যোগ হচ্ছিল। তাল, বেতাল এসে সংবাদ দিলে, কয় দিন পূর্ব্বে, সে বনে দাবানল উঠেছিল, সব জন্তু পালিয়ে গিয়েছে। সে কথা প্রমাণিত হল; রাজা বৃথা শ্রম হতে রক্ষা পেলেন। প্রতি কার্য্যেই তাদের এইরূপ প্রভুভক্তির ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া যেত। তা'দের কাজে কিছুই অতিলৌকিক ছিল না, তথাপি লোকের ধারণা ছিল যে, তারা মানুষ নয়। এরূপ ধারণার প্রথম কারণ ছিল তা'দের ভোজনের রীতিটা। সমস্ত দিনে প্রত্যেকে এক একটা বড় ভেড়া সমাধা কর্‌ত; তার রক্তটুকুও ফেল্‌ত না। দ্বিতীয় কারণ ছিল যে, অবসর পেলেই, তারা বনে, জঙ্গলে, শ্মশানে বেড়াত; মড়া নিয়ে কি তপ, জপ কত্তো। এইজন্য সাধারণের কাছে তাদের প্রেত নামটা ঘুচ্‌ল না। লোকে বল্‌ত, "মহারাজ তপস্যায় মহাকালকে সন্তুষ্ট করে তাঁর অনুচর তাল, বেতালকে লাভ করেছেন।"

হঠাৎ রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বণিক্‌পল্লীতে অত্যন্ত চোরের উপদ্রব আরম্ভ হল। নানাদেশের বণিকেরা এসে এই পল্লীতে বাস কত্তো। প্রতি রাত্রিতেই তা'দের মধ্যে এক জন না এক জনো বাটী থেকে কিছু মূল্যবান বস্তু চুরী যেত। নগরপাল বহুচেষ্টাতেও যখন চোর ধত্তে পাল্লে না, তখন রাজাকে এসে সমস্ত জানালে। রাজা বল্লেন;—"আমি নিজেই যাব, দেখ্‌ব চোর ধরা পড়ে কি না।" তাল, বেতাল শুনে বল্লে;—"মহারাজ! আমরা থাক্‌তে আপনি যদি এই তুচ্ছ কাজে যান, লজ্জার অবধি থাক্‌বে না। অনুমতি করুন, তিন রাত্রির মধ্যে আমরা চোর ধরে দেব।" রাজা "তথাস্তু" বলে সম্মতি জানালেন।

তাল বেতাল তাদের অস্ত্র, শস্ত্র আর তা'দের পোষা একটা শিয়াল নিয়ে, যে গ্রামে চুরী হচ্ছিল, গোপনে সেই গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হল। যে যে বাড়ীতে চুরী হয়েছিল, সেখানে পায়ের দাগ আছে কিনা, চোরদের ব্যবহৃত

কোন জিনিষ পাওয়া যায় কি না দেখ্‌লে। কিছুই পাওয়া গেল না। গ্রামে যে সকল বন, জঙ্গল, ভাঙ্গা বাড়ী ছিল, সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলে, কোথাও কোন চিহ্ন মিলল না। দু'দিন, দু'রাত্রি কেটে গেল; তিন রাত্রির মধ্যে চোর ধরে দেবার কথা আছে ভেবে তা'রা একটু উৎকণ্ঠিত হ'ল, গ্রামের বাইরে, কোথাও, কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা দুই ভায়ে খুঁজ্‌তে বেরুল। একটা বড় দীঘির ধারে খানিকটা উঁচু জমি ছিল. লোকে সেটাকে মড়াডাঙ্গা বল্‌ত। যে সকল লোক গলায় দড়ী দিয়ে, জলে ডুবে বা সর্পাঘাতে মর্‌ত, তাদের না পুড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন সেই মড়াডাঙ্গায় ফেলে রেখে আস্‌ত; শিয়ালে, শকুনিতে তাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া .কত্তো। মড়াডাঙ্গার একপাশে খানিকটা জঙ্গল ছিল। বড় বড় জঙ্গলী-গাছের সঙ্গে স্যাঁকুল আর বাজবরণ ঝোপে এমন ঘেরা ছিল যে, কেউ তার ভিতরে সহজে প্রবেশ কত্তে পাত্তো না। তাল, বেতাল দেখ্‌লে একটা সরু পথ সেই জঙ্গলের ভিতর গিয়েছে। দু'জনে সেই পথ দিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে দেখ্‌লে তা'র চারদিকে বড় বড় গাছ, কিন্তু মাঝখানটা খোলা; সেখানে কোন গাছ নাই। যায়গাটা ভাল করে দেখে দুভাই পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে। বেতাল বল্লে "দাদা! আর সন্দেহ নাই। এইটা চোরের আড্ডা।"

তাল। "কিসে বুঝ্‌লে ভাই?"

বেতাল। "এখানে যদি মানুষের যাতায়াত না থাক্‌ত, তবে এমন মাড়ান পথ পড়্‌বে কেন? মাঝের খোলা যায়গাটার দিকে দেখ, ঘাসগুলোর রঙ তেমন সবুজ নয়, পায়ের মাড়ানিতে যেন পিষে গিয়েছে। এমন যায়গায় চোর, ডাকাত ভিন্ন আর কে আস্‌বে?"

তাল। "ঠিক বলেছ। আরও প্রমাণ আছে। অই দেখ ঘাসের ভিতর, যায়গায় যায়গায়, মশাল পোড়া ছাই পড়ে আছে। চোর, ডাকাত ভিন্ন এ জায়গায় কে মশাল জ্বাল্‌বে? যত অপঘেতে মড়া এর নিকটে

ফেলে বলে গ্রামের লোক ভয়ে এ দিকে আসে না; তাই ব্যাটারা এখানে তাদের আড্ডা করেছে। চৌকী দিলেই আজ রাত্রির মধ্যে ধরা পড়্‌বে। চল, খাওয়া দাওয়া করে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানে আস্‌তে হবে। হঠাৎ আক্রমণ কর্ব্বো না; তা'দের ধরণ ধারণ, চুরী কর্ব্বার রীতি সব আগে বুঝে নিয়ে যা' কর্‌বার কর্‌ব।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাল, বেতাল, আপনাদের পোষা শিয়ালটাকে সঙ্গে নিয়ে, সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কল্লে। পথের ধারে একটা প্রকাণ্ড ছাতিম গাছ ছিল; তার পাতাগুলো এমন ঘন যে, দিনের বেলাও, তার ডালে লোক বসে থাক্‌লে দেখা যেত না। তাল সেই গাছের উপর নিঃশব্দে বসে রইল; বেতাল, গায়ে খুব ধূলো, কাদা আর রক্ত মেখে, খোলা বায়গাটার এক দিকে পড়ে রইল। শিয়ালটা থাবা পেতে তার মাথার কাছে বস্‌ল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর দেখা গেল, জন কত লোক, একটা মাটীর পাত্রে খানিকটা আগুন রেখে তা'তে ধূনো দিতে দিতে, সেই বনের ভিতর ঢুক্‌চে। তাল, বেতাল বুঝ্‌লে যে, ধূনো দেবার উদ্দেশ্য হচ্চে যে, দেওয়ামাত্র আগুন জ্বলে উঠ্‌বে, আবার নিবে যাবে; লোকে দূর থেকে আলেয়ার আলো বলে মনে কর্ব্বে। একে মড়াডাঙ্গা, তার উপর আলেয়ার আলো; কেউ কখন সে বনের দিকে আস্‌তে সাহস কর্ব্বে না। যে লোকগুলো বনের মধ্যে ঢুক্‌ল, তাদের সকলেরই মাথায় এক একটা মোট। কারু হাতে শিঁদকাটী, কারু হাতে কুলুপ ভাঙ্গার সাঁড়াশী, কারু হাতে শিকল কাটা উঁকো আর কাতারি, কারু হাতে অস্ত্র, শস্ত্র। এক জন ছিল তাদের মধ্যে দলপতি। সে আর সকলকে দু' তিনটা মশাল জ্বাল্‌তে বল্‌লে। মশাল জ্বাল্‌বামাত্র দলপতির চোক বেতালের উপর পড়্‌ল। সে চম্‌কে উঠে বল্‌লে;—"আর দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌ একটা প্রকাণ্ড মড়া পড়ে রয়েছে। এখানে ত কেউ মড়া ফেলে না, এখানে কেমন করে মড়া এল?"

একজন চোর বল্লে ;—"বোধ হয় অই শিয়ালটা টেনে এনেছে।"

দলপতি বল্লে ;—"তুই গাধা! একটা শিয়ালে কখনও অত বড় মড়া আন্‌তে পারে? আমার সন্দেহ হচ্চে, মড়া নয়।" সে উত্তর দিল, "মড়া না হলে কি শিয়ালে কখনও আগ্‌লে থাকে?"

দ্বিতীয় এক চোর বল্লে ;—"সর্দ্দার! শিয়ালগুলো দল বেঁধে শিকার করে ; দল বেঁধে গাছের কাঁঠাল পেড়ে খায়। পাঁচ সাতটা জুটে মড়াটাকে টেনে এনেছিল, একটা বসে চৌকী দিচ্চে, আরগুলো তা'দের দলের যত শিয়ালকে ডাক্‌তে গিয়েছে।"

সকলেই এ কথার সমর্থন কল্লে। দলপতি বল্লে ;—"তবু একবার সকলে মড়াটাকে ভাল করে দ্যাখ্‌।"

শুনে একজন, মশাল নিয়ে, বেতালের কাছে এল ; শিয়ালটা অমনি বনের ভিতর ঢুক্‌ল। বেতালের হঠযোগ অভ্যাস ছিল : সে এমনভাবে পড়ে রইল যে, জীবনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। দলপতি এক জনকে বল্লে ;—"আরে গুজ্‌না! তুই একবার ওটাকে জোরে ঠেলে ঠুলে দেখ্‌ত, সত্যি মড়া কিনা।"

সে বল্লে ;—"ঠাকুর! দোহাই তোমার, আমাকে এমন আদেশ দিও না। একে ত অপঘেতে মড়া, তার উপর হাড়ী, ডোম কোন জাতের মড়া, ঠিক্ নাই। ছুঁয়ে কি ধর্ম্ম হারাব? চুরি করি ব'লে ত জাত, ধর্ম্ম খোয়াতে পারি না?"

এই কথা শুনে আর কেউ বেতালকে ছুঁতে রাজী হ'ল না। সকলেই বল্লে ;—"চুরি করি বলে, অজেতে মড়া ছুঁয়ে, ধর্ম্ম খোয়াতে পার্‌ব না।"

আসল কথা এই যে, অপঘেতে মড়া নিয়ে নাড়া চাড়া কত্তে কারও সাহস হ'ল না। তখন দলপতি বল্লে ; "আহির হয়ে, রাজপুত হয়ে তোদের যদি এত ধর্ম্মজ্ঞান হল, তবে ব্রাহ্মণ হয়ে আমিই বা ধর্ম্ম দেব কেন? তবে তোরা এক কাজ কর্ ; এক জন মশাল নিয়ে, নীচু মুখ করে, মড়াটার

উপর ধর্। টপ্ টপ্ করে গরম তেল গায়ে পড়ুক; যদি জ্যান্ত থাকে ধড়্‌ফড়িয়ে উঠ্‌বে, আর যদি সত্যি মড়া হয়, যেমন আছে তেমনি থাক্‌বে।” এক জন তাই কল্লে। কিন্তু বেতালের এমনি সহিষ্ণুতা একবার নড়্‌ল না। দলপতি বল্লে; “আর সন্দেহ নেই; সত্যি মড়া বটে। এখন কে কি এনেছিস্ বা'র কর্।

তখন মোট খুলে যে যা' এনেছিল সব বা'র কল্লে। সোনার গয়না, রূপার বাসন, রেশমী কাপড় রাশীকৃত হল। একজন খানকত জরীর সাড়ী এনে ছিল। দলপতি তার পিঠ চাপড়ে বল্লে; “তুই আজ বড় খুসী কল্লি। মেয়েটার বিয়ে হবে, গিন্নীর সাধ নিজেও জরীর কাপড় পর্‌বেন, মেয়েকেও দেবেন। তুই আজ সে সাধ মিটুলি।”

চোরটা বল্লে;—“কাশী থেকে একটা সওদাগর এসেছিল। আজ তিন দিন ব্যাটার কাছে চাকর হয়ে ছিলুম। পা টিপে দিয়ে, ভাল করে ঘুম পাড়িয়ে, এই কাজ করেছি।”

দলপতি বল্লে;—এই ছ'মাসে যা' যা' মজুত হয়েছে, সে গুলোও আজ বা'র কর্। আমার মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকার দরকার। জ্ঞাতি, কুটম্ব সকলকে খাওয়াতে হবে; ষোড়শ উপচারে মহাকালের পূজা দিতে হবে; বিস্তর খরচ হবে। আর তোরাও কে কি খেতে চা'স বল্। সকলে ঘরে গিয়ে যে যা'র গিন্নীকে জিজ্ঞাসা কর, তারা কি রকম কাপড়, কি গয়না চায়। আমি সকলকে মনের মত গয়না, কাপড় দেব; যার যা' ইচ্ছে, খাওয়াব।”

চোরেরা বল্লে;—“বেশ বেশ! তোমার মেয়ে জামাই বেঁচে থাকুক, জন্মে জন্মে তুমি আমাদের সর্দ্দার হও।”

দলপতির আদেশে চোরেরা তখন নানা স্থান হ'তে লুকোন জিনিষ গুলি বা'র কল্লে। দলপতি সমস্ত দেখে, রীতিমত অংশ ক'রে, যার যে অংশ নিতে বল্লে। সকলে এক একটা মোট বেঁধে কাঁদে নিয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন

সময়, জঙ্গলে ঢোক্‌বার পথ থেকে, বাঘের গর্জ্জনের মত একটা বিকট শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মড়াটা উঠে বস্‌ল; চোক দুটো আঙ্গরার মত লাল করে তা'দের দিকে কট্‌মটিয়ে চাইলে। তার পর, এক লাফ দিয়ে, দলপতি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেইখানে এসে পড়্‌ল। "ওরে বাবা! দানো পেয়েছেরে, দানো পেয়েছেরে" বলে চোরেরা চারদিক্ থেকে পথের দিকে ছুট্‌ল। তাল, বিকট মূর্ত্তি ধরে, সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখে "ও বাবা! সেই রকম আর একটা" বলেই তারা পেছনে ফির্‌ল। তার পর যা হ'ল তা' আর বেশী বর্ণন কর্ব্বার প্রয়োজন নাই। চোরের উপর অস্ত্র চালালে অস্ত্রের অপমান হবে ভেবে তাল, বেতাল অস্ত্র নিলে না। কিন্তু শূন্য হস্তে যা কল্লে, চোরেদের দেহে চিরদিন তার চিহ্ন রইল। লাথির চোটে কা'রও পাঁজরা ভেঙ্গে গেল। কিল খেয়ে কেউ কুঁজো হল। দু' হাতে দুটোর গলা ধরে তাল, বেতাল মাথায় মাথায় এমন ঠুকে দিলে যে, তা'তেই তাদের মূর্চ্ছা হ'ল। দলপতি একটু বিক্রম দেখাবার চেষ্টা ক'রে ছিল, বেতাল তার ঘাড় ধরে মাটীতে ফেলে, দু'চারটী বজ্রমুষ্টি দিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে;—"ক্যামন! জ্যান্ত মানুষের গায় গরম তেল দেবে?" সে হাঁফ ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে বল্লে "বাবা! আর এমন কাজ করব না; প্রাণে বাঁচাও।"

তাল, বেতাল তখন তাদের কাপড়ে কাপড়ে হাতে হাতে বেঁধে, চোরা মালের বোঝা ঘাড়ে দিয়ে, রাজবাড়ীর দিকে চল্‌ল। তখনও রাত্রি প্রভাত হয়নি। রাজা ভোর না হ'তেই সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য শয্যাত্যাগ কত্তেন। তাল, বেতাল সংবাদ পাঠালে "তিন রাত্রির মধ্যে চোর ধর্‌বার আদেশ ছিল; ভৃত্যেরা, চোর, চোরাই মাল নিয়ে, উপস্থিত হয়েছে।"

পর দিন রাজসভায় চোরদের বিচার হ'ল। রাজা প্রত্যেককে সমুচিত দণ্ড দিলেন। যে সকল ব্যক্তির দ্রব্য চুরি গিয়েছিল, তা'রা তা' ফিরে পেয়ে তাল, বেতালকে আশীর্ব্বাদ কত্তে লাগ্‌ল। রাজধানীর ঘরে ঘরে তাল বেতালের প্রশংসাধ্বনি উঠ্‌ল।

পূর্ব্বে বলেছি যে, রাজার বিদ্যোৎসাহে আকৃষ্ট হয়ে, নানা দেশের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর সভায় অবস্থিতি কত্তেন। এঁদের মধ্যে নয়জন গুণে, জ্ঞানে অপর সকলের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। কা'রও চিকিৎসা-শাস্ত্রে, কারও জ্যোতিষে, কা'রও শব্দার্থজ্ঞানে, কা'রও বা অপর কোন একটী বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তাঁরাই বিক্রমাদিত্যের সভার গৌরব ও ভূষণ ছিলেন; সেইজন্য লোকে তাঁ'দিগকে নবরত্ন উপাধি দিয়েছিলেন *। মহাকবি কালিদাসকে সকলে এই নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলতেন। যখন এই নবরত্ন পণ্ডিতেরা সভায় বসে শাস্ত্রালোচনা কত্তেন, তখন সভায় লোক ধর্‌ত না। নানাদেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা এসে তাঁদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে আপনাদের সন্দেহের মীমাংসা করে নিতেন। কিন্তু কেবল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা নয়, রাজ্যের অতি দীনহীন, নিরক্ষর ব্যক্তিও এসে তাঁদের কাছে নানা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন কত্তো। পীড়িত ব্যক্তির আত্মীয়েরা এসে রোগের লক্ষণ জানালে তাঁরা ঔষধ বলে দিতেন। জন্ম-মুহূর্ত্ত বল্লে তাঁরা নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ গণনা কত্তেন, আবার বেদবেদান্তে কোন্ শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কোন্ যজ্ঞে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন, তাও লোককে বুঝাতেন। সাধারণ লোকে, কৌতুক দেখ্‌বার জন্য, এসে তাঁ'দিগকে নানারূপ অদ্ভুত প্রশ্নও কত্তো। তাঁরা, বিরক্ত না হয়ে, সকলেরই প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিতেন। অপর সকলকে এইরূপ প্রশ্ন কত্তে দেখে তাল বেতালেরও তাঁদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব্বার ইচ্ছা হ'ল। তা'রা একদিন রাজাকে বল্লে;—"মহারাজ! অনুমতি হলে নবরত্ন সভার পণ্ডিত মহাশয়-দিগকে আমরা একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কত্তে চাই।" রাজা বল্লেন, "স্বচ্ছন্দে কোরো; সকলেই যখন জিজ্ঞাসা করে, তখন তোমাদের জিজ্ঞাসায় বাধা কি?"

---

* ইঁহাদিগের নয়জনের নাম এই;—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির এবং বররুচি।

এর কয়দিন পরে যখন নবরত্ন পণ্ডিতেরা সভায় বসে রাজার সম্মুখে শাস্ত্রালোচনা কচ্ছিলেন, যখন বহু লোকে তাঁ'দিগকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তখন তাল, বেতাল এসে, ভূ নত হয়ে প্রণাম করে, বল্লে ;—"প্রভুপাদগণ! মহারাজের অনুমতিক্রমে আমরা আমাদের একটী সন্দেহ নিরসনের জন্য আপনাদের কাছে এসেছি ; অনুমতি হ'লে জিজ্ঞাসা কত্তে পারি।"

শুনে কালিদাস সহাস্যমুখে বল্লেন ; -"স্বচ্ছন্দে কর, তবে আমরা যোদ্ধা নই ; তোমরা যদি যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন কর, তা'হলে আমাদিগকে পরাজয় স্বীকার কত্তে হবে।"

তাল বল্লে ;—"প্রভু রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তাঁর বংশীয় রাজারা অযোধ্যায় রাজত্ব কত্তেন। রাজা অগ্নিবর্ণের সময়ে এক দরিদ্র কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেখানে ছিলেন ; অতি কষ্টে তাঁর জীবিকা নির্ব্বাহ হ'ত। একদিন তাঁর পত্নী তাঁকে বল্লেন ; "প্রভু! একমুষ্টি তণ্ডুল ত গৃহে নাই ; শিশুগুলি প্রাতঃকালে উঠেই অন্ন অন্ন করে কাঁদতে থাক্‌বে, তার উপায় কি কর্ব্ব ?" ব্রাহ্মণ বল্লেন ;—"ভগবানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় আর কি বল্‌ব ? ক্ষুদগুঁড়া যা' আছে, তা'দিগকে সিদ্ধ করে দাও, নিজেরা উপবাসী থাক্‌ব।" ব্রাহ্মণী বল্লেন ;—"তা' হ'বেনা, সূর্য্যবংশীয় রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণ উপবাসী থাক্‌লে রাজার অকল্যাণ হবে। আমাদের অবস্থা তাঁকে জানাতে হবে ; তার পর তিনি যদি কিছু না করেন, আর আমাদিগকে উপবাসী থাক্‌তে হয়, সে পাপের ভাগী তিনিই হ'বেন ; কিন্তু না জানালে আমরাই পাপী হব।"

ব্রাহ্মণ বল্লেন ;—"তবে আমায় কি কত্তে হবে, তা' বল। আমি যাচক-রূপে কা'রও কাছে কখন কিছু প্রার্থনা করি নাই, এখনও কত্তে পার্ব্বনা। ব্রাহ্মণ বলে ভক্তি করে কেউ কিছু প্রণামী দেন, নিতে পারি, কিন্তু ভিক্ষা বলে কিছু নিতে পার্ব্বনা।"

ব্রাহ্মণী বল্লেন ;—"না, আমি আপনাকে ভিক্ষা কত্তে বল্‌চিনা। আপনি রাজার কাছে যান, দু'চারটা কথা কইলেই তিনি আপনার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়

পাবেন। পরে রাজা যদি আপনার সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ করেন, প্রকৃত কথা তাঁ'কে বল্‌বেন। তা' হলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আপনি এখনই যান, কাল প্রাতে শিশুদের আর্ত্তনাদ আমি সহ্য কত্তে পার্ব্বনা।"

ব্রাহ্মণ বিষণ্ণমুখে রাজবাড়ীর দিকে চল্লেন। তখন অপরাহ্ণ হয়েছিল। সভাভঙ্গের পর রাজা আপনার উদ্যানে বেড়াচ্ছিলেন; মালীরা গাছে জল দিচ্ছিল। দু'চার জন সভাসদ্ মাত্র রাজার নিকটে ছিলেন, অধিক লোক ছিল না। ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার; প্রহরীরা ব্রাহ্মণ দেখে যেতে বাধা দিল না। ব্রাহ্মণ রাজার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। গাছে জল দিবার জন্যে মালীরা বাগানের মাঝে মাঝে নালী খুঁড়েছিল; দু' একটী নালী তখনও জলে পূর্ণ ছিল। পাছে কোঁচায় জল লাগে এই ভয়ে ব্রাহ্মণ কোঁচাটী ধরে, একটী নালী ডিঙ্গিয়ে, রাজার সম্মুখে এলেন। রাজাকে আশীর্ব্বাদ করে দাঁড়ালে রাজা মুখ ফিরিয়ে তাঁকে প্রণাম কল্লেন এবং কোঁচাটী তখনও ব্রাহ্মণের হাতে ধরা আছে দেখে সহাস্যমুখে বল্লেন "ইনি আর তিনি।" ব্রাহ্মণ এ কথার অর্থ কিছুই বুঝ্‌লেন না, রাজাও আর দ্বিরুক্তি কল্লেন না অনেকক্ষন এইভাবে থেকে ব্রাহ্মণ যখন দেখ্‌লেন যে রাজা তাঁকে কোন কথাই বল্লেন না, তখন, তিনি, নিরাশ হয়ে, বাড়ীতে ফিরে এলেন। ব্রাহ্মণী আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কল্লেন; "রাজা কি বল্লেন।"

ব্রাহ্মণ বল্লেন;—"একটী কথাও নয়।"

ব্রাহ্মণী বল্লেন;—"সে কি? তুমি আশীর্ব্বাদ কল্লে কি প্রণাম পর্য্যন্তও কল্লেন না?"

ব্রাহ্মণ বল্লেন;—"হাঁ প্রণাম কল্লেন। বাগানের নালীর জল পাছে কোঁচায় লাগে বলে আমি কোচাটী ধরে রয়েছি দেখে একটু হেসে বল্লেন; "ইনি আর তিনি।" এর ত অর্থ আমি কিছু বুঝলাম না। এ শাস্ত্রের কথা নয় যে একটা মীমাংসা করব।"

ব্রাহ্মণী বল্লেন ;—"শাস্ত্রীয় মীমাংসা আপনি ত চিরকালই করে আস্‌চেন, কিন্তু তা'তেত দুঃখ ঘুচ্‌ল না ; এ একটা মেয়েলি কথা, এর মীমাংসা আমি কচ্চি। মহারাজ বোধ হয় এখনও বাগানে আছেন ; আপনি এই এক ভাঁড় জল আর এই পাথরের নুড়িটী সঙ্গে নিয়ে যান। গিয়ে মহারাজকে বল্‌বেন যে, দয়া করে নুড়িটী যেন ভাঁড়ের জলে ফেলে দেন। যখন আপনি দেখ্‌বেন নুড়িটী জলে ডুবেছে, তখন খুব চেঁচিয়ে বল্‌বেন, "তিনি আর ইনি।" তা' হ'লেই আমাদের দুঃখ ঘুচ্‌বে।"

ব্রাহ্মণ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আবার রাজবাড়ীর দিকে চল্লেন। রাজা তখনও বাগানে ছিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখে বল্লেন ;—"ঠাকুর! আবার আপনি এসেছেন কেন?" ব্রাহ্মণ বল্লেন, "আমার সামান্য একটী প্রার্থনা আছে, আপনি দয়া করে এই নুড়িটী এই ভাঁড়ের জলে ফেলে দিন।" রাজা শুনে নুড়িটী ফেল্লেন। ডুবে যা'বা মাত্র ব্রাহ্মণ, হাত তুলে, চীৎকার করে, সকলকে শুনিয়ে বল্লেন "তিনি আর ইনি।" রাজা শোন্‌বা মাত্র কোষাধ্যক্ষকে ডেকে ব্রাহ্মণকে একশত সুবর্ণমুদ্রা প্রণামী আর একখানি রেশমী শাড়ী ও এক জোড়া শাঁখা দেবার জন্য আদেশ দিয়ে বল্লেন ;—আজ হতে এঁর নাম রাজবাড়ীর তালিকায় লিখে রাখ। ক্রিয়াকর্ম্মে, উৎসবে, ভোজ্য, বস্ত্র ও প্রণামী নিয়মমত যেন এঁর বাড়ীতে পাঠান হয়।" ব্রাহ্মণ, কৃতার্থ হয়ে, রাজাকে আশীর্ব্বাদ কত্তে কত্তে, বাড়ীতে ফিরে এলেন। সেই অবধি তাঁর দুঃখ ঘুচ্‌ল।"

এই গল্প বলে তাল পণ্ডিত মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা কল্লে ; "প্রভুপাদগণ! আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, রাজাই বা প্রথমে 'ইনি আর তিনি' আর ব্রাহ্মণই বা উত্তরে 'তিনি আর ইনি' বল্লেন কেন? রাজাই বা সে উত্তরে এত সন্তুষ্ট হলেন কি জন্য?"

তাল, বেতালের প্রশ্নে সভাস্থ সকলেরই বিস্ময় জন্মিল। রাজা বিক্রমাদিত্য পণ্ডিতেরা কে কি বলেন, শোন্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে রইলেন।

সকলেই নীরব আছেন দেখে রাজা কালিদাসের মুখের দিকে চাইলেন। তিনি দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন ;—"তাল বেতাল! তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্চি। রাজা দেখেছিলেন যে ব্রাহ্মণ, নালীর জলে কাপড় ভিজবার ভয়ে, কোঁচাটী ধরে আছেন ; তখন তাঁর স্মরণ হয়েছিল, ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন মহর্ষি অগস্ত্য, একদিন, এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করেছিলেন ; আর ইনি নালীর জলে কোঁচা ভিজার ভয়ে তটস্থ। উভয়ের মধ্যে আজ কি পার্থক্য! রাজা এই ভেবেই বলে ছিলেন, "ইনি আর তিনি", ব্রাহ্মণ যে বলেছিলেন "তিনি আর ইনি" তার উদ্দেশ্য এই যে রাজা রামচন্দ্রের নামমাত্রে সমুদ্রে পর্ব্বতাকার শিলা ভেসে ছিল ; আর সেই বংশের রাজা ইনি স্বয়ং একটী নুড়িও জলে ভাসাতে পাল্লেন না। উভয়ের কি প্রভেদ! রাজা এই উত্তরে, নিজের হীনতা উপলব্ধি করে, বুঝেছিলেন যে ব্রাহ্মণকে শ্লেষ বাক্য বলা তাঁর উচিত হয় নাই। সেই সঙ্গে তাঁর এও মনে হল যে, ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেন নি, গৃহ হ'তে ফিরে এসে উত্তর দিলেন। সুতরাং উত্তরটা সম্ভবতঃ তাঁর নিজের বুদ্ধি হ'তে নয়, তাঁর গৃহিণীর বুদ্ধি হ'তেই এসেছে। এই জন্যই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে উভয়েরই প্রণামী স্বর্ণমুদ্রা, শাঁখা, সাড়ী দেবার আদেশ দিয়েছিলেন।"

কালিদাসের কথা শুনে সকলেই বুঝ্‌লেন সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয়েছে। সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য বল্‌তে লাগ্‌লেন। রাজা উত্তর শুনে পরম পরিতুষ্ট হ'লেন। তাল, বেতাল সেই দিন হ'তে কালিদাসের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত হ'ল।

বিক্রমাদিত্য পরম সুখে রাজত্ব কচ্ছিলেন। হঠাৎ কোথা হ'তে পঙ্গপালের মত এক দল লোক এসে তাঁর রাজ্যে প্রবেশ কল্লে। তা'দের যেমন আকৃতি তেম্‌নি প্রকৃতি। মুখে গোঁপদাড়ী নাই, চোক দু'টো গোল গোল, নাক চ্যাপ্‌টা, হনু দু'টো উঁচু। তা'দের স্বর যেমন তীব্র তেমনি কর্কশ ; কথা কইলে যেন ভাঙ্গা কাঁসর বাজ্‌চে বলে বোধ হ'ত। তা'দের না ছিল

বিদ্যা, না ছিল ধর্ম্মজ্ঞান। থাকবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না; কখনও নদীর ধারে, কখনও পাহাড়ের তলায়, কখনও বনের ভিতর, ছোট ছোট তাঁবু ফেলে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে বাস কত্তো। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য কিছুই তারা জান্‌ত না; জান্‌ত কেবল হত্যা আর লুণ্ঠন। দলপতির শিঙার শব্দ শুন্‌লেই, তলোয়ার খুলে, চীৎকার কত্তে কত্তে ছুট্‌ত আর যে তাদের সামনে পড়্‌ত তা'কে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাট্‌ত। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ কিছুই তারা বিচার কত্তো না। তাদের ধর্ম্ম যে কি কেউ তা' জান্‌ত না। তারা ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়্‌ত, দেবতার মন্দির ভাঙ্গত, হিন্দুর অখাদ্য দ্রব্য ভোজন কত্তো; আবার যুদ্ধে জয় হলে সূর্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতি হিন্দু দেবতার পূজা দিত। তারা যেখানে পড়্‌ত সেখানে কিছু থাকৃত না; থাকৃত কেবল পোড়া ঘর, পোড়া গাছ আর আধ পোড়া মানুষের ও পশুর মৃত দেহ। একটী গ্রাম উৎসন্ন করে তারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ কত্তো, সেটী ধ্বংস করে অন্য গ্রামে চলে যেত। এইরূপে গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ তা'দের অত্যাচারে ধ্বংস হ'ত। লোকে তাদের নাম হূণ দিয়েছিল। হূণদের অত্যাচারে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে হাহাকার উঠ্‌ল। হূণেরা নিজেরা যেমন তাদের উপযুক্ত তেম্‌নি এক রাজা ছিল। তা'র নাম ছিল মিহিরকুল। এমন নিষ্ঠুর, এমন রক্তপিপাসু লোক পৃথিবীতে অধিক জন্মেনি। রাক্ষসও বরং ভাল। সে মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে আকাশে ছুড়ে ফেল্‌ত, আর যেখানে পড়বে সেখানে আপনার তলোয়ারটা ধর্‌ত। পড়্‌লেই ছেলেটা দু'টুক্‌রো হ'ত। স্বামীর সাম্‌নে স্ত্রীর চুলের টিকি ধরে মাটীতে মুখ ঘষে দিত। ঘরে আগুন দিয়ে লুকিয়ে দেখ্‌ত আর কেউ নিবুতে গেলে তাকে কেটে আগুনে দিয়ে বল্‌ত "অগ্নিদেব! তোমার আহুতি নাও।" সাধারণ লোক বেদ পুরাণে অসুর-দের কথা শুনেছিল; তারা ভাবৃত সেই অসুরেরা, কলিযুগে, পাতাল ছেড়ে, পৃথিবীতে এসেছে। যাঁরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী তাঁরা হূণদের মানুষ বলেই

জান্‌তেন ; কিন্তু ভাবৃতেন হূণেরাই হয় ত এদেশের রাজা হবে; আর্য্যজাতি, আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্য সভ্যতা চিরদিনের মত তা'দের অত্যাচারে লোপ পা'বে।

হূণদের আক্রমণে বিক্রমাদিত্য বড় চিন্তিত হ'লেন। প্রজারা ত্রাহি ত্রাহি কচ্চে আর তিনি কিছু কত্তে পাচ্চেন না, এ তাঁর পক্ষে বড় কষ্টকর, বড় অপমানজনক বোধ হ'ল। তিনি দু' একটা যুদ্ধে হূণদের উপর জয়লাভ করেছিলেন ; কিন্তু কল্লে কি হবে ? তিনি এক দিক হ'তে তাদের তাড়ান, আর তারা আর এক দিকে দেখা দেয়। একজন যদি মরে, এক শত জন তার যায়গায় দাঁড়ায়। রক্তবীজের মত তা'রা মরেও মরে না। বিক্রমাদিত্য ভাবলেন, চারদিক হ'তে তাদের ঘিরতে না পারলে, তাদের ধ্বংস হ'বে না। তাঁর এক পরম বন্ধু ছিলেন ; তাঁর নাম নরসিংহগুপ্ত ; ইনি পরে বালাদিত্য নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি মগধ অর্থাৎ বিহার প্রদেশে রাজত্ব কত্তেন। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করে, উভয় রাজ্যের আর তাঁদের আশ্রিত, অনুগত যত রাজা ছিলেন সকলের সৈন্য মিলিত করে, তাঁরা মিহিরকুলকে আক্রমণ কর্ব্বেন স্থির কল্লেন। মিহিরকুল এই সময়ে মুল্‌তানের কাছে লুনী বলে একটা নদীর ধারে আড্ডা গেড়েছিল। চিল যেমন গাছের উপরে থেকে ছোঁ মারে, সেও তেমনি, তার আড্ডা থেকে দল বল নিয়ে, যেখানে সুবিধা পেত ছোঁ মারত। বিক্রমাদিত্য আর বালাদিত্য সেখানে গিয়ে তাদের ঘিরে ফেল্‌লেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল ; হূণেরা সত্য সত্য অসুরের মত যুদ্ধ কত্তে লাগ্‌ল। হাতী, ঘোড়া, মানুষ কেটে তারা রক্তের নদী বহা'ল। বিক্রমাদিত্য আর মিহিরকুল পরস্পরকে দেখ্‌তে পা'বামাত্রই আক্রমণ কল্লেন। দু'জনার হাতী দু'টোও শুঁড়ে শুঁড়ে জড়িয়ে, মাথায় মাথায় ঠুকে যুদ্ধ কত্তে লাগ্‌ল। তাল, বেতাল বিক্রমাদিত্যের দুই পাশে, ঘোড়ায় চড়ে, তাঁর শরীর-রক্ষকরূপে, যুদ্ধ কচ্ছিল। তারা যেখানেই যায়, শত্রুসৈন্য ভঙ্গ দেয়, কিন্তু সমুদ্রের ঢেউর মত আবার ছুটে আসে। বিক্রমাদিত্য মিহিরকুলকে লক্ষ্য করে এক

প্রকাণ্ড শূল ছুড়্‌লেন। মিহিরকুল ঢাল দিয়ে বুকটা বাঁচালে বটে কিন্তু তাঁর দক্ষিণ বাহুটা বিদ্ধ হল; হাত থেকে তলোয়ার খানা খসে পড়্‌ল। এই সময়ে মিহিরকুলের হাতী বিক্রমাদিত্যের হাতীর শুঁড় নিজের শুঁড়ে জড়িয়ে এমন জোরে টান্‌লে যে রাজার হাতীর মাথা নীচু হয়ে এল; সঙ্গে সঙ্গে পিঠের হাওদাটাও নীচু হওয়ায় রাজার পড়ে যা'বার সম্ভাবনা হ'ল। তাল, বেতাল, দেখ্‌বামাত্র, ছুটে এসে, দুই প্রকাণ্ড লোহার ডাণ্ডা নিয়ে দু'দিক হ'তে মিহিরকুলের হাতীর দুই দাঁতে এমন আঘাত কল্লে যে খানিকটা করে দাঁত ভেঙ্গে গেল; হাতী যন্ত্রণায় চীৎকার কত্তে কত্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ল; একটীবার ফিরেও চাইলে না। মিহিরকুলের শত শত সৈন্য হাতীর পায়ে দলিত হ'ল। মিহিরকুল আহত হয়েছিল, সৈন্যদের শ্রেণীভঙ্গ নিবারণ কত্তে পাল্লে না। হুণেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'ল। যে পাল্লে সে পলা'ল, কিন্তু অধিকাংশই মারা পড়্‌ল। দেশে বিক্রমাদিত্যের ও বালাদিত্যের জয় জয়কার উঠ্‌ল।

বিক্রমাদিত্য যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর তৃপ্তি হয় নি। দুর্ব্বৃত্ত মিহিরকুল যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়েছিল; সে ধরা না পড়া পর্য্যন্ত শান্তির আশা ছিল না। কোন্ দিন কোন্ মূর্ত্তিতে এসে হয়ত আবার দেখা দেবে; সেই রকম উৎপাত, অত্যাচার কত্তে থাক্‌বে; সকলেরই এই ভাবনা ছিল। কিন্তু তা'কে ধরাও বড় সহজ ছিল না। মানুষের অগম্য বন, পাহাড়, জলা এইরূপ স্থানেই সে বাস কত্তো। বিক্রমাদিত্য তাল বেতালকে ডেকে বল্লেন; "তাল, বেতাল! আর কেউ যে মিহিরকুলকে ধত্তে পার্ব্বে, আমার সে ভরসা হয় না। তোমরাই তাকে ধর্‌বার ভার নাও। যুদ্ধ-জয়টা সম্পূর্ণ কর।" "যে আজ্ঞা মহারাজ"! বলে তাল, বেতাল বিদায় নিল।

তাল, বেতাল বাছা বাছা কতকগুলি সৈনিক নিয়ে বার হল। মাট, ঘাট নদী, পাহাড়, তীর্থ, তপোবন নানা স্থানে মিহিরকুলের অনুসন্ধান কল্লে; কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলে না। ঘুরতে ঘুরতে এক পাহাড়ের তলায়,

একটা বড় জঙ্গলের কাছে এসে, সংবাদ পেলে যে মিহিরকুল, কয়েক সহস্র অনুচর নিয়ে, সেখানে লুকিয়ে আছে। জঙ্গলের ভিতর একটা প্রকাণ্ড বিল ছিল। তার চারদিকে মানুষ-প্রমাণ ঘাস আর নলখাগড়া। সেখানে লুকিয়ে থাকলে বা'র থেকে দেখা যায় না। তাল বেতালের সঙ্গে তখন কয়েক শত মাত্র সৈনিক ছিল। তাদের নিয়ে, জঙ্গল ঘিরে, মিহিরকুলকে ধরা সম্ভবপর ছিল না। হূণেরা ত যুদ্ধে অপটু নয় যে সহজে পরাজয় স্বীকার কর্ব্বে। অন্য সেনাদলের অপেক্ষা করে থাকলে মিহিরকুল যদি সেই সময়ের মধ্যে পলায় তবে তার সন্ধান পাওয়া কঠিন হ'বে। তাল, বেতাল তাই একটা কৌশল অবলম্বন কল্লে। বিলের অদূরবর্ত্তী একটী গ্রামে কতকগুলি আহিরের বাস ছিল। তারা ঘি, দুধ, দইএর জন্য মহিষ পুষ্‌ত; কিন্তু গ্রীষ্মের কয়মাস মহিষগুলোকে ছেড়ে দিত, গোয়ালে রাখ্‌ত না। মহিষগুলো, ইচ্ছামত, মাঠে, জঙ্গলে চরে, বিলের জলে স্নান করে, স্ফূর্ত্তি করে বেড়াত, বর্ষা পড়্‌লেই গোয়ালে ফিরে আস্‌ত। তখন গ্রীষ্মকাল; মহিষগুলো বিলের ধারে, ঘাস জঙ্গলের মধ্যে, দল বেধে ছিল। মহিষদের অভ্যাস এই যে, রাত্রিতে ছোট বাচ্ছাগুলিকে মাঝে রেখে, বড় বড় শিংওয়ালা মহিষগুলি চারদিকে ঘিরে থাকে। বাচ্ছাদের কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা বুঝ্‌লে একবারে ক্ষেপে ওঠে; দলসুদ্ধ মহিষ শত্রুর দিকে ছুটে যায়। তাল, বেতাল দিনের বেলা আহিরদের নিকট হ'তে মিহিরকুলের তাঁবু কোথায়, মহিষগুলো কোথায় থাকে, সন্ধান নিলে; একটা মহিষের বাচ্ছাও সংগ্রহ করে রাখ্‌লে। তার পর গভীর রাত্রিতে যখন চারদিক নিস্তব্ধ হল, তখন বেতাল জঙ্গল থেকে বেরুবার পথ আগ্‌লে রইল; আর তাল, সেই বাচ্ছাটাকে কোলে নিয়ে, মহিষের পালের কাছে গিয়ে বাচ্ছাটার কাণ কসে মুচ্‌ড়ে দিতে লাগ্‌ল। বাচ্ছাটা বেদনায় আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল। দু' একবার এইরূপ কল্লেই বড় বড় মহিষগুলোর কাণে সেই শব্দ গেল। তারা সেই দিকে ছুটে এল। তাল একটু একটু দৌড়ে যায়, আর বাচ্ছাটার কাণ মুচ্‌ড়ে দেয়। ক্রমে

দল শুদ্ধ মহিষ তার পিছু পিছু ছুট্‌ল। এই রকম খানিক দূর গিয়ে তাল মিহিরকুলের তাঁবুর মধ্যে বাচ্ছাটাকে ছুড়ে ফেলে দিল। সেটা প্রাণভয়ে চীৎকার কত্তে লাগ্‌ল, আর অম্নি পালশুদ্ধ মহিষ গিয়ে তাঁবুর উপর পড়্‌ল। একেই ত হূণদের তাঁবু অতি সামান্য, তার উপর ক্ষেপা মহিষের আক্রমণ, সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মিহিরকুলের লোকেরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছিল; অন্ধকারে মহিষের পাল এসে পড়ায় তারা যে কি কর্ব্বে ভেবে পেলে না। মহিষগুলো তাঁবুর দড়ী ছিঁড়ে, কারুকে গুঁতিয়ে, কারুকে মাড়িয়ে একবারে মহামার কল্লে। অনেকে আহত হল, অনেকে মারা গেল, অনেকে পা'লয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাল। মিহিরকুলের কি ঘট্‌বে সে কথা কারুর ভাবরার অবসর হ'ল না। অধিকাংশ লোকই প্রাণ বাচাবার জন্য বিলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। কোথায় রইল সাজসজ্জা! কোথায় রহিল অস্ত্রশস্ত্র! বিনা যুদ্ধেই তাল বেতালের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। বেতাল, সঙ্গের লোকজন নিয়ে, জঙ্গল থেকে বেরুবার পথে অপেক্ষা কচ্ছিল; মিহিরকুলকে দেখ্‌তে পেয়েই ধরে ফেল্লে। মিহিরকুলকে বেঁধে দু'ভায়ের যে কি আনন্দ তা বল্‌বার নয়। মহাস্ফূর্ত্তিতে বগল বাজিয়ে, তাল ঠুকে, মিহিরকুলের বাঁধন দড়ী দু'ভাই দু'দিক হ'তে ধরে, তা'রা রাজধানীর দিকে ফির্‌ল। বিক্রমাদিত্য পূর্ব্বেই তাল বেতালের প্রেরিত লোকের মুখে এই আনন্দ-সংবাদ পেয়ে সভা আহ্বান করেছিলেন। তাঁর বন্ধু বালাদিত্য সভায় তাঁর কাছে বসেছিলেন। দু'জনার মাথায় সোণার ছাতা; ভৃত্যেরা চামর নিয়ে তাঁদের বাজন কচ্ছিল। ব্রাহ্মণেরা তাঁ'দিগকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছিলেন, বন্দীরা তাঁদের জয়গান কচ্ছিল; নগরবাসিনী নারীরা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করে তাঁদের আনন্দ জানাচ্ছিলেন। সভা লোকে পূর্ণ; দেশের কণ্টক দূর হ'ল বলে সকলেই প্রফুল্ল। মিহিরকুল রাহুর মত হিন্দুসভ্যতাকে গ্রাস কত্তে বসেছিল; বিক্রমাদিত্যের চেষ্টায় যে সে ভয় দূর হ'ল, তা'তে লোকের আনন্দের, উৎসাহের সীমা ছিল না। এমন সময় তাল, বেতাল বন্দী মিহিরকুলকে নিয়ে

উপস্থিত হ'ল। মিহিরকুলের মুখে কথা ছিল না; সে ভয়ে থর থর করে কাঁপ্‌ছিল; প্রাণভয়ে নয়; অপমানের ভয়ে, লাঞ্ছনার ভয়ে। সে বুঝেছিল মৃত্যু নিশ্চিত, তবে মৃত্যুটা কিরূপে হবে এই বিষয়েই তার সন্দেহ ছিল। এক কোপে কাট্‌লে ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি শূলে দেওয়া হয়, প্রাণত সহজে বেরুবে না। দু' তিন দিন, হয়ত, তার চেয়েও অধিককাল, অসহ্য যাতনা ভুগ্‌তে হ'বে। কত লোক দেখ্‌তে আস্‌বে, কতলোক টিট্‌কারী দেবে; কেউ হয়ত ঢেলা ছুড়্‌বে, কেউ মুখে থুথু দেবে। হা ভগবান্! অদৃষ্ট কি শেষে এই লিখেছিলে! আবার ভাবছিল আমি যেমন তার উপযুক্ত শাস্তিরই আয়োজন হয়েছে। ভগবানকে কেন ডাকি? আমার মত লোকের উপর তাঁর কি কথনও দয়া হ'তে পারে?

মিহিরকুল সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়ালে বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা কল্লেন; "মিহিরকুল! তোমার সৈনিকেরা আমার প্রজাদের উপর যে সকল অত্যাচার করেছে, তুমি কি তা' জান?"

মিহিরকুল। "সমস্তই জানি; আমারই আদেশে সেই সকল অত্যাচার হয়েছে।"

বিক্রমাদিত্য। "তুমি স্বয়ং কোন অত্যাচার করেছিলে কি?"

মিহিরকুল। "প্রচুর! হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ এমন কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম নাই আমি যা' কত্তে বিমুখ হয়েছি।"

বিক্রমাদিত্য। "আমি তোমার কোন অনিষ্ট করেছিলুম কি?"

মিহিরকুল। "না মহারাজ! আপনি কথনও আমার কোন অনিষ্ট করেন নি।"

বিক্রমাদিত্য। "আমার প্রজারা তোমার কোন অনিষ্ট করেছিল কি?"

মিহিরকুল। "কথনও না। অহেতুক আমি তাদের উপর অত্যাচার করেছি।"

বিক্রমাদিত্য। "তোমার সত্যবাদিতায় আমি সন্তুষ্ট হ'লুম। এখন জিজ্ঞাসা করি তোমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

মিহিরকুল। "একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আমার প্রাণদণ্ড।"

বিক্রমাদিত্য। "তোমার কি আমার নিকট কোন প্রার্থনা আছে?"

মিহিরকুল। "কি প্রার্থনা কর্‌ব, মহারাজ! আমি বিজিত, লাঞ্ছিত, হৃত-সর্ব্বস্ব। আমার আংশিক প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে; প্রাণদণ্ড হলেই আমার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হ'বে। আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে আমাকে এক আঘাতে বধ কর্ব্বেন, শূলে দেবেন না।"

সভার শত শত লোক করজোড়ে বল্লে;—"তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা বা শূলে দেওয়াই পাপিষ্ঠের উপযুক্ত শাস্তি।"

বিক্রমাদিত্য বল্লেন;—"মিহিরকুল! শোন। তুমি যে সরলভাবে তোমার অপরাধ স্বীকার করেছ, সে পুরুষোচিত কার্য্যই হয়েছে। তুমি হূণ, আমরা হিন্দু; উভয়ের রাজধর্ম্মে কি পার্থক্য দেখ। আমার প্রিয় সুহৃদ্‌ মহারাজ বালাদিত্যের অনুমোদন ক্রমে আমি তোমাকে মুক্তিদান কল্লুম। আর কখনও আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করো না।"

তাল মিহিরকুলের বন্ধন মোচন কল্লে; বেতাল তাকে রাজপরিচ্ছদ পরিয়ে দিলে। মিহিরকুলের চোক জলে ভরে গেল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। সে হাঁটু গেড়ে বসে বল্লে;—"মহারাজ বিক্রমাদিত্য! মহারাজ বালাদিত্য! আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি আর কখনও আপনাদের রাজ্যে উপদ্রব কর্‌ব না। আমি হিন্দুর বীরত্ব আর হিন্দুর মহত্ত্ব বুঝ্‌লুম। এখন হ'তে আমি হিন্দুর মত হ'বার চেষ্টা কর্‌ব। আপনারা কৃপা করে হূণদিগকে হিন্দুসমাজে স্থান দিন।"

বিক্রমাদিত্য আর বালাদিত্য একসঙ্গে "তথাস্তু" বলে উত্তর দিলেন। *

* কেহ কেহ বলেন যে হিন্দু ও হূণের সম্মিলনে ভারতবর্ষের একটী প্রধান বীরজাতি রাজপুতগণ উৎপন্ন হয়েছে।

বিক্রমাদিত্যের হূণবিজয় সম্বন্ধে Vincent Smith's The Early History of India বা অপর কোন প্রামাণিক ইতিহাস দেখুন।

সভাস্থ সকলেই মিহিরকুলের বিচার দেখে মুক্তকণ্ঠে বিক্রমাদিত্যের মহানুভবতার প্রশংসা কত্তে লাগ্‌ল। তাল, বেতাল বল্লে; "মহারাজ! জন্ম জন্ম যেন আপনার মত প্রভু পাই।" রাজা তাদের পুরস্কারের কথা বল্লে তারা উত্তর দিলে; "কার জন্য পুরস্কার? না আছে আমাদের স্ত্রী পুত্র, না আছে আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব। আছে কেবল পোড়া পেট্‌টা; তা'ত মহারাজ পূরণই কচ্চেন। তবে সত্যকথা বল্‌তে লজ্জা হয় যে, এক এক দিন, একটা করে ভেড়াতেও কুলায় না। যদি দয়া হয় তবে দু' ভাইকে আরও একটা ভেড়া বরাদ্দ করে দিন।" রাজা হেসে বল্লেন; "আচ্ছা! তাই হ'বে।"

একদিকে সমকালবর্ত্তী গুণীব্যক্তিদিগকে আশ্রয় ও উৎসাহদান এবং অপরদিকে বৈদেশিক আক্রমণ হ'তে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মরক্ষা এই দুই বিষয়ে বিক্রমাদিত্যের কার্য্যের প্রশংসা করে শেষ করা যায় না।

বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর নাম ছিল উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী সিপ্রা-নামে একটী নদীর তীরে অবস্থিত। উজ্জয়িনী এবং সিপ্রা উভয়ই এখনও বর্ত্তমান আছে। উজ্জয়িনীর এখন সে পূর্ব্ব গৌরব নাই, কিন্তু সিপ্রা এখনও, কুল্ কুল্ রবে অতীতের কথা গান কত্তে কত্তে, প্রবাহিত হচ্চে। বিক্রমাদিত্যের সময়ে উজ্জয়িনীর শোভার শেষ ছিল না; স্বর্গ পুরীও যেন তার কাছে হার মান্‌ত। শৈলশৃঙ্গের মত বিশাল অট্টালিকা, সুপ্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুন্দর পুষ্পোদ্যান নগরের শোভা বর্দ্ধন কর্‌ত। কত দেবালয়, কত অতিথিশালা, কত যাত্রিনিবাস যে সেখানে ছিল তার গণনা নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকল সম্প্রদায়ের লোক সেখানে বাস কর্‌ত। নানাদেশ থেকে বণিকেরা এসে সেখানে ক্রয় বিক্রয় এবং দেশদেশান্তরের বিদ্যার্থীরা এসে সেখানে অধ্যয়ন কত্তো। মন্দিরের অন্ত ছিল না; কালভৈরব, মঙ্গলেশ্বর, চামুণ্ডা, সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবদেবীর মন্দির সেখানে বর্ত্তমান ছিল। এখনও তা'দের অনেকগুলি

দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান মন্দির ছিল মহাকালের।* মন্দিরের থামগুলি ছিল সোণার পাতে মোড়া, তার উপর ছিল হীরা মুক্তার কাজ। একবার একটী আলো জাল্‌লে হীরামুক্তার উপর প্রতিফলিত হ'য়ে সমস্ত মন্দিরটী সেই আলোতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠ্‌ত। সাধারণ লোকে বল্‌ত মন্দিরটী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। প্রকৃত কথা এই যে, নানাদেশ হ'তে সংগৃহীত উপাদানে, হাজার হাজার লোকের পরিশ্রমে আর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়েছিল। কি বিশাল তার আয়তন, কি সুন্দর তার কারুকার্য্য, কি গম্ভীর তার দৃশ্য। মন্দিরে মহাকাল মূর্ত্তি বিরাজিত; বিক্রমাদিত্য প্রতিদিন তাঁর পূজা কত্তেন। এখনও হাজার হাজার যাত্রী ভারতবর্ষের নানাস্থান হতে মহাকালকে দর্শন ও অর্চ্চনার জন্য আসেন। যেবার উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা হয়, সেবার যে কত যাত্রীর সমাগম হয় তার অবধি নাই। নদীর তীর, চতুষ্পার্শ্বের প্রান্তর, গৃহস্থের অঙ্গন যাত্রীতে ভরে যায়। সে যে কি দৃশ্য, তা'তে যে কি আনন্দ, কি উৎসাহ চোকে না দেখ্‌লে কল্পনা করা যায় না। কোথাও বড় বড় তাঁবু পড়েছে, হাতী, ঘোড়া, উট নিকটে বাঁধা রয়েছে, পাগ্‌ড়ী বাধা, তলোয়ার হাতে, দাড়ীওয়ালা সৈনিকেরা পাহারা দিচ্চে; একজন রাজা পরিবার, পরিজন নিয়ে মহাকালের পূজা কত্তে এসেছেন। তারই একটু দূরে একজন মঠপতি সন্ন্যাসী চাঁদোয়ার তলায় আসন পেতেছেন। শিষ্যেরা চামর নিয়ে তাঁকে বাতাস কচ্চে, যাত্রীরা যার যেমন শক্তি সোণা, রূপা, তাঁমার মুদ্রা দিয়ে প্রণাম কচ্চে। আবার কোথাও বিভিন্নদেশীয় সওদাগরগণ কাশ্মীরী শাল, বারাণসীর সাড়ী, হীরা মুক্তার অলঙ্কার সাজিয়ে বসে আছেন। নানা রঙের পতাকা উড়িয়ে, আনন্দধ্বনি

* দিল্লীর বাদসাহ আলতমাস এই মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। তার পরে যে মন্দির নির্ম্মিত হয় আয়োরঙ্গজেবের আদেশে তা' ধ্বংস হয়েছিল। বর্ত্তমান মন্দির তৎপরে নির্ম্মিত হয়েছে।

কত্তে কত্তে দলে দলে যাত্রী আস্‌চে। অনবরত শাঁক, ঘণ্টা বাজ্‌চে। যাত্রীরা কেউ সিপ্রায় স্নান কচ্চে, কেউ মন্দিরে দর্শন কত্তে যাচ্চে, কেউ বা সাধু সন্ন্যাসীদের পারণ করাচ্চে। যদি কেউ হিন্দুর হিন্দুত্ব কোথায় জানতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে কুম্ভমেলা দেখ্‌তে বলি। *

এই সময়ে উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা বসেছে। নানা দেশের ধনে, মানে, বিদ্যায় অগ্রগণ্য বহুব্যক্তি মিলিত হয়েছেন। যা'তে তাঁদের কোনওরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা না হয় বিক্রমাদিত্য সেজন্য আদেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের পরিতোষের জন্য আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা কত্তে বলেছেন। কত আতসবাজী পোড়ান হ'ল। কত হাতী ঘোড়া রথের শোভাযাত্রা হ'ল, কত সৈনিকদের রণকৌশল দেখান হ'ল এবং সর্ব্বোপরি একখানি নূতন নাটক অভিনীত হ'ল। পূর্ব্বে বলেছি যে রাজসভার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন মহাকবি কালিদাস। তিনি এই সময় অভিজ্ঞান শকুন্তল নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। বিক্রমাদিত্য আদেশ দিলেন সেই নাটকখানি অভিনীত হ'বে। বিপুল আয়োজন হ'ল; যেমন রঙ্গমঞ্চ, তেমনই বেশভূষা, তেমনই দৃশ্যপট, তেমনই সুনিপুণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সম্মিলন। দর্শকেরা অভিনয় দেখে মোহিত হলেন। লোকের মুখে কয়েক দিন আর কোন কথা রইল না, কেবলই অভিজ্ঞান শকুন্তল অভিনয়ের কথা। লোকে কালিদাসকে "সরস্বতীর বরপুত্র" বলে প্রশংসা কত্তে লাগ্‌ল। অভিনয় যা'তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাল, বেতাল সেজন্য উপযুক্ত আয়োজনের, পরিশ্রমের ও চেষ্টার ত্রুটি কল্লে না। লোকমুখে কালিদাসের প্রতিভার ও সেই সঙ্গে নিজেদের কার্য্যতৎপরতার প্রশংসা শুনে তালবেতালের আনন্দের অবধি রইল না।

* কুম্ভমেলা বার বৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী এবং নাসিক এই চার টী তীর্থে পর্য্যায়ক্রমে হয়।

উজ্জয়িনীতে তখন দিঙ্‌নাগাচার্য্য নামে এক বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। রচনায় না হ'ক সমালোচনায় তাঁর খুব দক্ষতা ছিল। রাজসভায় কালিদাসের প্রতিপত্তি দেখে তিনি ঈর্ষায় দগ্ধ হ'তেন এবং সুবিধা পেলেই কালিদাসের রচনায় একটা না একটা দোষ বার করে লোকের কাছে তাঁকে অপদস্থ কর্ব্বার চেষ্টা কত্তেন। অভিজ্ঞান শকুন্তল অভিনয়ের পর তিনি বলে বেড়াতে লাগ্‌লেন যে "রচনা নিতান্ত মন্দ না হ'লেও বইখানা আদৌ স্বাভাবিক নয়। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখ্‌বামাত্র অত ভালবেসে ফেল্লেন; একি প্রকৃতিসঙ্গত? তিনি নিতান্ত তরুণবয়স্ক ছিলেন না, তাঁর একাধিক রাজ্ঞী ছিল। রুক্ষকেশা, বল্কলবসনা, একটা বন্য বালিকা দেখে তাঁর এত উৎকট ভালবাসা হ'ল যে, তিনি তার বাপের তীর্থ হ'তে ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কত্তে পাল্লেন না। অথচ তাঁকে সংযতচিত্ত সত্ত্বগুণান্বিত পুরুষ বলে বর্ণন করা হয়েছে; এটা কি রকম কথা? আচ্ছা না হয় স্বীকার কল্লুম, মানুষ সময়ে সময়ে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অন্ধ হয়ে পড়ে; কিন্তু অত ভালবাসার পর, চোকের আড়াল না হ'তে হ'তে, রাজা শকুন্তলার কথা ভুলে গেলেন, এটা কি করে সমর্থন করা যেতে পারে? যা' তা' কতকগুলো রেখাপাত কল্লে যেমন আলেখ্য হয় না, যা' তা' কতকগুলো ঘটনা বর্ণন কল্লে তেমনি নাটক হয় না। স্বাভাবিকতাই নাটকের প্রাণ। স্বভাবের অভাব হলে যা' হয় তা', না টক, না মিষ্টি।"

একজন বল্লে;—"দুষ্মন্তের ভু'লে যাওয়ার কারণ ত কালিদাস উল্লেখ করেছেন। দুর্ব্বাসার শাপই যে তার মূল।"

দিঙ্‌নাগ রেগে বল্লেন;—"ওহে বাপু! সাপ, ব্যাঙ যাই বল, স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযৌক্তিক কথা বলেন, তা' গ্রাহ্য নয়। কালিদাসের এখন সময় ভাল, তাই, রাজা, প্রজা সকলেই তোমরা তার দিকে; কিন্তু এর পর বুঝ্‌বে দিঙ্‌নাগ আচার্য্যের সমালোচনাটা ঠিক কি না।"

দু'চার জন ছাড়া কেউ দিঙ্‌নাগের কথায় কাণ দিলে না। এরা কিন্তু গায়ের জ্বালায় নানা কথা বল্‌তে লাগ্‌ল।

অভিনয়ের দু' তিন দিন পরে দিঙ্‌নাগ আচার্য্যের টোলে এই সকল ব্যক্তির একটা সভা বসেছিল। আচার্য্যের সমালোচনা শুনে এক ব্যক্তি বল্লে "বইটা যাই হ'ক্, অভিনয়টা কিন্তু অতি সুন্দর হয়েছিল; এমন অভিনয় আর কখনও দেখেছি বলে স্মরণ হয় না।"

দ্বিতীয় এক ব্যক্তি বল্লে ;—"সে অই প্রেত দু'টোর গুণে।"

প্রথম। "কি রকম? তুমি ত তাল বেতালের কথা বল্‌চ? তারা ত গণ্ডমূর্খ; তারা অভিনয়ের কি জানে? কি বোঝে?"

দ্বিতীয়। অভিনয়ে যে লোকের মন মুগ্ধ হয়, সে ত কেবল অভিনেতাদের মুখের কথায় নয়। রঙ্গমঞ্চ, বেশভূষা, দৃশ্যপট সকলের গুণে হয়। অমন সুন্দর সভাগৃহ কে করালে? যে চন্দ্রাতপ দেখে লোকে মুগ্ধ হ'য়েছিল, তা অমন করে খাটালে কে? আর কারু সাধ্য হ'ত যে অই ভারী চন্দ্রাতপ অত উর্দ্ধে তোলে? আর অত উর্দ্ধে না তুল্‌লে রাজা দুষ্মন্তের স্বর্গ হ'তে রথারোহণে পৃথিবীতে অবতরণের দৃশ্যটা অমন সুন্দর হ'ত কি? বড় বড় কাঠের থামগুলো কাঁধে করে, নিমেষের মধ্যে, যথাস্থানে ব'সয়েছে! কি শক্তি! হাতীও হার মানে। পর্ব্বত, বন, তড়াগ নানা স্থান থেকে কত রকম ফুল, পাতা এনে তপোবন সাজিয়েছিল, মনে আছে ত? তার পর যে দু'টো দৃশ্যের জন্য সাধারণ লোকে অত ধন্য ধন্য করেছিল, তারা ভিন্ন সে দু'টো দেখান কখনও সম্ভবপর হ'ত না।"

তৃতীয় একজন বল্লে; "কোন্ দুটো দৃশ্য হে?"

দ্বিতীয়। সেই যে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজা ধনুর্ব্বাণ হস্তে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ কল্লেন, আর একটা কৃষ্ণসার মৃগ তাঁর সম্মুখ দিয়ে ছুটে গেল। সে মৃগটা কৃত্রিম নয়, সজীব। তাতেই ত লোকে মুগ্ধ হয়েছিল।

তৃতীয়। "বটে! আমি ত মনে করেছিলুম সেটা কৃত্রিম। আর কোন্ দৃশ্যটা?"

প্রথম। তোমার দেখ্‌চি কিছুই স্মরণ থাকে না। সেই যে শেষ অঙ্কে যেখানে সর্ব্বদমন একটা সিংহ শিশুকে বল্‌চে, "হাঁ কর্ রে সিংহ-শাবক! হাঁ কর্, আমি তোর দাঁতগুলো গণি। সে সিংহ-শাবকটাও প্রকৃত; সজীব জন্তু ছিল!

তৃতীয়। "বল কি? আর কখনও ত এমন দৃশ্য কেউ দেখাতে পারেনি।"

প্রথম। "তাইতেই বল্‌চি অই প্রেত দু'টার গুণেই অভিনয়টা এত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। তা'দের অদ্ভুত ক্ষমতা। যেমন মানুষকে বশ কত্তে পারে, তেমনই বনের জন্তুও বশ করে। শিয়াল থেকে সিংহ পর্য্যন্ত সমস্ত জন্তু তা'দের কথা শোনে। তাদেরি শেখান একটা কৃষ্ণসার আর একটা সিংহশাবক রঙ্গমঞ্চে আনা হয়েছিল, তাতেই অত আনন্দধ্বনি উঠেছিল।"

দিঙ্‌নাগ। "যা হ'ক্ কালিদাসের কিন্তু খুব কপাল জোর। মহামূর্খ; বিবাহ হ'ল একটী অনুপম রূপবতী পণ্ডিতার সঙ্গে। তাঁর কাছে লাথি খেয়ে যেই কিছু শিখ্‌লে অমনি পড়ে গেল রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সুনজরে। এখন যেন রাজার ডান হাত হয়েছে। তারই সঙ্গে রহস্যালাপ, তারই সঙ্গে পরামর্শ, তারই বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্মে গমনাগমন; আর যেন উজ্জয়িনীতে কেউ পণ্ডিত নাই। দু'টা প্রেত, অমানুষ জীব, তারাও তার গুণে মুগ্ধ!

প্রথম। "আচার্য্য মহাশয়! অই যে লাথি খাওয়ার কথাটা বল্লেন, সেটা ব্যাপার কি বুঝ্‌তে পাল্লুম না। কি হয়েছিল?

দিঙ্‌নাগ। "তা' বুঝি জান না? কি আর বল্‌ব? চেহারাটা ভাল আছে কি না; তপ্তকাঞ্চনের মত বর্ণ, প্রশস্ত ললাট, বিশাল নেত্র, সহাস্য বদন, দীর্ঘোন্নত দেহ দেখলেই একজন প্রতিভাবান সুপুরুষ বলে মনে হয়। এই চেহারার গুণে বিবাহ হয়েছিল এক পরম সুন্দরী বিদুষীর সঙ্গে। মেয়েটী

ভিতরের খবর জানত না। লোকের চক্রান্তে ভুলে আর চেহারা দেখে সম্মত হয়েছিল। রাত্রিতে বাসরঘরে বর, কন্যা বসে আছে, এমন সময় কাছে একটা উট ডাক্‌লে! কন্যার এক সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা কল্লে; "কি ডাক্‌ল?" আমাদের মহাকবি উত্তর দিলেন "উষ্ট"। কথাটা কন্যার কাণে গেল। সে জিজ্ঞাসা কল্লে "কি বল্লেন"? অলৌকিক প্রতিভাবান পুরুষ বুঝ্‌লেন, কথাটা ঠিক হয় নাই; সংশোধন করে বল্লেন "উট্র"। অমনি বাসর ঘরের এক পাল মেয়ে হেসে উঠ্‌ল। কেউ বল্লে; "জামাইটী দেখ্‌চি, উষ্ট", আর একজন বল্লে—"না না উষ্ট নয়, জামাইটী উট্র বটে"। কন্যা ত লজ্জায় মরে গেল। বড়লোকের মেয়ে রাগ সাম্‌লাতে পাল্লে না; আল্‌তা পরা পায়ের একটী লাতি দিয়ে বল্লে, "গোমূর্খ! আমাকে এমন ঠকিয়েছ! যদি কখনও লেখাপড়া শিখে আমার যোগ্য হয়ে আস্‌তে পার, তবেই এস; নচেৎ ও মুখ আমাকে আর দেখিও না।"

প্রথম। "বা! বা! বা! এ সকল কথা ত আমরা কিছুই জান্‌তুম না।"

দিঙ্‌নাগ। "তোমরা জান কি? সভায় গিয়ে কেবল চেঁচাও "সাধু সাধু"। কে সাধু, কে অসাধু তা'ত বিচার কর না।

তৃতীয়। "যা' হক বিধাতা কালিদাসের উপর খুব প্রসন্ন, তা'তেই শেষটা এত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

দিঙ্‌নাগ। "তা'তে আর সন্দেহ কি? সেই জন্যই ত এই উদ্ভট কবিতাটার সৃষ্টি হয়েছে।

কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ
কি ন করোতি বিধির্যদি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা॥

এইবার বড় একটা হাসির রোল উঠ্‌ল। চতুর্থ একজন দিঙ্‌নাগকে লক্ষ্য করে বল্লে;—"আচার্য্য মহাশয়! কালিদাসের নাটক সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় ত শুনেছি। রঘুবংশ মহাকাব্য সম্বন্ধে আপনার মত কি? রচনা বেশ প্রাঞ্জল নয়?"

দিঙ্‌নাগ। "তাই বা কি করে বল্‌ব? মনে পড়্‌ছে না দিলীপের প্রতি সুরভির অভিশাপ বর্ণনায় আছে?

অবজানাতি মাং যস্মাদতস্তে ন ভবিষ্যতি
মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা।

চতুর্থপাদে আছে শশা পসা। শুন্‌লেই হাসি পায়; একি আবার একটা কবিতা!"*

তৃতীয়। "আচ্ছা কালিদাসের ব্যাকরণ বোধ কেমন?"

দিঙ্‌নাগ। তার পরিচয় কুমারসম্ভব। যে সর্গের প্রশংসা স্তাবকদের মুখে ধরেনা, সেই সর্গেই আছে;—

স দেবদারুদ্রুম-বেদিকায়াং
শার্দ্দূল-চর্ম্ম-ব্যবধানবত্যাম্
আসীন মাসন্ন শরীর-পাত
স্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ॥

লৌকিক রচনায় ত্রিয়ম্বকং। আমার কোন ছাত্র যদি এমন ভ্রম কত্তো আমি তাকে বেত্রাঘাত কত্তুম।" †

চতুর্থ। "থা'ক্, মহাশয়! আর ও সকল কথায় কাজ নাই। সেই

* প্রকৃত পক্ষে আছে শশাপ সা অর্থাৎ তিনি শাপ দিয়াছিলেন। দিঙ্‌নাগ ব্যঙ্গচ্ছলে শব্দ দুইটীর সংযোগ অন্যরূপ করিয়া শশা পসা এই অদ্ভুত শব্দদ্বয় গঠন করিয়াছিলেন।

† ত্রিয়ম্বক পদটী বৈদিক রচনায় প্রযুক্ত হ'লেও লৌকিক কাব্যাদিতে প্রয়োগযোগ্য নয়। তাতে ত্র্যম্বক বলাই সঙ্গত।

প্রেত দু'টো এদিকে আস্‌চে। ওরা কালিদাসের বিষম গোঁড়া; শুন্‌লে একটা অনর্থ বাধাবে।"

এই সময় তাল, বেতাল্‌ সেখানে উপস্থিত হ'ল। ঘটনাক্রমে তারা টোলের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। নিজেদের নাম শুনে, কৌতূহলী হয়ে, দাঁড়িয়েছিল এবং কথোপকথনটা আদ্যন্ত শুনেছিল। দিঙ্‌নাগ তা'দিগকে দেখে জিজ্ঞাসা কল্লেন;—"বীরদ্বয়! তোমাদের এ সময় এখানে আগমন কেন? মহারাজ কি এ দীনের কথা স্মরণ করেছেন? কোন শাস্ত্রীয় মীমাংসা করে দেবার কি লোকাভাব হয়েছে?"

তাল। "না আচার্য্য মহাশয়! মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেন নি, কোন শাস্ত্রীয় মীমাংসার জন্যও লোকাভাব হয় নি। আমরা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা জান্‌বার জন্য এসেছি।"

দিঙ্‌নাগ। "উত্তম কথা! উত্তম কথা! তোমরা গুণী ব্যক্তি কি না, তাই প্রকৃত গুণের সমাদর কর্‌বার জন্য সভাপণ্ডিতগণকে ছেড়ে আমার কাছে এসেছ! এখন বল কি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিতে হবে? মৌখিক ব্যবস্থা চাও না কিছু লিখে দিতে হবে? লিখিত ব্যবস্থার মূল্য অবশ্যই অধিক।"

বেতাল। "মৌখিক ব্যবস্থা হ'লেই হ'বে। মৌখিক হউক বা লিখিত হউক আপনি ত আর অশাস্ত্রীয় কোন কথা বল্‌বেন না। আপনার বাক্যই আমরা লিখিত ব্যবস্থা বলে ধরে নেব। আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্চে এই যে, আমরা শুনেছি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিভিন্ন পাপের জন্য বিভিন্নরূপ দণ্ডের আদেশ আছে। শিরশ্ছেদ, তপ্ত তৈলে নিমজ্জন, জলদঙ্গার ধারণ প্রভৃতি নানারূপ দণ্ডের ব্যবস্থা শোনা যায়। আচার্য্য মহাশয়! চপেটাঘাতটা কোন্‌ পাপের দণ্ড?"

দিঙ্‌নাগ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন; "চপেটাঘাতটা কি আর একটা প্রকৃত দণ্ড? ওটা লঘু দণ্ডের মধ্যে গণনীয়। শিশু দুগ্ধ পান না কল্লে

মাতা তাকে চপেটাঘাত করেন; চতুষ্পাঠীতে কলরব কল্লে গুরু অবিনীত ছাত্রকে চপেটাঘাত করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই জন্যই ত বলেছি ওটা লঘু দণ্ড বলেই গণনীয়।”

বেতাল। “আচার্য্য মহাশয়! যদি কেউ গুণী ব্যক্তির নিন্দা করে, তাহ’লে তাকে চপেটাঘাত কল্লে বোধ হয় গুরুদণ্ড হয় না?”

দিঙ্‌নাগ। “কখনই না; কখনই না। গুণী ব্যক্তির নিন্দক তার চেয়ে গুরুদণ্ডের পাত্র।”

তাল। “আর একটীমাত্র প্রশ্ন আছে। গণ্ডের উপর চপেটাঘাত বোধ হয় অসঙ্গত নয়।”

দিঙ্‌নাগ। “না! গণ্ডই চপেটাঘাতের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র।

তাল। আর আমাদের কোন বক্তব্য নাই। আপনার ব্যবস্থার যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য গ্রহণ করুন। এই বলে দিঙ্‌নাগের পদতলে একটী স্বর্ণমুদ্রা রেখে তাল, বেতাল প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ কল্লে।

তখন নিন্দকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি দিঙ্‌নাগকে বল্লে;—“আচার্য্য মহাশয়! আপনি আজ কি ব্যবস্থা দিলেন? একটু ভাব্‌লেন না, বুঝ্‌লেন না, মূল্যের লোভে যা’ তা’ একটা কথা বল্লেন।”

দিঙ্‌নাগ। “কেন হে? ব্যাপারটা কি বল ত।”

দ্বিতীয়। “ওরা বোধ হয় শুনেছে যে আমরা কালিদাসের নিন্দা কচ্চি। তাই গুণী ব্যক্তির নিন্দককে চপেটাঘাত কল্লে গুরুদণ্ড হয় না এই ব্যবস্থা নিয়ে গেল। আপনি এরূপ ব্যবস্থা দিয়ে ভাল কল্লেন না।”

দিঙ্‌নাগ। “তোমরা বিষয়ী লোক, সব বিষয় তলিয়ে বুঝ্‌তে পার; আমরা শাস্ত্রব্যবসায়ী অতটা ঘোর ফের বুঝি না। তার পর শুনেছিলুম ওরা ব্যয়ে মুক্তহস্ত। এই দেখ না সাতটা ব্যবস্থার মূল্য দ্বিরুক্তি মাত্র না করে দিয়ে গেল। তা’তেই ব্যবস্থাটা দিয়ে ফেলুম। যা’ হক ওতে কিছু ক্ষতি হবে না।”

প্রথম। "বিলক্ষণ হবে। আপনি আরও একটা অন্যায় কাজ করেছেন; বল্লেন গণ্ডই চপেটাঘাতের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র। অই হাতের চপেটা-ঘাতে যে হাড়ের উপর মাংস থাকবে না, সেটা আপনি চিন্তা কল্লেন না।"

দিঙ্‌নাগ। "তাইত! অর্ব্বাচীনের মত কাজ করেছি বটে; এখন তোমরাও সাবধান হয়ো, আমিও হ'ব।"

চতুর্থ। "মহাশয়! আপনার এখানে আর যাতায়াত চল্‌বে না। প্রাচীন বয়সে প্রেতের চপেটাঘাত সহ্য হ'বে না।"

তখন সকলেই একে একে যথাস্থানে গমন কল্লেন। দিঙ্‌নাগ স্বর্ণ-মুদ্রাটী দু'তিনবার উত্তমরূপে দেখে বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে রাখ্‌লেন।

কালিদাসের বিরুদ্ধে যে একদল লোক অভ্যুত্থান করেছে, তাঁকে অপদস্থ কর্‌বার চেষ্টায় আছে, সে কথা ক্রমে বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হ'ল। তিনি তার প্রতিবিধানের উপায় স্থির কল্লেন। কুম্ভমেলা মাসাধিককাল থাকে; তখনও পূর্ণগৌরবে চল্‌ছিল। কুম্ভমেলায় ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোক উপস্থিত হন। তিনি তাঁ'দের সম্মুখে প্রকাশ্য সভায় কালিদাসকে অভিনন্দন কত্তে সঙ্কল্প কল্লেন। এরূপ সভায় অভিনন্দিত হ'লে কালিদাসের যশ যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হ'বে তা' বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সভায় হূণযুদ্ধে বিজয়ী বীরদিগকেও সম্বর্দ্ধনা করা স্থির হ'ল। বিক্রমাদিত্যের আদেশে রাজপুরুষেরা মহাকাল মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে এক বিপুল সভাগৃহ নির্ম্মাণ কল্লেন। দারুস্তম্ভের উপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ প্রসারিত হ'ল। বিবিধ বর্ণের পতাকায় এবং পুষ্পপত্রে সভাস্থল অনুপম শোভা ধারণ কল্লে। চন্দ্রাতপ হ'তে স্বর্ণশৃঙ্খলে স্ফটিকনির্ম্মিত দীপাধার লম্বিত এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য বহুমূল্য আসন, কম্বল, গালিচা শ্রেণীর পর শ্রেণীক্রমে প্রসারিত হ'ল। রাজা উজ্জ্বল বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন কল্লেন; বামে তাঁর প্রধানা মহিষী ভানুমতী দেবী। রাজ-কুটুম্বিনীগণ নিমন্ত্রিতা সম্ভ্রান্তা মহিলাদের সঙ্গে রাজরাণীর পশ্চাতে বস্‌লেন। সিংহাসনের দক্ষিণে

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী কালিদাসকে অগ্রবর্ত্তী ক'রে এবং বামদিকে হূণযুদ্ধে বিজয়ী সৈনিকেরা তাল, বেতালকে সম্মুখে নিয়ে, আসন গ্রহণ কল্লেন। সভাসদগণ, কুম্ভমেলায় উপস্থিত নানা দেশের রাজা, রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ মনোহর বেশভূষা পরিধান ক'রে সভায় আসীন হ'লেন। এমন সভা উজ্জয়িনীতে আর কখনও হয় নাই। লোকে রাম যুধিষ্ঠিরের সভার সঙ্গে তার তুলনা কত্তে লাগ্‌ল। গৌরবে, আনন্দে উজ্জয়িনীবাসীদের হৃদয় স্ফীত হ'ল। মহাকালের পূজক তৈলঙ্গ-দেশীয় পণ্ডিতগণ একটা স্তোত্র পাঠ কল্লে সভার কার্য্য আরব্ধ হ'ল। রাজসভার ভট্টেরা সম্মিলিতকণ্ঠে এই গান ধল্লে :—

কিবা শোভা হের নয়নে।
অমর-সভা আজি মরতভুবনে ॥
যথা শচী গুণবতী
তথা দেবী ভানুমতী,
বিক্রম বাসবসম বসি রাজ-আসনে ॥
জ্ঞানে, গুণে নিরুপম
হের বৃহস্পতি সম,
কবিগুরু কালিদাস লয়ে অষ্ট রতনে ॥
বলে যেন দিক্‌পাল
নিরখ তাল, বেতাল,
বাঁধিয়া মিহিরকুলে দিলা রাজ-চরণে ॥
সম বাণী, কমলারে
কে হেন তুষিতে পারে ?
কোথা পাবে একাধারে শক্তি, ক্ষমা একসনে ॥

ভারতভুবনে আর
এ হেন সৌভাগ্য কার ?
মহাকাল সদা যাঁর অধিষ্ঠিত ভবনে ॥

শ্রোতারা একবারে মুগ্ধ হ'লেন। সভাগৃহ এমন নিস্তব্ধ হ'ল যে একটী সূচীপাত হ'লেও তা'র শব্দ শোনা যেত। রাজা বিক্রমাদিত্য তখন মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে বল্লেন :—

"পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলি! ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-প্রমুখ-পৌরজানপদবর্গ! অদ্যকার দিন উজ্জয়িনীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'ক। উজ্জয়িনী ভারতবর্ষের অন্যতম মহাতীর্থ। দেবাদিদেব মহাকালের মূর্ত্তি এখানে বিরাজিত; রাজর্ষি অশোকের নির্ম্মিত স্তূপে ভগবান্ বুদ্ধের অস্থি এখানে নিহিত। দেবতার এবং দেবাবতারের সহিত সম্বন্ধ উজ্জয়িনীকে ভারতবাসী হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তীর্থ করেছে। এক দেবানুগৃহীত পুরুষ সম্প্রতি উজ্জয়িনীকে অসম্প্রদায়িক তীর্থে পরিণত করেছেন। তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে উজ্জয়িনী দেশ, কাল, জাতি এবং ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, বাগ্দেবতার প্রত্যেক সেবকের সাধনপীঠ হয়েছে। আমি অভিজ্ঞান-শকুন্তল-রচয়িতা মহাকবি কালিদাসেরই কথা উল্লেখ কচ্চি। তাঁরই প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই সভা আহূত হয়েছে। তিনি কেবল কবি নন, অশেষ শাস্ত্রবিৎ। তাঁর গ্রন্থগুলি আলোচনা কল্লেই প্রতিপন্ন হবে যে শ্রুতি, স্মৃতি হ'তে প্রাণিতত্ত্ব, চিত্রকলা পর্য্যন্ত কত শাস্ত্রে এবং কত বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। তিনি প্রজাপতির ন্যায় অভিনব সৃষ্টি করেন, এবং ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় শিশির-বিন্দুকে মুক্তাফলে পরিণত করিয়া তুলেন। তাঁর ইঙ্গিতে চির-তুষারাবৃত হিমাদ্রিশৃঙ্গ নববসন্তের অনুপম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয়, স্বভাবরুক্ষ বেলাভূমি তমালতালী-বনরাজীর নীলিমায় নয়ন স্নিগ্ধ করে। ভাষার মাধুর্য্যে, ভাবের প্রাঞ্জলতায় চিত্তস্পর্শী উপমালঙ্কারের প্রয়োগে, স্বভাবের সৌন্দর্য্য-প্রকটনে, মানব-চিত্তবৃত্তি-পরিজ্ঞানে, এবং সর্ব্বোপরি বহির্জ্জগতের

সহিত অন্তর্জ্জগতের নিগূঢ় সম্বন্ধ-প্রদর্শনে তাঁর সমকক্ষ কবি দুর্ল্লভ। তাঁর গ্রন্থগুলির উপদেশও অতি অপূর্ব্ব। সসাগরা ধরার অধীশ্বরই হউন আর কুটীরবাসিনী ঋষিবালিকাই হউন আত্মসংযমেই প্রত্যেকের সুখ, আত্ম-সংযমেই প্রত্যেকের শান্তি। অসংযত হ'লে মনস্তাপ অনিবার্য্য। রূপজ-মোহে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা যে সংযমাভাব দেখিয়েছিলেন, তা'রই ফলে উভয়কে সুতীব্র বিচ্ছেদাগ্নিতে দগ্ধ হ'তে হয়েছিল; কিন্তু যাঁরা স্বভাবতঃ পবিত্র, কচিৎ পদস্খলনের জন্য, তাঁরা যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করেন না, তা' বোঝাবার জন্য কবি দেখিয়েছেন যে রাজদম্পতির হৃদয়ের কামজ বিকার দূরীভূত হ'লে তাঁরা পুনর্ম্মিলনে সুখী হয়েছিলেন। তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য কুমারসম্ভবে কালিদাস বুঝিয়েছেন যে রূপ, যৌবন বা ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেজন্য গিরিরাজদুহিতা উমার ন্যায় সর্ব্বত্যাগিনী হয়ে তপঃ সাধন কত্তে হয়। তাঁর কাব্য ও নাটকের বহু চরিত্র হ'তে আমরা এইরূপ উপদেশ লাভ কত্তে পারি। তপোবন হ'তে শকুন্তলার বিদায় গ্রহণকালে এবং কামদেবের হরধ্যানভঙ্গ-চেষ্টায় কবি যে দুইটি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন সৌন্দর্য্যে ও স্বাভাবিকতায় তাহাদের তুলনা নাই। কবিকল্পনার চরমোৎকর্ষ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর ন্যায় মহাকবি যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হন, সে জাতি ধন্য হয়। তিনি আমাদিগের সকলকে ধন্য করেছেন; তাই আমি ভারতভূমির বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে এই মহাসভায় সমবেত রাজা, প্রজা সকলের প্রতিনিধিরূপে আজ তাঁকে বর্ত্তমান যুগের অগ্রগণ্য কবিরূপে বরণ কচ্চি; আশা করি আপনারা সকলে আমার কার্য্য অনুমোদন কর্ব্বেন। মহাকালের প্রসাদে আমাদের সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ক।"

এক সুবেশ ভৃত্য সোণার থালায় চন্দনের বাটী আর ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজা কালিদাসের কপালে চন্দনের টিপ দিলেন, গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ ঘন ঘন সাধুবাদ ক'রে

তাঁদের আনন্দ জানালেন। কালিদাস গদ্গদ কণ্ঠে রাজাকে আর সভাস্থ ব্যক্তিগণকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কল্লেন।

এইবার হূণযুদ্ধে জয়ী বীরদের পালা এল। মিহিরকুলের অত্যাচারে রাজ্যে আর্ত্তনাদ উঠেছিল। তাল, বেতালই মিহিরকুলকে বন্দী ক'রে এনেছিলেন। এইজন্য অধিকাংশ ব্যক্তিরই ইচ্ছা ছিল, রাজা তাল, বেতালকে প্রথমে পুরস্কার দেন। কিন্তু তাঁরা এমন বিনীত, এমন উদার, ছিলেন যে, প্রধান প্রধান সেনাপতিদের পূর্ব্বে কিছুতেই পুরস্কার নিতে সম্মত হ'লেন না। সকলের পশ্চাতে গিয়ে বস্লেন। অন্যান্য সকলের পুরস্কার দেওয়া হ'লে রাজা তাল, বেতালকে সাদরে আহ্বান কল্লেন। উভয়ে করজোড়ে সিংহাসনের সাম্নে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদের দীর্ঘোন্নত বীরমূর্ত্তি দেখে সভায় আনন্দধ্বনি উঠ্ল। রাজা উভয়কে রত্নখচিত উষ্ণীষ, পরিচ্ছদ, কণ্ঠভূষণ এবং অসি, চর্ম্ম প্রদান কল্লেন; তাল, বেতাল গ্রহণ ক'রে ভূলুণ্ঠিত হয়ে রাজাকে প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন দেখে রাজা জিজ্ঞাসা কল্লেন; "তাল, বেতাল! তোমাদের কি কোন বক্তব্য আছে?"

তাল বল্লেন; - "আছে, মহারাজ! অনুমতি হলে বল্তে পারি।"

রাজা। "স্বচ্ছন্দে বল।"

তাল, বেতাল শির নত ক'রে সভাস্থ ব্যক্তিগণকে অভিবাদন কল্লেন। তাল বল্লেন; "আমাদের প্রার্থনা এই যে আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যুগে যুগে যদি রাজার নাম কত্তে হয় তবে লোকে যেন বলে বিক্রমাদিত্য; যদি কবির নাম কত্তে হয় তবে যেন বলে কালিদাস। আর যদি ভৃত্যের নাম কত্তে হয় তবে যেন বলে তাল, বেতাল।"

সমবেত জনগণে আনন্দধ্বনি কত্তে কত্তে একবাক্যে বল্লেন; "তথাস্তু" "তথাস্তু"।

সভা ভঙ্গ হ'ল।

চতুর্থ.

ছেলেধরা গঙ্গাচরণ।

এক ছিলেন পাড়াগেঁয়ে জমিদার; লোকে তাঁকে চৌধুরী মহাশয় বল্‌ত। চৌধুরী মহাশয়ের অতুল ঐশ্বর্য্য। তাঁর গোলাভরা ধান, সিন্দুক-ভরা মোহর, আর ভাণ্ডারভরা টাকা। তাঁর বাড়ীর সাম্‌নে অশ্বথ গাছে দাঁতাল হাতী, আর নদীর ঘাটে ষোল দাঁড়ের বজ্‌রা বাঁধা থাক্‌ত। তাঁর বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হত। শারদীয় পূজায় সমারোহের সীমা থাকৃত না। নাচ, গান, বাজনা, কাঙ্গালিভোজন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বিদায় সপ্তাহ ধরে হ'ত। গ্রামের লোকের বাড়ীতে সে কয়দিন হাঁড়ী চড়্‌ত না। ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে আহার কত্তেন। রোগীর জন্য পথ্য পর্য্যন্ত পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। নিকটবর্ত্তী দশখানি গ্রামের কাঙ্গাল গরীব পিঠে পায়েষ, গণ্ডা গণ্ডা কলা, মুটো মুটো নারকেলকুরো আর শর্করা পেয়ে ধন্য ধন্য বল্‌ত। এ ত গেল পার্ব্বণের কথা; প্রতিদিনের অতিথিসেবার সম্বন্ধে তাঁর বাড়ীতে এই নিয়ম ছিল যে, মধ্যাহ্নে, অন্নের রাশির উপর চৌধুরী মহাশয়ের গৃহিণী স্বহস্তে এক ভাঁড় গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দিতেন। চৌধুরী মহাশয় নিজেও সেই অন্ন খেতেন, আর অনাহূত ভিক্ষুকও সেই অন্ন খেত; কোন প্রভেদ ছিল না।

আমরা যে সময়ের কথা বল্‌চি, তখন চৌধুরী মহাশয়ের মত জমিদার বাঙ্গালা দেশে সুলভ না হ'লেও, দুর্ল্লভ ছিলেন না; এখন সত্যই দুর্ল্লভ হয়েছেন। জমিদারেরা তখন যে গ্রামে তাঁদের জন্ম, যেখানে তাঁদের

প্রজারা কপালের ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করে, সেখানে বাস কত্তেন। প্রতিবাসীদের, প্রজাদের সুখ, দুঃখ বুঝ্‌তেন। তার ফল এই হত যে জমিদার হয়ত শুন্‌লেন যে তাঁর ভিটাবাড়ীর প্রজা দীনু মোড়লের বাপের শ্রাদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াতে চায়, কিন্তু মাছের যোগাড় কত্তে পারে নি। শোন্‌বামাত্র তিনি হুকুম দিলেন, আমার বড় দীঘি থেকে, সরকারী খরচে জাল দিয়ে, প্রয়োজন মত মাছ যেন তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দীনু কৃতার্থ হ'ল। জমিদার হয়ত শুন্‌লেন যে তাঁর প্রতিবাসী নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের পুত্রটীর উপনয়নের বন্দ হয়েছে, কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অবস্থা অতি শোচনীয় বলে এত বিলম্ব হচ্চে। শুনে তিনি দেওয়ানজীকে ডেকে বল্লেন, "নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের পুত্রের উপনয়নের সমস্ত ব্যয় আমিই দেব স্থির করেছি, তুমি নারায়ণকে উদ্যোগ কত্তে বল।" দেওয়ানজী উত্তর দিলেন ; "এখনও নবাব সরকারের খাজনা দেওয়া বাকী আছে, এ সময় কোন নূতন খরচ মঞ্জুর কল্লে কিরূপে চালাব ?" জমিদার বল্লেন, "আমার দুধ ঘিয়ের খরচ মাসে কত পড়ে ?" "আজ্ঞে আড়াই শত টাকার কিছু উপর।" "দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য রেখে বাকী সকলের দুধ, ঘি এক মাস বন্ধ করে সেই টাকাটাই দিও।" দেওয়ানজী মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে বিদায় নিলেন।

পাড়ার নাপিত বৌ, যে জমিদারপত্নীকে আল্‌তা পরায় সে, হয়ত, এক দিন, তার মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়ে অন্দর মহলে উপস্থিত হল। মেয়েটীর একটী ছ'মাসের খোকাও সঙ্গে ছিল। জমিদারপত্নী দেখে বল্লেন ; "তোর মেয়ের ত দিব্বি খোকাটী হয়েছে, আমার ছোট বৌমার খোকাটী বেঁচে থাক্‌লে ঠিক এমনি হতো। দে আমার কোলে দে।" এই বলে খোকাটীকে কোলে নিয়ে বল্লেন ; "এমন খোকা হয়েছে, একখানি গয়না দিস্‌নে ?" নাপিত বৌ বল্লে ; "আমরা পেট ভরে খেতে পাইনা মা! কোথা থেকে গয়না দেব ?" "বটে ?" এই বলে জমিদার-

পত্নী আপনার পেটরা খুলে তাঁর পুরাণ, ভাঙ্গা গুটিকত মুড়্কি মাছলি* বার করে বল্লেন; "এই নিয়ে যা; এতে তোর নাতির বালা, বাজু দুই হ'বে। গয়না পরিয়ে একদিন আমায় এনে দেখাস্।" নাপিত বৌ আর তার মেয়ে, আহ্লাদে গদগদ হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্ল। জানিনা সমাজের কোন পাপে বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালীর উপজীব্য এই শ্রেণীর জমিদার বাঙ্গালাদেশ হ'তে অদৃশ্য হ'তে বসেছেন।

উপরে যে সকল উদাহরণ দিলুম চৌধুরী মহাশয়ের আর তাঁর গৃহিণীর কার্য্যে তা' সর্ব্বদাই লক্ষিত হ'ত। কিন্তু তবুও তাঁদিগকে মাঝে মাঝে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও চোকের জল ফেল্তে দেখা যেত।

এর কারণ ছিল এই যে, চৌধুরী মহাশয়ের বয়স চল্লিশ পার হয়েছিল, তবু তাঁর সন্তান জন্মেনি। কর্ত্তা, গৃহিণী উভয়েই সে জন্যে কত ব্রত, কত উপবাস, কত তীর্থভ্রমণ করেছিলেন; কত দেবালয়ে, পীরের দর্গায় মানৎ করেছিলেন কিন্তু ফল হয় নি। গুরু, পুরুৎ থেকে বাড়ীর চাকর, চাকরাণী পর্য্যন্ত যে যা বলেছে তা' তাঁরা করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না দেখে সন্তান সম্বন্ধে তাঁরা নিরাশ হয়েছিলেন। দু'জনে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাক্তেন, কোন কাজে তাঁদের স্ফূর্ত্তি হ'ত না। তাঁদের আত্মীয়, স্বজন, প্রজা সকলেরই মনে ক্লেশ ছিল। এত ধন, দৌলৎ কে ভোগ কর্ব্বে, এমন সাধুপুরুষের নাম লোপ পাবে, লোকের এই একটা ভাবনা হয়েছিল।

চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অনেক সাধু, সন্ন্যাসীর সমাগম হ'ত। একদিন এক নুতন ধরণের সাধু এলেন। এঁর চেহারা, বেশভুষা সাধারণ সন্ন্যাসী হ'তে ভিন্ন। মাথায় জটা নাই, গায়ে ভস্ম নাই, কোমরে বাঘছাল নাই। এঁর সর্ব্ব শরীরে শ্বেতচন্দন মাখা, পরিধান অমল ধবল

* এক সময় গৃহিণীদের বড় আদরের গহনা ছিল। পল্লীসমাজে এখনও ইহার প্রচলন আছে।

গরদ, কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, কাণে শাঁকের কুণ্ডল, হাতে শাঁকের বালা। দাড়ী, গোঁপ মাথা কামান। স্বাভাবিক বর্ণের আর বেশভূষার গুণে যেন ধপ্ ধপ্ কচ্চেন। তাঁর মুখে সর্ব্বদা গঙ্গার স্তব; গঙ্গাজল ভিন্ন তিনি অপর জল পান করেন না। তিনি চৌধুরী মহাশয়কে বল্লেন; "আমি গঙ্গাপুত্র; মা পতিতপাবনী গঙ্গা আমার উপাস্য দেবতা। কলিযুগে একমাত্র তিনিই ভক্তের নয়নগোচর হন; তাঁর উপাসনা ভিন্ন কলিতে জীবের মুক্তির উপায় নাই। আমি গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে কপিলমুনির আশ্রমে থাকি। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করব বলে এদেশে এসেছিলুম; তোমাদের প্রশংসা শুনে দেখতে এসেছি।"

চৌধুরী মহাশয় আর তাঁর সহধর্ম্মিণী ভক্তির সঙ্গে তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হ'লেন।

সাধু চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে কয়দিন অবস্থিতি কল্লেন। তাঁর সঙ্গে শ্বেত পাথরের মকরবাহন গঙ্গামূর্ত্তি ছিল, তিনি প্রতিদিন সেইটী পুজা কত্তেন। একদিন সন্ধ্যার আরতি শেষ হ'লে তিনি সস্ত্রীক চৌধুরী মহাশয়কে ডেকে বল্লেন; "কাল প্রাতে আমি অন্যত্র যাব। তোমাদের সেবায় আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছি; তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে যেতে চাই। এখন তোমরা আমায় বল দেখি, তোমরা এমন মলিন স্ফূর্ত্তিহীন হয়ে থাক কেন? তোমাদের ত কিছুরই অভাব নাই।"

চৌধুরী মহাশয় বল্লেন, "প্রভো! সকল থেকেও আমাদের কিছুই নাই। যখন ভাবি আমার মৃত্যুর পর এ বংশের নাম লোপ পাবে, তখন আমাদের বুক ফেটে যায়। আমাদের কষ্ট দূর কর্ব্বার কি কোন উপায় নাই?"

সাধু। "উপায় আছে, কিন্তু বড় কঠিন ব্রত পালন কত্তে হবে। তোমরা উভয়ে যদি সে ব্রত পালন কত্তে সম্মত হও, এক বৎসরের মধ্যে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হবে।"

দু'জনেই ব্যগ্র হয়ে একসঙ্গে বল্লেন; "কি ব্রত আপনি বলুন; যতই কঠিন হ'ক, আমরা পালন কর্‌ব।"

সাধু৷ "ব্রত এই যে তোমরা গঙ্গাদেবীর কাছে মানৎ কর যে, যদি তোমাদের একাধিক পুত্র হয়, প্রথম পুত্রটীকে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ভাসিয়ে দেবে। একাধিক পুত্র না জন্মিলে দিতে হ'বে না।"

চৌধুরী মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে চাইলেন। উভয়েরই মনে হ'ল, একাধিক পুত্র না হ'লে ত দিতে হবে না। আজও যখন সন্তান হ'ল না, একাধিক পুত্র আর কবে হবে? আর মা গঙ্গার কৃপায় যদি একাধিক পুত্রই জন্মে, একটী না হয় তাঁকে দেব। রোগে, বজ্রাঘাতে, সর্পদংশনে কত ছেলে ত মারা যায়, একটী যদি মা গঙ্গার কোলেই যায় তা'তে ক্ষতি কি? বাকীগুলি ত থাকবে, বংশলোপ ত হ'বে না। উভয়েই মনে মনে এইরূপ বিচার করে বল্লেন; "আমরা উভয়েই মানৎ কল্লুম, মা গঙ্গার কৃপায় যদি আমাদের একাধিক পুত্র জন্মে, বড়টীকে তাঁর কোলে দেব।"

সাধু আমলকীর মত একটী ফল চৌধুরী মহাশয়ের হাতে দিয়ে বল্লেন; "আগামী শুক্লত্রয়োদশীতে এই ফলটী গঙ্গাজল দিয়ে বেটে দু'জনেই খেও। প্রথম পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত গঙ্গাজল ভিন্ন অপর জল পান করো না। সর্ব্বদা গঙ্গার মূর্ত্তি ধ্যান কর্‌বে, গঙ্গার বন্দনা কর্‌বে। এক বৎসরের মধ্যে তোমাদের পুত্র হবে।"

উভয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে সাধুকে প্রণাম কল্লেন। সাধু পরদিন প্রাতে কোথায় চলে গেলেন। শুক্লত্রয়োদশীতে উভয়েই সাধুর উপদেশ মত ফলটী খেলেন; তার দু'মাসের মধ্যেই চৌধুরী-গৃহিণীর গর্ভসঞ্চার হ'ল। আত্মীয়, স্বজন, প্রজাসকলেই এই সংবাদে সুখী হ'লেন। গঙ্গাসাগরে পুত্র ভাসানর রীতি তখন দেশে খুবই প্রচলিত ছিল; সুতরাং চৌধুরী মহাশয় যে একটা কিছু অস্বাভাবিক কাজ করেছেন, কেউ তা' মনেকল্লে না।

এক বৎসর পূর্ণ না হ'তেই সাধুর বাক্য সফল হ'ল ; চৌধুরী-গৃহিণী একটী সুন্দর সবল পুত্র প্রসব কল্লেন। আনন্দে কর্ত্তা গৃহিণী উভয়েই পণের কথা ভুলে গেলেন। আর একটী না হ'লে ত এটীকে ভাসাতে হ'বে না ; সুতরাং ভাবনার বিষয়ও কিছু ছিল না। ছেলের আটকৌড়ে হ'তে অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত সকল কাজেই চৌধুরী মহাশয় মুক্তহস্তে ব্যয় কল্লেন। মা গঙ্গার কৃপায় জন্মেছিল আর মা গঙ্গার চরণে তা'কে দিতে হ'বে বলে ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় গঙ্গাচরণ নাম রাখা হ'ল। গঙ্গাচরণ শুক্লপক্ষের চাঁদের মত দিন দিন বাড়্‌তে লাগল।

তার পর তিন বৎসর গত না হ'তেই চৌধুরী মহাশয়ের আর একটী পুত্র জন্মিল। এইবার মা বাপের মনে একটা বিষাদের ছায়া পড়্‌ল ; বড়টীকে তবে ত নিশ্চিত ভাসাতে হ'বে। আহা সে কি ছেলে! যেন বৃন্দাবনের নন্দদুলাল! রঙটা উজ্জ্বল গৌর নয় বটে ; কিন্তু কি চোক, কি নাক, কি গড়ন! মাথায় রেশমের গোছার মত কি সুন্দর কোঁকড়া চুল! গায়ে কি জোর! তা'কে দোল্‌নায় শুইয়ে রাখা যায় না ; ঘুম ভাঙ্গ্‌লেই সে দোল্‌না থেকে লাফিয়ে পড়ে, অন্দর মহলের সিঁড়ী দিয়ে এমন তর্ তর্ করে নীচে নামে যে চাকর চাকরাণীরা তাকে ধর্‌তে পারে না। এই ছেলেকে জলে ভাসিয়ে দিতে কোন্ মা বাপের প্রাণ না কাঁদে? তাঁরা ভাব্‌তেন কত বয়সে ভাসিয়ে দিতে হবে সে সম্বন্ধে সাধু ত কিছু বলেন নি। তবে তাড়াতাড়ি কি? হ'ক্‌না একটু বয়স, তা'কে নিয়ে সাধ, আহ্লাদ করি ; তারপর যা' হ'বার তাই হবে। দেবতার সঙ্গে পণ, তার কি অন্যথা করা চল্‌বে? সময় হ'লে ভাসাতেই হবে।

গঙ্গাচরণের বয়স আট বৎসর হল। কিন্তু তাকে দেখ্‌লে মনে হত যেন বার বছরের ছেলে। তার যেমন গায়ে জোর, মাথায় তেমনি বুদ্ধি। সে কালের বড় বড় জমিদার, তালুকদারদের বাড়ীতে ঢাল, তলোয়ার, তীর ধনুক, বর্শা থাকৃত ; অবাধ্য প্রজা শাসনের জন্য, চোর, ডাকাত

তাড়াবার জন্যে হিন্দুস্থানী চোবে, তেওয়ারী, বাঙ্গালী বাগ্দী, গৌড়গয়লা, পরদেশী হাবসী, পাঠান দরোয়ান থাকৃত। এক এক জন জমিদারের কাছারিতে পঞ্চাশ ষাট আর তেমন বড় জমিদার হলে দু'চারশ' ঢালি পদাতিক দেখা যেত। নদীতে চর পড়্লে জমিদারেরা মোকদ্দমা করে দখল নিতেন না; যার লাঠির জোর বেশী তিনি দখল কর্তেন। তা'তে মাথা ফাটাফাটি, রক্তারক্তি ত হ'তই, দু'চারটা খুন জখমও হ'ত। অনেক জমিদার নিজেরাই ঢাল, তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াতেন; উভয় পক্ষের প্রজারাও দাঙ্গায় যোগ দিত। চৌধুরী মহাশয় শান্তিপ্রিয় হ'লেও দেশ কালের রীতি অনুসারে ঢালী, পাইক, দরোয়ান রাখ্তে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরও দেউড়ীতে সারি সারি ঢাল, তলোয়ার, মোটা মোটা শালকাঠের মুগুর সাজান থাক্ত। অপরাহ্নে চোবে তেওয়ারী ঠাকুরেরা বাড়ীর সম্মুখে বসে তাল তাল সিদ্ধি ঘুঁট্তেন, ঘুঁটের পোড়ে বড় বড় আটার লিট্টি তৈয়ার কত্তেন। পঞ্জাবী দরোয়ান কর্ত্তার সিং, মর্দ্দানা সিং গ্রন্থ সাহেব থেকে নানকজীর উপদেশ সকলকে পাঠ করে শোনাত। গঙ্গাচরণ পিতার দরোয়ান পাইকদের বড় প্রিয়পাত্র ছিল। তার চালচলন বাঙ্গালীর মত না হয়ে পশ্চিমে লোকেরই মত হয়েছিল। সে ডন ফেল্ত, বৈঠক কর্ত, লাঠী ঘোরাত, তলোয়ার ভাঁজ্তে শিখ্ত। দশ বছর বয়সে সে কুস্তির দাও প্যাচ এমন শিখেছিল যে, আখ্ড়ার মাটী মেখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে, গ্রামের পনর বছরের ছেলেও তার সঙ্গে লড়্তে সাহস কর্ত্তো না। গঙ্গাচরণের আর এক গুণ ছিল, সাঁতারে কেউ তার সঙ্গে পেরে উঠ্ত না। জলে পড়্লে সে উঠ্তে চাইত না। পুকুরে সাঁতার দিয়ে তার তৃপ্তি হ'ত না; সে বাপ মার অজ্ঞাতে নদীতে সাঁতার দিতে যেত, নদীর ঢেউএ বুক পেতে দিতে তার বড় আমোদ হ'ত; নদীতে কুমীর আছে বল্লেও সে জল ছেড়ে উঠ্ত না।

লেখাপড়াতেও গঙ্গাচরণের সমবয়স্ক কেউ তার সমতুল্য ছিল না। তার

যেমন স্মরণশক্তি তেমনি বুদ্ধি ছিল। তখন এ কালের মত লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না। সাধারণ হিসাব, রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী আর চাণক্য শ্লোক এইগুলি শিখ্‌লেই লেখাপড়ার চূড়ান্ত হ'ত। চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে এক গুরুমহাশয় ছিলেন। তিনি গঙ্গাচরণ, তার ছোট ভাই আর চৌধুরী মহাশয়ের আত্মীয় কর্ম্মচারীদের দু'টী একটী ছেলেকে নিয়ে সকাল, বিকাল চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা জাঁকিয়ে বস্‌তেন। তাঁর প্রতি চৌধুরী মহাশয়ের গৃহিণীর আদেশ ছিল যে, তিনি গঙ্গাচরণের গায়ে কখনও হাত তুল্‌বেন না। যখন তা'কে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়াই স্থির আছে তখন লেখাপড়ার জন্য তা'কে পীড়াপীড়ির প্রয়োজন কি? সে নিজে ইচ্ছা করে যা' শিখ্‌তে চায় তাই শিখুক। বাস্তবিকও পীড়াপীড়ির প্রয়োজন ছিল না। গঙ্গাচরণ দশবৎসরেই সেরকষা, মণকষা, কাঠাকালি, বিঘাকালি, মাস মাইনে, বৎসরমাইনে সব শিখেছিল। রামায়ণ, মহাভারত, চাণক্যশ্লোক অনর্গল বল্‌তে পার্‌তো। জমিদারের ছেলের আর অধিক শেখার প্রয়োজন কি? সে ত মুহুরী হবেনা, যে চিঠির খসড়া তৈয়ার কর্‌বে; নায়েবও হবেনা যে, জমা ওয়াশিল বাকী বা অন্য কূট-কচালে হিসাব শিখ্‌বে। আর একটা বিষয়ে সে অদ্বিতীয় হয়েছিল। গঙ্গার স্তব যা' কিছু প্রচলিত আছে, বাল্মীকি, কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য কৃত স্তব হতে "বন্দে মাতাসুরধুনি" পর্য্যন্ত গঙ্গার ধ্যান, বন্দনা সব সে কণ্ঠস্থ করেছিল। সে যখন চক্ষু মুদে, হাতজোড় করে গঙ্গার স্তব পাঠ কর্‌ত, তখন চৌধুরী মহাশয় আর তাঁর গৃহিণী শুনে মুগ্ধ হ'তেন। গঙ্গার প্রতি তার ভক্তি আর সাঁতারে তার দক্ষতা দেখে উভয়েই ভাব্‌তেন, যদি মা গঙ্গার দয়া হয়, ভাসিয়ে দিলে সে বেঁচে উঠ্‌লেও উঠ্‌তে পারে।

গঙ্গাচরণ এগার বছরে পা দিলে গৃহিণীর সাধ হল তার বিবাহ দেবেন। একটী পাঁচ ছ'বৎসরের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলে দু'টীতে খেলা কর্‌বে, হাত ধরাধরি করে বেড়াবে, তিনি তা'দের কৃষ্ণরাধিকার মত সাজিয়ে দেবেন,

কোন্ মায়ের মনে এ সাধ না হয়? ভাসিয়ে দেবার ত কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই তবে তিনি এ সুখে বঞ্চিত থাক্‌বেন কেন? তিনি ভিতরে ভিতরে ভাল মেয়ের অনুসন্ধান কত্তে লাগ্‌লেন; চৌধুরী মহাশয়কে কিছু জান্‌তে দিলেন না।

মেয়ের বাজার চিরদিনই সস্তা। গঙ্গাচরণের পরিণাম কি হ'বে জেনেও অনেক মা, বাপ চৌধুরী মহাশয়ের নাম যশ ও ঐশ্বর্য্যের খাতিরে তা'কে কন্যাদানে সম্মত হ'লেন। কিন্তু মেয়েটীও ভাল হবে, নামজাদা ঘর হবে, এমন সম্বন্ধ ত হঠাৎ মেলে না; কাজেই একটু বিলম্ব হ'ল। শেষে তাও জুটল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দুর্ল্লভ রাম বসু তাঁর কন্যা দিতে রাজী হ'লেন। দুর্ল্লভ রাম একজন বড় কুলীন; তাঁর নাম ডাকও খুব প্রবল। তালুক, মুলুক ছিল, পাইক, পেয়াদা ছিল; চৌধুরী মহাশয়ের সমতুল্য না হ'ন, তাঁর বৈবাহিক হ'বার অযোগ্য ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী অনেক দিন গত হয়েছিলেন, একটী মাত্র কন্যা ছিল; কন্যাটী পরম সুন্দরী। সুতরাং গৃহিণীর এখানেই মত হ'ল। মত হ'বার একটা বিশেষ কারণও ছিল। দুর্ল্লভ রাম একজন প্রসিদ্ধ দাঙ্গাবাজ। যেমন তাঁর গায়ে জোর, তেমনি তাঁর সাহস। তলোয়ার ভাঁজ্‌তে, সড়্‌কী চালাতে তাঁর মত দক্ষ বাঙ্গালী বড় দেখা যেত না। জমিদারে জমিদারে দাঙ্গা হ'লে দুর্ল্লভ রাম যে পক্ষে থাক্‌তেন, তাঁর জয় নিশ্চিত হত। এই জন্য সকলেই তাঁকে ভয় করে চল্‌তেন। তাঁর দাঙ্গাবাজীটা অর্থলোভে নয়, নিজের বীরত্ব দেখাবারই জন্য। সাধারণতঃ তিনি দুর্ব্বলের পক্ষই নিতেন। বিশেষতঃ যদি তিনি শুন্‌তেন কেউ ভোজপুরে লাঠিয়াল, কি পঞ্জাবী তলোয়ারিয়া এনেছে, তাহ'লে তিনি নিশ্চিত অপর পক্ষে থাক্‌তেন। বাঙ্গালী কারুর চেয়ে যে বলে বা অস্ত্রকৌশলে নিকৃষ্ট নয় এইটা দেখাবার জন্যই তিনি দাঙ্গায় যোগ দিতেন। লোহার জামা পরে, অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে, যখন তিনি হুঙ্কার দিয়ে

গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন হিন্দুরা মনে কর্ত্তেন, দ্বিতীয় ভীম, আর মুসলমানেরা ভাব্তেন, দ্বিতীয় রোস্তম আবার এসেছেন। গঙ্গ চরণকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হবে শুনেও দুর্ল্লভরাম মেয়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। তা'র কারণ এই ছিল যে, গঙ্গাচরণকে দেখে তাঁর বড় পছন্দ হয়েছিল। তিনি বল্তেন, "অই একটা পুরুষ-বাচ্ছা বটে।" গঙ্গাচরণের আর তাঁর কন্যার কোষ্ঠী মিলিয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে উভয়েই দীর্ঘকাল পুত্রপৌত্র নিয়ে সংসার কর্ব্বে। অকালমৃত্যু বা বৈধব্য দোষ কারুরি নাই। গঙ্গাচরণের পরিণাম সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বল্লে তিনি উত্তর দিতেন;—"আগে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'ক, তার পর দেখ্ব কার ঘাড়ে কটা মাথা, আমার জামাইকে গঙ্গাসাগরে ভাসিয়ে দেয়।" মেয়ের রূপ, মেয়ের বাপের কুল, সকলের চেয়ে এই কথাটাই গৃহিনীর মনে বেশী লেগেছিল। তিনি দাসীর হাতে লাল ঢাকাই সাড়ী আর সোণার কণ্ঠমালা দিয়ে বলে পাঠালেন, "এই মেয়েকেই আমি বউ কল্লুম; কর্ত্তার মত আমি যেমন করে পারি কর্‌বই।"

সংবাদটা ক্রমে চৌধুরী মহাশয়ের কাণে পঁহুছিল। তিনি গৃহিনীকে ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন; "এ সব কি শুন্‌চি? তুমি নাকি গঙ্গাচরণের সঙ্গে সোনাইএর দুর্ল্লভরাম বসুর কন্যার বিবাহ দেবে বলে কথা দিয়েছ?"

গৃহিণী। "হাঁ দিয়েছি। দুর্ল্লভরাম কি তোমার বেহাই হ'বার অযোগ্য? তার মত কুলীন ঐ দেশে কে আছে? মেয়েটী যেন লক্ষ্মী; তবে অমতের কারণ কি?"

চৌধুরী। "অমতের কারণ ত ও সকল নয়। তুমিত সকলই জানো। গঙ্গাচরণকে যে বিসর্জ্জন দিতে হবে। সে কথা কি ভুলে গিয়েছ?"

গৃহিনী। না ভুলি নাই। গঙ্গাচরণের এই সবে দশ বৎসর গত হয়েছে; বিসর্জ্জনের বয়স যখন নির্দ্দিষ্ট নাই তখন এরি মধ্যে সে কথা কেন? দু চার বৎসর যাক্‌না; তাকে নিয়ে মা বাপের মনে যে সকল

সাধ হয় তা' মিটাই। কৃষ্ণ রাধিকার মত দু'টীতে খেলা কর্‌বে, তোমার কি দেখ্‌তে সাধ হয় না?"

চৌধুরী। সাধ খুবই হয়; কিন্তু বুকে যে শেল বিঁধে রয়েছে; চল্‌তে ফির্‌তে সকল সময়েই বাজে। মেয়েটীর পরিণাম কি হবে একবার ভেবে দেখ দেখি। কচি মেয়ে, হাতের শাঁখা খুলে, একাদশী কর্‌বে কেমন করে দেখ্‌ব?"

বল্‌তে বল্‌তে চৌধুরী মহাশয়ের যেন কণ্ঠরোধ হ'ল। গৃহিণী বল্লেন;— "আগে হ'তে ও সকল অমঙ্গলের কথা তোল কেন? কিসে কি হয় তা' কি কেউ বল্‌তে পারে? সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি আসেন, আমি তাঁর পায়ে ধরে গঙ্গাচরণের প্রাণ ভিক্ষা চাইব; না হয় তা'র বদলে নিজে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, তা' হ'লেইত হ'ল।"

চৌধুরী। "দেখ, তুমি ও রকম বল্লে আমার কিছু জবাব দেবার থাকে না। কিন্তু এই জেনো, বিধবা মেয়ে, বিধবা বউ ঘরে থাকার কত্তে আর দুর্ভাগ্য নাই।"

গৃহিণী। আমি স্ত্রীলোক, আমি তোমায় কি বুঝোবো? তবু দু' একটা কথা বলি শোনো। গঙ্গাচরণের অদৃষ্টে না হয় একটা ফাঁড়া আছে, আর সে ফাঁড়া আমরা জানি বলে এই সকল কথা বল্‌চি। কিন্তু অনেক ছেলের ফাঁড়া ত জানা থাকে না; না জেনে তাদের মা বাপ তাদের বিয়ে দেয়; তার পর কেউ রোগে, কেউ জলে, কেউ আগুণে এক্‌টা না এক্‌টাতে মারা যায়। কিন্তু কবে কি ঘট্‌তে পারে এই ভেবে কি লোকে চুপ করে থাকে? তুমি না হয় মনে কর না যে গঙ্গচরণের ফাঁড়াটা আমাদের জানা নাই। মেয়ের কপালে দুঃখ থাকে, সে ভুগ্‌বে; মেয়ের গুণ থাকে সে স্বামীর অমঙ্গল হ'তে দেবে না। সাবিত্রী তাঁর মরা পতিকে বাঁচিয়েছিলেন স্বয়ং ব্যাসদেব ত একথা লিখে গিয়েছেন। আর এই মেয়েটীর মত সুলক্ষণা মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। নিজের

মুখে বল্‌তে নাই, আমার চেয়েও তার গ্রহের জোর বেশী। আমি তার কোষ্ঠী গণিয়ে জেনেছি, বৈধব্য দোষ ত নাই, সে বহু পুত্রের জননী হবে; আর তার স্বামী রাজপদ পাবে। ভিন্ন ভিন্ন তিন স্থানের জ্যোতির্ষী এক-বাক্যে এই কথা বলেছেন। এখন তুমি কি বল? শাস্ত্রটা কি উড়িয়ে দিতে চাও?"

চৌধুরী মহাশয় গৃহিণীর বাক্‌-পটুতায় বিস্মিত হ'লেন। কন্যাটীর বৈধব্য-দোষ নাই এই কথাটা তাঁর মনে খুব লাগ্‌ল। তিনি জিজ্ঞাসা কল্লেন; "মেয়েটীর বয়স কত?"

গৃহিণী। "এই সাত বৎসর। দুটীতে রাম সীতার মত মানাবে।"

চৌধুরী। "তুমি কি মেয়েটীকে দেখছ?"

গৃহিণী। "হাঁ! দেখেছি আমার বাপের বাড়ির কাছেই তার মামার বাড়ী। এবার আমার ছোট ভাইএর বিয়ের সময় যখন বাপের বাড়ী গিয়ে-ছিলুম, তখন মেয়েটী মামার বাড়ীতে এসেছিল। সেই সময় দেখি। যেমন রূপ তেম্‌নি গুণ, এমন শান্ত, এমন সাদাসিদে যে তোমায় কি বল্‌ব! আমার দেখেই ইচ্ছে হ'ল, তাকে কোলে তুলে ঘরে নিয়ে আসি। তুমিও তাকে দেখ্‌লে না ভাল বেসে থাক্‌তে পার্ব্বেনা।"

চৌধুরী। "দুর্ল্লভরাম কি মেয়ে দিতে রাজী হয়েছে? সে কি গঙ্গাচরণের সম্বন্ধে সকল কথা জানে? শেষে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবে না ত?"

গৃহিণী। "না না! সে তেমন লোক নয়। তার যে কথা সেই কাজ। সে সবই খবর নিয়েছে। দুজনার কোষ্ঠী মিলিয়েছে; লুকিয়ে গঙ্গাচরণকে দেখে পর্য্যন্ত গিয়েছে; তার বড় পছন্দ হয়েছে। সে বলে, "যে পুরুষ বাচ্ছার চেহারাত এই রকমই হওয়া চাই। টুক্‌টুকে ঠোঁট, ননীর মত হাত, পা মেয়ে মানুষেরই শোভা পায়। আমার জামাই আমার মত হ'বে; নদীর এপার থেকে হাঁক দেবে, ও পার থেকে শোনা যাবে। যখন ঢাল, তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াবে, এক শ' লোক কাছে ঘেঁস্‌তে পার্ব্বেনা।"

চৌধুরী। "সে নিজে যেমন তারই মত কথা বলেছে। কিন্তু ও সব কথায় ত কাজ হবে না। গঙ্গাচরণের ফাঁড়াটা কাটে এমন কিছু উপায় করতে পারে ত বুঝি।"

গৃহিণী। "সে সম্বন্ধে সে একটা কথা বলেছে।"

চৌধুরী। "কি বলেছে?"

গৃহিণী। "সে বলেছে; 'আগে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'ক, তার পর দেখ্‌ব কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, আমার জামাইকে জলে ভাসিয়ে দেয়'।

এইবার চৌধুরী মহাশয়ের মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি বল্লেন; "লোকটার অনেকগুণ; চালাকি, ধড়িবাজী কারে বলে জানে না, কিন্তু গোঁয়ারের একশেষ। দেবতার সঙ্গে পণ, এমন কথা বল্‌তে আছে! যা'হক যখন তুমি মত দিয়েছ আর কথাটা এত দূর এগিয়েছে, তখন বিবাহ দেওয়াই স্থির! আমি পুরুত মহাশয়কে নিয়ে মেয়েটীকে আশীর্ব্বাদের জন্য একটা দিন স্থির করি। দেওয়ানজীকেও ডেকে পাঠাই; দু পাঁচ হাজারে ত হবে না, কেবল সামাজিক দিতেই কমবেশ বিশ হাজার পড়্‌বে। রূপার থালা, বাটী আর এক একখানা ঢাকাই সাড়ী না দিলে চল্‌বে না।"

সে দিন চৌধুরী গৃহিণীর রাত্রিতে বেশ সুনিদ্রা হ'ল।

গঙ্গাচরণের বিবাহ দেওয়া স্থির; বর কন্যা উভয়েরই আশীর্ব্বাদ, আত্মীয়-কুটুম্ব-ভোজন হ'য়ে গিয়েছে। উদ্যোগ, আয়োজন ভাল রকমই চলেছে। চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে নূতন কলি ফিরান, বজরায় নূতন রঙ হয়েছে। ঢাকা মুর্শিদাবাদের কাপড় ও বাসনের দোকানদারেরা, নৌকা করে এসে, জিনিষের নমুনা দেখাচ্চে। গোয়ালারা, দধি ও পাত-ক্ষীরের বায়না পেয়ে, গ্রামে গ্রামে দুধের দাদন দেবার জন্য বেরিয়েছে। চৌধুরী মহাশয়ের পুরোহিত ঠাকুর স্নানাহার কর্ত্তে সময় পান না। নিম-অধ্যাপকেরা, অধ্যাপক-শ্রেণীতে ওটবার জন্য, চতুষ্পাটীর কৃতবিদ্য ছাত্রেরা,

নিম অধ্যাপক-শ্রেণীভ গণিত হবার জন্য, তাঁর বাড়ীতে ধর্ণা দিয়ে বসেছেন। বিবাহের দিন অতি নিকটবর্ত্তী। হঠাৎ চৌধুরীমহাশয় শুনলেন, "দুর্ল্লভরাম তাঁর মেয়েটীকে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়েছেন। কিছু দিন আগে একটা বড় দাঙ্গায় অনেক গুলো খুন, জখম হয়েছিল। লোকে বলে, দুর্ল্লভরাম একা তিনটা খুন আর পাঁচটা নিম খুন করেছিলেন। তারি মধ্যে সাজ্‌দাবাদের জমিদার মীর সাহেবের এক পুত্র ছিল। মীর সাহেব ঢাকার ফৌজদারের বেহাই, ফৌজদারেরই জামাতা আহত হয়েছিলেন। মীর সাহেব ফৌজদারকে সমস্ত কথা জানিয়ে বলেছিলেন, "দুর্ল্লভরাম অতি দুর্দ্দান্ত, তা'কে শাসন না কল্লে হিন্দুরা মুসলমানকে ভয় কর্ব্বেনা।" শুনে ফৌজদার দুর্ল্লভরামকে ধর্‌বার জন্য জরুরি আদেশ দিয়েছিলেন। জল-পথে, স্থল-পথে দু'দল সিপাহী দুর্ল্লভরামকে ধরবার জন্য বেরিয়েছিল। দুর্ল্লভরাম শুনে ভেবেছিলেন, তারা আস্‌তে আস্‌তে মেয়েটীর বিবাহ হয়ে যাবে, তিনি নিশ্চিন্ত মনে কোথাও চলে যাবেন। কিন্তু তা হ'ল না। সিপাহীরা এক জোয়ারের পথ মাত্র দূরে আছে খবর পেয়ে দুর্ল্লভরাম বিশ দাঁড়ের এক নৌকায় আপনার অস্ত্র শস্ত্র, নগদ টাকা কড়ি, আর মেয়েটীর বিবাহের বস্ত্র অলঙ্কার, যতদূর পাল্লেন, নিয়ে রাতারাতি চলে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁর বাড়ী, ঘর সব পড়ে রইল।

এই সংবাদে কেবল চৌধুরী-পরিবারের মধ্যে নয়, সমস্ত গ্রামেই একটা দুঃখের ঝড় বইল। নাচ, গান, ভোজের কত আয়োজনই হচ্ছিল, সব ব্যর্থ হল। চৌধুরী গৃহিণীর মনস্তাপের সীমা রইল না; অমন মেয়ে ত আর পাওয়া যাবেনা। তিনি মনের দুঃখে শয্যাশায়িনী হ'লেন। লোকে বল্লে, "ছেলেটা কি হতভাগাগো! দু'দিন পরে গঙ্গার জলেত যাবেই; মা, বাপ তাকে নিয়ে একটু আমোদ, আহ্লাদ কত্তে চাচ্ছিলেন তাও হ'লনা। আর তার বের কথা তুলে কাজনেই"। সকলেরই সেই মত হল, গঙ্গাচরণের বিয়ে হ'লনা।

গঙ্গাচরণ ক্রমে বার বৎসরে পড়্‌ল। বয়সের সঙ্গে তার রূপ, গুণ বাড়্‌তে লাগ্‌ল। কি চেহারা! যেন লোহার ভীম! হাতের তাগ অব্যর্থ; তীর কি গাঁটুল ছুঁড়্‌লে উড়ো পাখী পড়্‌বেই পড়্‌বে। ষড়্‌কীতে ভাসা মাছ বিঁধ্‌বেই বিঁধ্‌বে। আধমণ মুগুর সে অনায়াসে ভাঁজে; পঁচিশ হাত তফাৎ হ'তে ষড়্‌কী ছুঁড়ে লক্ষ্যবেদ করে। চৌধুরী মহাশয়ের এক পাঞ্জাবী দারোয়ান ছিল; সে বল্‌ত, তাদের দেশেও এমন ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। শুনে চৌধুরী মহাশয়ের মনে সুখ হ'তনা; তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়্‌ত। কিন্তু গঙ্গাচরণের বল, বীর্য্য গ্রামের লোকের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। গঙ্গাচরণ গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা দল বেঁধেছিল। নিজে পাঠশালায় যেত না, তাদেরও যেতে দিতনা। নদীতে নৌকা চালান, হাঁস ধরা, সাঁতার দেওয়া এই তার কাজ ছিল। কখনও কখনও দু'পক্ষ হয়ে নূতন চর দখল খেলা হ'ত। খেলায় অধিকাংশ স্থলে গঙ্গাচরণের দলই জয়ী হ'ত; অপর দলের ছেলেরা রক্তাক্ত হয়ে মা বাপকে গিয়ে জানাত। গ্রামের জমিদারের ছেলে জেনে কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌তনা, কিন্তু অনেকেই মনে মনে ভাব্‌ত, চৌধুরী মহাশয় ওটাকে ভাসিয়ে দিলেইত আপদ যায়; গ্রামটা জুড়ায়।

গঙ্গাচরণের সাহস অসাধারণ ছিল। মৃত্যুভয় কাকে বলে সে জান্‌ত না। চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর সাম্‌নে একটা ছোট তাল গাছে কাকের বাচ্ছা হয়েছিল। একটা কেউটে সাপ বাচ্ছা খাবে বলে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠ্‌ছিল। গঙ্গাচরণ দেখবামাত্র গাছে উঠতে আরম্ভ কল্লে এবং সাপের সঙ্গে সঙ্গেই গাছের মাথায় চড়ে সাপের ফণাটা মুটো করে ধরে ফেল্লে। সাপ কামড়াতে না পেরে তার হাতটা জড়িয়ে কষতে আরম্ভ কল্লে। সাপের কষুনি বড় সামান্য কথা নয়। আর কেউ হ'লে তৎক্ষণাৎ সাপটাকে ছেড়ে দিত। কিন্তু গঙ্গাচরণ এক হাতে সাপের মাথাটা আর এক হাতে তার লেজটা ধরে করাতের মত ধারাল তালের ডালে ঘষ্‌তে

আরম্ভ কল্লে। সাপটা যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ কত্তে লাগল কিন্তু গঙ্গাচরণ ছাড়লে না। শেষে সাপটার যখন নড়া চড়া বন্ধ হ'ল তখন তাকে গাছ থেকে ফেলে দিয়ে নেমে এল। যারা সেখানে ছিল দেখে অবাক্ হ'ল। চৌধুরী মহাশয় শুনে জিজ্ঞাসা কল্লে গঙ্গাচরণ অতি ধীরভাবে বল্ল; "তা না হলে বাচ্ছাটাকে যে খেয়ে ফেল্ত।"

"তোর তা'তে কি?" এই কথা জিজ্ঞাসা কল্লে গঙ্গাচরণ উত্তর দিলে "আমাদের গাছের বাচ্ছা, সাপে খাবে, তা' কেমন করে দেখ্ব।"*

চৌধুরী মহাশয় আর কিছু বল্লেন না। কিন্তু তাঁর মনে হল, গঙ্গা-জলে প্রাণ দেওয়া অনেক সৌভাগ্য ভিন্ন হয় না। দেখ্ছি ছেলেটার কপালে এই রকম অপঘাত মৃত্যু লেখা আছে।

এই সাপের ঘটনায় গৃহিণীর মন অস্থির হ'ল। তিনি ভাবতেন গঙ্গা-চরণের যে রকম দুঃসাহস তা'তে সে কোন দিন কুমীরের পেটে যাবে, কি সাপের কামড়ে মরবে। তা'হলে তাকে ত হারাবই, দেবতার কাছেও সত্যভঙ্গ হবে। হয় ত সেজন্য কত অমঙ্গল ঘটবে; ছোটছেলেটার স্বয়ং চৌধুরী মহাশয়েরও কোন বিপদ ঘটা অসম্ভব নয়। এ অবস্থায় মা গঙ্গার কাছে যা' পণ করেছি, তা' রক্ষা করাই ভাল। তবে সেই সাধুর আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি; একবার তাঁকে বলে দেখি। আবার কখনও ভাব্তেন, সাধু না এলেই ভাল হয়; তিনি যা বলবেন তা'ত বুঝতেই পাচ্চি। তিনি কি দেবতার কাছে সত্যভঙ্গের পরামর্শ দেবেন?

ঘটনাক্রমে সেই সাধু একদিন হঠাৎ উপস্থিত হলেন। বার বৎসরে তাঁ'র চেহারার একটুও পরিবর্ত্তন হয় নি; একটা দাঁত পড়েনি, একগাছি চুল পাকেনি। সাধুকে দেখে কর্ত্তা, গৃহিণী অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে প্রণাম কল্লেন। তিনি বল্লেন, "কেমন তোমাদের মনস্কাম সিদ্ধ হয়েছে ত?

---

* পাঠক স্বর্গীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনীতে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প দেখিতে পাইবেন।

গৃহিণী বল্লেন, "হাঁ! মায়ের কৃপায় আর আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের দু'টী পুত্র জন্মেছে। দু'টী বেশ সুস্থ, সবল আছে।"

সাধু। "দু'টী আছে কি বল্‌চ? তবে কি বড়টীকে মায়ের চরণে দাও নি? মায়ের অপমান! মায়ের সঙ্গে চাতুরী! এ বাড়ীতে আমি আর মুহূর্ত্তমাত্র থাক্‌ব না। ধিক্ তোমাদের ধর্ম্মে! কেবল লোক দেখাবার জন্যে কি পূজা, পাঠ কর?"

কর্ত্তা, গৃহিণী উভয়েই অতি কাতরভাবে সাধুর চরণে লুটিয়ে পড়্‌লেন। সরলভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার কল্লেন। সাধু বল্লেন; "তোমাদের মঙ্গলের জন্য বল্‌চি আর মায়ের সঙ্গে চাতুরী করো না। কল্লে বড়টীকেত হারাবেই, ছোটটীরও বিপদ ঘট্‌বে। এই অপরাধে কেবল তোমাদের নয়, সমস্ত গ্রামবাসীর অকল্যাণ হ'বে। কলিতে সকল দেবতাই নিদ্রিত, কেবল মা গঙ্গাই জাগ্রত।"

এই বলেই সাধু উঠ্‌লেন; অনেক উপরোধ অনুরোধ সত্ত্বেও কিছু সেবাগ্রহণ কল্লেন না। চৌধুরী মহাশয়ের দেবালয়ে বসে একটু গঙ্গাজল পান কল্লেন মাত্র। তাঁর ভাব দেখে গঙ্গাচরণের সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌তেই গৃহিণীর সাহস হ'ল না।

সেই দিন হ'তে উভয়ের আহার, নিদ্রা চলে গেল। গঙ্গাচরণের মুখের দিকে চাইলেই তাঁদের চোক জলে ভরে যেত। গৃহিণী, এক এক দিন, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডাক ছেড়ে কাঁদতেন। চৌধুরী মহাশয়, তাঁকে বুঝুতে গিয়ে, নিজেও কেঁদে ফেল্‌তেন। কিন্তু কেঁদেত ফল নাই, মা গঙ্গার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা'ত রাখ্‌তেই হবে। সাধু যে সকল কথা বলে গিয়েছিলেন তা' ক্রমে প্রচার হয়েছিল। 'তোমাদের অপরাধে গ্রামবাসীদেরও অকল্যাণ হবে' এই কথায় অনেকেরই মনে ত্রাস জন্মেছিল। কোনও একটা দুর্ঘটনা ঘটলেই তারা চৌধুরী মহাশয়কেই সেজন্য দোষী ধরে নিত। নদীতে ঝড় উঠ্‌লে নৌকা চিরদিনই ডোবে; ঘাট থেকে

স্নানের সময় বা বাসন মাজার সময় দু'টী একটী মেয়েকে চিরদিনই কুমীরে ধরে নিয়ে যায়; বেশী বর্ষা হ'লে চিরদিনই বাঁধ ভেঙ্গে গ্রামের মধ্যে জল ঢোকে; কিন্তু এখন এই সকল ঘটনা চৌধুরী মহাশয়েরই পাপের ফল বলে গণ্য হতে লাগ্‌ল। প্রবলপ্রতাপ এবং সৎকর্ম্মানুরাগী জমিদার হ'লেও তিনি সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। লোকের কথা চাকর দাসীর মুখে চৌধুরী মহাশয়ের ও গৃহিণীর কাণে পঁহুছত। নিজেদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে একেই তাঁদের মনে একটা আত্মগ্লানি ছিল; তার উপর লোকের তীব্র সমালোচনায় উত্ত্যক্ত হয়ে তাঁরা শেষে গঙ্গাচরণকে ভাসিয়ে দেওয়াই স্থির কল্লেন। পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে এক মহা মেলা হয়, তা'তে নানাস্থানের লোক মিলিত হয়। সেই দিন অনেক শিশুকে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ত। পৌষ সংক্রান্তির কয়েক মাস বাকী ছিল। এই সময়টা গঙ্গাচরণকে তার মনোমত খাওয়াবেন, পরাবেন গৃহিণী এই ইচ্ছা কল্লেন। তার পর, যথা সময়ে, উভয়ে নিজেদের নৌকায় গঙ্গাচরণকে ভাসাতে নিয়ে যা'বেন এই স্থির হ'ল।

জ্ঞান হয়ে অবধি গঙ্গাচরণ শুনে আসছিল যে তা'কে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। ভাসিয়ে দেওয়ার অর্থ কি সে প্রথমে ভাল করে বোঝেনি। মা বাপের স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের আদর পেয়ে কথাটার যে কি সর্ব্বনেশে অর্থ তা' তার মনে স্থান পেত না। সে ভাব্‌ত তার বাবার কোন নূতন নৌকা তৈয়ার হলে যেমন শাঁক, ঘণ্টা বাজিয়ে, ফুলের মালায় সাজিয়ে নৌকাটা জলে ভাষান হয়, সেই রকম একটা কিছু হবে। তার পর সে তা'র প্রিয় দরোয়ান তেওয়ারীজীর কাছে সমস্ত শুন্‌লে। তেওয়ারী সাদাসিদা মানুষ, সহজ ভাষায় ভাসিয়ে দেওয়ার অর্থ বুঝিয়ে দিলে। গঙ্গাচরণ পুরোহিত মহাশয়ের কাছে গঙ্গার ধ্যানের অর্থ শিখেছিল। চন্দ্রের ন্যায় যাঁর কান্তি, সুচারু যাঁর নেত্র, যাঁর অঙ্গ দিব্য গন্ধে সুবাসিত, দেবতারা যাঁর মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করে যাঁকে বীজন কচ্চেন, যিনি পৃথিবীকে সুধাধারায়

অভিষিক্ত করেন, পতিতজনের প্রতি করুণায় যাঁর হৃদয় সর্ব্বদা আর্দ্র এমন মায়ের কাছে যেতে ভয় কি ?* কিন্তু যে ভাবে ছোট ছোট ছেলেগুলিকে তাঁর কাছে পাঠান হয় তেওয়ারীজীর কাছে তা' শুনে গঙ্গাচরণের মনে ভয় ও কষ্ট দুই হ'ল।

একদিন চৌধুরী মহাশয় আর গৃহিণী একসঙ্গে আছেন, এমন সময় সে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে; "মা! তোমরা নাকি আমায় জলে ডুবিয়ে মার্‌বে ?" উভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাইলেন; কোন উত্তর দিতে পাল্লেন না। গঙ্গাচরণ বল্লে, "কেন ডুবিয়ে মার্‌বে, মা! আমি কি দোষ করেছি ?"

এবার চৌধুরী মহাশয় বল্লেন "না বাবা! তুমি কোন দোষ করনি। মা গঙ্গা তোমাকে আমাদের হাতে দিয়েছিলেন; তুমি তাঁরই জিনিষ; আমরা তোমাকে তাঁরি কাছে ফিরিয়ে দেব ?"

গঙ্গাচরণের বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। সে বল্লে; "আমি মা গঙ্গাকে দেখ্‌তে পাব ?"

গৃহিণী। "তোমার যদি ভক্তি থাকে অবশ্যই পাবে।"

গঙ্গা। "মা! তবে আর দেরি করোনা; আমার মা গঙ্গাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু মা! আমার গলায় কলসী বেঁধে আমায় ডুবিওনা। আর বল দেখি, আমি যদি মা গঙ্গাকে বলে তোমাদের কাছে আবার ফিরে আসি, তোমরা আমায় নেবে ?" গৃহিণী বা চৌধুরী মহাশয় কোন উত্তর দিতে পাল্লেন না; তাঁরা চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। দেখে গঙ্গাচরণ চোক মুছ্‌তে মুছ্‌তে চলে গেল।

---

* ওঁ সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্।
সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠা মার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্॥
গঙ্গাধ্যানম্।

পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে প্রকাণ্ড মেলা জমেছে। কত দিন হ'তে এই মেলা চলে আস্‌ছে, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। এখন ইংরাজ-শাসনে মেলা সম্বন্ধে নানারূপ সুব্যবস্থা হয়েছে। পানীয় জলের জন্য স্বতন্ত্র জলাশয়, রোগীর চিকিৎসার জন্য ঔষধালয়, মল, মূত্র, আবর্জ্জনা পরিষ্কারের জন্য লোক নির্দ্দিষ্ট থাকে। রাত্রিতে হিংস্র জন্তুর উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশ্যে বড় বড় উজ্জ্বল আলোক দেওয়া হয়। কিন্তু পাঠক! তিন শত বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা একবার চিন্তা করুন। একটা সুবৃহৎ চড়া; সেখানে বাড়ী ঘর, রাস্তা নাই; বাগান, পুকুর এমন কি একটা গাছ পর্য্যন্ত নাই; কেবল সাদা বালি ধূ ধূ কচ্চে। তারি উপর মেলা বসে'ছ। প্রয়াগ, কাশী হতে আরম্ভ করে চট্টগ্রাম, আসাম, এমন কি সুদূর নেপাল পর্য্যন্ত নানাদেশের শত শত নৌকা আর সহস্র সহস্র লোক মিলিত হয়েছে। সাধু, সন্ন্যাসী যে কত এসেছেন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব যে কত মিলিত হয়েছেন, তার সংখ্যা নাই। বাঘছাল বিছিয়ে, আগুনের কুণ্ড ঘিরে, এক এক দলের সন্ন্যাসী এক এক যায়গায় আড্ডা করেছেন। কেউ সম্মুখে ধাতু বা প্রস্তরের ইষ্টমূর্ত্তি সাজিয়ে পূজা কচ্চেন, কেউ ঘন ঘন শাঁক ঘণ্টা বাজাচ্ছেন, কেউ গীতা, ভাগবত, গঙ্গাস্তোত্র পাঠ কচ্চেন। কেউ বা উপস্থিত নারীগণের মধ্যে ধূনির ভস্ম ও ঔষধ বিলুচ্চেন। নানারকম জিনিষের দোকান বসেছে; শাল রুমাল থেকে পিঁড়ে, বারকোশ, মাদুর, লোহার হাতা, বেড়ী, কড়া গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই বিক্রয় হচ্চে। সিল, নোড়া, জাঁতা, বড় বড় শাঁক, নানা রঙের কড়ি স্তূপাকারে সাজান রয়েছে। সারি সারি দরমার বা হোগল পাতার চালা উঠেছে। স্বাস্থ্যের নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, যে যেখানে পাচ্ছে, খোঁটা পুতে বা আঁক কেটে খানিকটা জায়গা দখল করে তারি মধ্যে ঘর তুল্‌চে, অপর কেউ সেই আঁক কাটা সীমার মধ্যে এলেই বিবাদ বাদ্‌চে। সেই আঁকের মধ্যেই রাঁধ্‌বার স্থান, সেখানেই উচ্ছিষ্ট পাত্রের ও পত্রের রাশি, তাহারই পার্শ্বে একখানি চট বা দর্ম্মার

আড়ালে, অবিভেদে, স্ত্রী পুরুষের মলমূত্রত্যাগের স্থান। ইহারই সন্নিকটে হয়ত একটী ময়রার দোকান। হাজার হাজার মাছি এক স্থান হ'তে আর এক স্থানে উড়ে বস্‌চে। তার ফল কি হ'তে পারে সে কথা কারু মনে কখনও উদয় হচ্ছে না। মিঠা জলের অভাব বলে সকলেই নৌকায় জালা বোঝাই করে জল এনেছে। কোন কারণে যাদের জল ফুরিয়ে গিয়েছে তা'দের কষ্টের সীমা নাই। সাগরের জল লবণাক্ত, অপেয়; তারা কপিল মুনির আশ্রমের নিকটস্থ ডোবার কাদাজল পান করে প্রাণধারণ কচ্চে। * আহারের নিয়ম নাই; চিড়া, মুড়্‌কি, তেঁতুল আর গুড় অধিকাংশ লোকের অবলম্বন। রাঁধ্‌লে বেলা তিনটার পূর্ব্বে হাঁড়ী নামে না। রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না। দূরের যাত্রীরা সংক্রান্তির পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বেই পঁহুছেচে, তাদের মধ্যে বিসূচীকা দেখা দিয়েছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই; লোকে মৃত ও মুমূর্ষুকে টেনে, একই সঙ্গে, সাগরে ফেলে দিচ্চে। জোয়ারের সময় সেই মৃত দেহগুলি আবার এসে চড়ায় লাগ্‌চে। চড়ার উত্তর ও পশ্চিম উভয় দিকেই শতাধিক হস্তের মধ্যে বন আরম্ভ হয়েছে। ক্রমেই নিবিড় বন; বনে বাঘ থাকে; নেকড়ে, শিয়াল দলে দলে বাস করে। মড়া খাবার লোভে তারা রাত্রিতে সুবিধা পেলেই চড়ার উপর আসে। তীরের মড়া টেনে ডাঙ্গায় তোলে, তার পর যে অবস্থায় ফেলে রেখে যায়, দেখ্‌লে শরীর শিউরে ওঠে। দারুণ শীত, উত্তুরে বাতাসে সর্ব্ব শরীরে কাঁটা দিচ্ছে; তবুও লোকে সঙ্গমে স্নান করে, ভিজা কাপড়ে, "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ কত্তে কত্তে কপিল মুনির আশ্রমের দিকে চলেছে। রাত্রিতে মাঝে মাঝে দূর বন থেকে বাঘের ডাক শোনা যায়। কখনও কখনও "বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে" বলে হল্লা হয়। অম্‌নি সন্ন্যাসীরা

* এখন পানীয় জলের জন্য যে দুইটী reserved tank আছে তাহাদের মধ্যে একটী করুণাময়ী পুষ্করিণী ও অপরটী পাত্রদের পুষ্করিণী বলিয়া খ্যাত। উভয় পুষ্করিণীরই জল চতুর্দ্দিকে লবণাম্বু-পরিবেষ্টিত হইলেও সুপেয়; দাতা ও দাত্রীর 'পুণ্যলক্ষণ' সূচনা করিতেছে।

শাঁক বাজান, চিম্‌টায় লাগান লোহার কড়া ঝন্ ঝন্ করেন, আর নাগা সন্ন্যাসীরা তলোয়ার নিয়ে বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ কর্ব্বার জন্যে ছোটেন। তবুও লোকের উৎসাহের অভাব নাই। এরি মধ্যে হরিসঙ্কীর্ত্তন, তর্জ্জা, বন্দে মাতা সুরধুনী গান এবং ঝুমুর-নাচ হচ্চে। বড় বড় কর্ত্তাল বাজিয়ে উড়িষ্যা-বাসীরা সঙ্কীর্ত্তন কচ্চেন। দাতা ধনীরা এই উপলক্ষ্যে নানারূপে সাধু সন্ন্যাসীদের সেবায় নিযুক্ত আছেন। কেউ আটা, ঘি, চিনি, কেউ জালা জালা মিঠা গঙ্গাজল, কেউ প্রচুর শুক্‌না কাঠ দিচ্চেন। অনেকে কম্বল, বাঘছাল, কমণ্ডলু বিতরণ কচ্চেন। অন্য অনেক জমিদারের নৌকাগুলির সঙ্গে চৌধুরী মহাশয়ের ষোল দাঁড়ের বজরাও চড়ায় বাঁধা রয়েছে; তার সঙ্গে ছোট, বড় আরও চার পাঁচখানি নৌকা আছে। চৌধুরী মহাশয়ের আর গৃহিণীর মুখ একবারেই রক্তশূন্য, চোকের কোলে কালি পড়েছে; তাঁদের বিছানা হতে ওঠ্‌বার শক্তি নাই, কথা কইতেও যেন কষ্ট বোধ হয়। বাড়ী থেকে প্রায় একমাস বেরিয়েছেন কিন্তু এর মধ্যে কোনও দিন দু'বেলা আহার হয় নি। আহারের সময় গঙ্গাচরণকে দেখে হাতের ভাত পাতে ফেলে উঠে যান। ভক্তি থাক্‌লে মা গঙ্গার সঙ্গে দেখা হবে শুনে অবধি গঙ্গাচরণ কিন্তু নিশ্চিন্ত। সে কখনও গিয়ে মাঝীর হাত থেকে হাল ধচ্চে, কখনও নৌকার ছাদের উপর বসে শিশুক কি কুমীর দেখ্‌তে পেলে আহ্লাদে হাততালি দিচ্চে, কখনও আপনার মনে "বন্দে মাতা সুরধুনী" গান গাচ্চে। তার নিশ্চিন্ত ভাব দেখে কর্ত্তা, গৃহিণী উভয়েরই প্রাণের ব্যাকুলতা বেড়ে উঠ্‌চে।

আজ সংক্রান্তি, সাগরের চড়ায় লোক ধরেনা। বড় বড় ঢেউ এসে চড়াৎ চড়াৎ করে পড়্‌চে আর হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ মাথা পেতে নিচ্চে। দারুণ শীত, ঘোলা লোণা জল, ঢেউয়ের সঙ্গে এঁটো শালপাতা, হাঁড়ী এসে গায় পড়্‌চে, বালিতে পা ডুবে যাচ্চে, কেউ বা আছাড় খেয়ে পড়্‌চে, তবু কারু মুখে কষ্টের চিহ্ন মাত্র নাই। ধন্য হ'লুম, কৃতার্থ হ'লুম লোকে

এই মনে কচ্চে। শাঁক, ঘণ্টা, কাঁসরের বাদ্যে এবং "মাতর্গঙ্গে" "হরি হরিবোল" শব্দে আকাশ যেন ফেটে যাচ্চে। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে কান্নার শব্দও মিশ্রিত হচ্চে। দু'চার জন তাঁদের ছেলেগুলিকে সাগরে ফেলে দিচ্চেন। অধিকাংশ মাতা, পিতাই কিন্তু রাত্রির জন্য অপেক্ষা করে আছেন; দিনে ছেলেটার কষ্ট, কাতৃরাণি চোকে পড়্‌বে এই ভয়। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল, নৌকায় নৌকায় আলো জ্বল্‌ল। চৌধুরী মহাশয় গঙ্গাসাগরে যা যা কত্তে হয় দিনের বেলা সেরে রেখে ছিলেন, শেষ কাজ করে রাত্রিতেই দেশে ফির্‌বেন এই স্থির ছিল। গৃহিণী, ধৈর্য্য ধরে, গঙ্গাচরণকে পরিতোষ করে আহার করালেন; ভাল রেশমী কাপড়, সোণার হার, সোণার বালা, বাজু পরালেন। কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক এঁকে, গলায় ফুলের মালা দিলেন। তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু দেবতার আদেশ পালন কচ্ছিলেন ভেবে যথাশক্তি ধৈর্য্য ধল্লেন। গঙ্গাচরণ দিনে দেখেছিল, কোন কোন ছেলেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হচ্চে; অধিকক্ষণ ভেসে না থাকে এই জন্যে কারু কোমরে, কারু পায়ে বালিভরা কল্‌সী বেঁধে দেওয়া হচ্চে। সে মাকে বল্লে, "মা! আমায় ঠেলে ফেলে দিওনা; আমি আপনি মা গঙ্গার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব।" গৃহিণী কোন উত্তর দিতে পাল্লেন না; তিনি গঙ্গাচরণের দিকে চেয়ে মূর্চ্ছিতা হলেন।

রাত্রি প্রহরাতীত হয়েছে। অনেক নৌকা হ'তে এইবার ছেলে ফেলা আরম্ভ হল। অধিকাংশ শিশুরই বয়স তিন চার বৎসর, তারা জলে পড়্‌বামাত্রই অদৃশ্য হল। যারা কিছু বড় তারা হাত, পা নাড়্‌বার, কেউবা সাঁতার দেবার চেষ্টা কত্তে লাগ্‌ল। কিন্তু নৌকার কাছে এলেই মাজী মল্লারা লম্বা লম্বা লগী দিয়ে তা'দিগকে সরিয়ে দিতে লাগ্‌ল। নৌকায় অনবরত কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁক বাজ্‌ছিল, সেই শব্দে শিশুকণ্ঠের আর্ত্তনাদ মা বাপের কাণে পহুঁছিল না। মানুষের প্রকৃতি যে কি অদ্ভুত, তা'তে যে কি দেবত্ব, কি পিশাচত্ব মিশ্রিত থাকে, তা' বোঝা কঠিন। জলে

ভাসাবার পূর্ব্বে অনেক মা, বাপই ছেলেটীকে অবস্থামত বস্ত্র, অলঙ্কারে সাজাতেন। তারি লোভে অনেক ডোম, হাড়ী প্রভৃতি নীচজাতীয় লোক ছোট ছোট ডিঙ্গীতে, কেউবা সাঁতার দিয়েও, নৌকার আশে পাশে ঘুর্‌ত। বাঘ যেমন শিকার পেলে ডোকার দেয়, তারাও তেম্‌নি একটী মৃত বা মৃতপ্রায় শিশু পেলে আনন্দধ্বনি কত্তো। কোন কোন শিশু এদের হাতে প্রাণ দিত। এই দেখে চৌধুরী মহাশয় আপনার বজরা মাঝগাঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সময় হয়েছে শুনে গঙ্গাচরণ মা বাপকে প্রণাম কল্লে, আপনার রেশমী চাদর কসে কোমরে বাঁধ্‌লে, তার পর "জয় মা গঙ্গে" বলে নৌকার উপর থেকে ঝাঁপ দিলে। সঙ্গে সঙ্গে শাঁক, ঘণ্টা, কাঁসর বেজে উঠ্‌ল, সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। ছেলেটীর পরিণাম দেখ্‌তে না হয় এইজন্য চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বেই আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। ইঙ্গিত মাত্র তাঁর ষোল দাঁড়ের বজ্‌রা অন্ধকারে অদৃশ্য হ'ল। বড় সাধের গঙ্গাচরণ মা গঙ্গার কাছে একা রইল।

জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়া গঙ্গাচরণের অভ্যাস ছিল; সুতরাং তা'তে তার কষ্ট হ'লনা। গাঙ্গের একদিকে নিবিড় অন্ধকার; কিছু দেখা যাচ্ছিল না; অপরদিকে সঙ্গমের চড়া, সেদিকে শত শত আলোক জ্বল্‌ছিল। গঙ্গাচরণ সেই দিকে সাঁতার দিয়ে যাবার চেষ্টা কল্লে; কিন্তু তখন ভাঁটা আরম্ভ হয়েছিল, তা'কে টেনে সাগরের দিকে নিয়ে চল্‌ল। পৌষ মাসের রাত্রি, দারুণ শীত; বালক কতক্ষণ যুজ্‌তে পারে? নাকে, মুখে ঢেউএর লোণা জল প্রবেশ কচ্ছিল, বুকে চড়াৎ চড়াৎ করে ঢেউ লাগ্‌ছিল। গঙ্গাচরণের হাত, পা ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে এল। "মা গঙ্গা আমায় রক্ষা কর" এই বলে বালক জলে একবারে এলিয়ে পড়্‌ল। এমন সময় বড় বড় মশালের আলোকে উজ্জ্বল একখানা পানসী, কোথা থেকে তীরের মত এসে, সেখানে পঁহুছিল। গঙ্গাচরণ তখন প্রায় ডুবু ডুবু হয়েছিল। তা'কে দেখ্‌তে পাবামাত্র একজন আরোহী নৌকা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন এবং

দাঁড়ী মাঝিদের সাহায্যে তাকে টেনে নৌকার উপর তুল্লেন। তারপর কি হ'ল গঙ্গাচরণের মনে রইল না।

গঙ্গাচরণকে তুলে নৌকারোহী পুরুষ মশাল নিয়ে তার বুক, পেট উত্তমরূপ পরীক্ষা কল্লেন। সন্তরণে পটু ছিল বলে গঙ্গাচরণ বরাবরই মাথাটা উঁচু করে রেখেছিল, কাজেই অধিক জল খায়নি। তার পেটে বেশী জল ছিল না, নিঃশ্বাসও স্বাভাবিক পড়ছিল। নৌকারোহী বুঝ্‌লেন, শীতে আর সাঁতার দেওয়ার শ্রমে শরীর অবসন্ন হয়েছে বলেই গঙ্গাচরণের মূর্চ্ছা হয়েছে, কিন্তু কোন ভয়ের কারণ নাই। তিনি তার ভিজা কাপড় ছাড়িয়ে সমস্ত শরীর উত্তমরূপ মুছিয়ে দিলেন। নৌকায় একটা পাত্রে কাঠের আগুন জ্বল্‌ছিল, তিনি একখানা কাপড় গরম করে তা'র সর্ব্বাঙ্গে তাপ দিলেন। তার পর লেপ পেতে শুইয়ে দু'খানা মোটা কম্বল চাপা দিলেন। গঙ্গাচরণের জ্ঞান ছিল না, সে অঘোর হয়ে ঘুমুতে লাগ্‌ল। পরদিন এক প্রহরের সময় তা'র চেতনা হল, সে একবার চোক মেলে চাইলে, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়্‌ল। দ্বিপ্রহরের পর তার সম্পূর্ণ চেতনা হল। নৌকারোহী তাকে উঠ্‌তে নিষেধ কল্লেন। তিনি তার জন্য গরম দুধ, চিনি, অন্নের মণ্ড প্রস্তুত করে রেখে ছিলেন। তার মুখের কাছে ধর্‌লে গঙ্গাচরণ তৃপ্তির সঙ্গে পান কল্লে। সে নৌকারোহীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে; "আপনি কে?

নৌকারোহী বল্লেন;—"আমার পরিচয় পরে পাবে। আজ কথা কয়োনা, মাথা ঘুর্‌বে।"

গঙ্গাচরণ বল্লে; "একটী কথা; মা গঙ্গা কি আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

নৌকারোহী। "হাঁ! তুমি তাঁকে মনে মনে ডেকেছিলে, তাই তিনি আমাকে তোমায় রক্ষা কর্ব্বার জন্যে পাঠিয়েছেন।"

গঙ্গাচরণ হাত জোড় করে মা গঙ্গাকে প্রণাম কল্লে। সে দিন উভয়ের আর কোন কথাবার্ত্তা হল না।

পরদিন, ঘুম থেকে ওঠ্‌বার পর, গঙ্গাচরণ আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ কল্লে। নৌকারোহীকে দেখে তার মনে হ'ল, কোথাও, যেন তাঁকে দেখেছে, কিন্তু কিছুই ঠিক কত্তে পাল্লে না। সে আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লে "আপনি কে ?"

নৌকারোহী। "আমার পরিচয় তোমাকে পরে দেব। এখন সে বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করনা।"

গঙ্গা। "আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চেন ?"

নৌ-হী। "আমার বাড়ীতে"।

গঙ্গা। "কেন ? আমায় নিয়ে কি কর্ব্বেন ?"

নৌ-হী। "আমার পুত্র নাই, তোমাকে আমার পুত্র কর্‌ব।"

গঙ্গা। "আমার ত বাবা আছেন, তাঁর কাছে আমায় পাঠিয়ে দিচ্চেন না কেন ?"

নৌ-হী। "তোমার বাবা ত তোমায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। তিনি ত তোমায় আর নেবেন না। মা গঙ্গা তোমাকে আমার হাতে দিয়েছেন। এখন থেকে তুমি আমার পুত্র।"

গঙ্গা। "আপনার জাতি কি ?"

নৌ-হী। "শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ চৌধুরী মহাশয়ের যে জাতি সেই জাতি।"

পিতার নাম শুনে গঙ্গাচরণ বিস্মিত হ'ল। সে বল্লে—"আপনি কি আমায় জানেন ?"

নৌ-হী। "হাঁ জানি ; তুমি গঙ্গাচরণ ; চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমি তোমারই জন্যে, মা গঙ্গার আদেশে, পৌষ-সংক্রান্তিতে, সঙ্গমের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। মা গঙ্গা দয়া করে তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন। কোন চিন্তা নাই, আমার সঙ্গে চল।"

পাঠক ! প্রকৃত পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত, গঙ্গাচরণের উদ্ধারকর্ত্তাকে আমরা নৌকারোহী বল্‌ব ; এই নামই স্মরণ রাখ্‌বেন।

অপরিচিতের মুখে নিজের পরিচয় পেয়ে গঙ্গাচরণ যেমন বিস্মিত, তাঁর স্নেহ, মমতা দেখেও, তেম্‌নি মুগ্ধ হ'ল। মাতা, পিতা তাকে পরিত্যাগ কল্লে তিনি যে তাকে রক্ষা করেছিলেন, এই ভেবে তার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হ'ল। তিনি নিজের পরিচয় দেন নি ; কিন্তু তাঁর ব্যবহার দেখে গঙ্গা-চরণের মনে হ'ল, তিনি যেই হন, তাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান, কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। গঙ্গাচরণের হৃদয় স্বভাবতঃ অতি সরল ছিল, সে অপরিচিত পুরুষকে ভালবাস্‌তে আরম্ভ কল্লে।

নৌকা অবিশ্রাম চল্‌ছিল। মাঝে মাঝে তীরে লাগিয়ে নৌকারোহী গঙ্গাচরণের জন্য ভাল মিষ্টান্ন পেলে ক্রয় করে আন্‌তেন। পথের কোথায় কি আছে—সমস্তই তিনি জান্‌তেন। কোথায় বড় বড় গল্‌দা চিংড়ী, ভাঙ্গন মাছ পাওয়া যায়, কোথায় দানাদার ভয়সা ঘি মেলে, কোথায় মিঠাজলের পুকুর আছে, তাঁর সুপরিচিত ছিল। তিনি গঙ্গাচরণকে স্নান করিয়ে তার গা মুছে দিতেন, স্বহস্তে রেঁধে তাকে খাওয়াতেন, তার পর, নিজের হাতে বিছানা করে, তাকে বুকের কাছে শোয়াতেন। নৌকায় যা'তে তার কোনরূপ কষ্ট না হয় সেজন্য তিনি সমস্ত গুছিয়ে এনেছিলেন। গঙ্গাচরণ তাঁর যত্ন, ভালবাসা দেখে একবারে মুগ্ধ হ'ল। সে ভাব্‌লে মা গঙ্গার কত দয়া, তিনি এমন লোককে আমার জন্যে পাঠিয়েছেন।

নৌকা ক্রমে, বড় গাঙ্গ ছেড়ে, ছোট ছোট নদী দিয়ে চল্‌ছিল। দুই পাশে সুঁদরী, গরাণ, ক্যাওড়া, হেঁতাল প্রভৃতি গাছের নিবিড় বন ; কোথাও বা মানুষপ্রমাণ লম্বা লম্বা ঘাস, মাঝে অপ্রশস্ত লোণা জলের নদী ; মাছে আর কুমীরে ভরা। কোথাও বরাহের পাল, কোথাও হরিণের দল, কোথাও চড়ার উপর ঘুমন্ত কুমীর দেখা গেল। যে গাছগুলোর ডাল নদীর উপর বেঁকেছিল, তা'তে সারি সারি মাছরাঙা বসে শিকার লক্ষ্য কচ্ছিল। উদ্বিড়ালগুলো কখনও ডুব্‌ছিল, কখনও হাত পা ছড়িয়ে জলের উপর ভাস্‌ছিল। বড় বড় বক, সারস আর গগনভেড় জলের ধারে এক পায়ে

ভর করে দাঁড়িয়েছিল। সমুদ্রে কাঁকড়াগুলো মাটীর ঢিপির উপর কেল্লাদারের মত বসেছিল। লালমুখো বানরের দল নৌকা দেখে লাফালাফি কচ্ছিল। ক্যাওড়া গাছের ডালে সাদা সাদা বকগুলো এমন ভাবে বসেছিল যে, দূর থেকে, যেন ফুল ফুটেছে বলে বোধ হচ্ছিল। কোথাও বা বন মোরগগুলো, ডানা খেলিয়ে রদ্দুর পোয়াচ্ছিল; আর তাদের পালকগুলো ঝক্ মক্ কচ্ছিল। কাঠুরিয়ারা পৌষ সংক্রান্তিতে বনের দেবতা দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের পূজা দিয়েছিল; দু'একটা বড় গাছের তলায় দীর্ঘগুম্ফ, বিশালনেত্র সেই মূর্ত্তি রয়েছে দেখা গেল। নৌকারোহী পুরুষ বল্লেন; তাঁরা যেখান দিয়ে যাচ্চেন, তার নাম সুন্দরবন। তার যায়গায় যায়গায় লোকের বাস আছে; কিন্তু বেশীর ভাগেই লোক নাই। সেখানে ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর থাকে। পূর্ব্বে তিনি প্রতি শীত ঋতুতে সেই অঞ্চলে শিকার কত্তে আসতেন। তা'তেই তার পথ, ঘাট, বা পুকুর কোথায় কি আছে সমস্ত তিনি জানেন। আগে অনেক ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত কত্তেন, কিন্তু ফিরিঙ্গী আর মগদের উৎপাতে লোকে সে পথ দিয়ে যেতে আর সাহস করেনা। বিশেষ কারণে, কয় বৎসর, তিনি সেই বনের মধ্যে বাস কচ্চেন। তাঁর বাড়ী সেখান থেকে বেশী দূর নয়।

খানিকদূর গিয়ে নৌকারোহী একটা হেঁতাল বন দেখিয়ে বল্‌লেন; "এইখানে আমি, একবার, একটা হরিণ মারব বলে নৌকা লাগিয়েছিলুম। হরিণটা হেঁতালের কচি কচি পাতা খাচ্ছিল। তার পিছনে যে একটা বাঘ তা'কে লক্ষ্য কচ্ছিল, আমার চোকে তা' পড়েনি। আমি বন্দুক তুলেছি, পল্‌তে লাগাতে যাই, এমন সময় বাঘটার মাথা দেখ্‌তে পেলুম। তখন হরিণ ছেড়ে বাঘটাকেই লক্ষ্য কল্লুম। বন্দুকের আওয়াজ হ'বা মাত্র বাঘটা বিকট গর্জ্জন করে লাফিয়ে উঠ্‌ল; গুলিতে তার মাথাটা এফোঁড়, ওফোঁড় হয়েছিল। যেমন পড়্‌ল অম্‌নি ম'ল। সেই আমার প্রথম বাঘ শিকার।"

গঙ্গাচরণ বল্লে; "এবার যখন শিকারে যাবেন, আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন?"

নৌকারোহী বল্লেন;—"হ্যাঁ নিশ্চয় নিয়ে যাব।"

গঙ্গা। "আমাদের দরোয়ান তেওয়ারীজী বলেছিল তার বন্দুক ছোড়ার অভ্যাস নাই। কিন্তু সে একবার তলোয়ার নিয়ে বাঘ মেরেছিল। আপনি কখনও তলোয়ার নিয়ে বাঘ মেরেছেন কি?"

নৌ-হী। "একবার মেরেছি। গায় খুব জোর না থাক্‌লে তলোয়ারে বাঘ মারা যায়না। বাঘের অভ্যাস দূর হ'তে লাফিয়ে পড়ে। বন্দুকের কাছে সেটা পারেনা। কিন্তু কাছাকাছি হ'লে প্রথমে থাবা মারে, তারপর কামড়ায়। বাঘের হেতোয় ভয়ানক জোর। বাঘের থাবা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে এমন জোর না থাক্‌লে বাঘের গায়ে তলোয়ার চালান যায়না। গায়ে থাবা মাল্লে দাঁড়ান অসম্ভব; ঢালের উপর মাল্ল, আর গায়ে খুব জোর থাক্‌লে, তবে রক্ষে পাওয়া যায়। আমি ঢাল, তলোয়ার দুই নিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়েছিলুম। তবুও দেখ কি করেছিল।" এই বলে তিনি আপনার বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন; গঙ্গাচরণ দেখ্‌লে তা'তে তিনটা গভীর গর্ত্ত রয়েছে। নৌকারোহী বল্লেন, "তলোয়ারের কোপে গলাটা অর্দ্ধেক কাটা অবস্থায় এই কামড় দিয়েছিল। অমন ভয়ঙ্কর জন্তু আর নাই।"

এই রকম কথাবার্ত্তায় তাঁরা অনেক দূর এগিয়ে ছিলেন। নৌকারোহী তখন বল্লেন;—"এই বাঁকটায় পরেই আমার বাড়ী। বাড়ী আর কি? জঙ্গলের ভিতর খান কত কুঁড়ে মাত্র। তুমি কি এখানে থাক্‌তে পার্ব্বে? ভয় হ'বে না ত?"

গঙ্গাচরণ। "আপনি কাছে থাক্‌লে আমার ভয় কি? আপনি যেখানে থাক্‌তে পার্ব্বেন, আমিও সেখানে থাক্‌তে পার্‌ব।" নৌকারোহী উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলেন।

এই বার একটী ছোট পল্লী গঙ্গাচরণের চোকে পড়্‌ল। মাঝখানে এক খানি বড় উচুঁ ঘর আর তার আশে পাশে, একটু একটু দূরে, পঞ্চাশ, ষাট খানি কুঁড়ে। সকল গুলিরই মাটীর মেজে, হেঁতালের চাল; চালগুলি গোল পাতা দিয়ে ছাওয়া। পল্লীর কাছে কোথাও মাছধরা জাল শুকুচ্চে, কোথাও ধানের গাদা উঠেছে, কোথাও গরুগুলো জাব খাচ্চে; কোথাও বা রাশীকৃত শুক্‌না জ্বালানী কাঠ, হোগলপাতা রয়েছে। একদিকে অনেক গুলি ডিঙ্গীনৌকা গাছে দড়ী দিয়ে বাঁধা আছে। নৌকারোহী সেই খানে গঙ্গাচরণকে নিয়ে তীরে নাম্‌লেন; সঙ্গের লোকেরা নৌকার জিনিষগুলি কাঁধে নিয়ে চল্‌ল। নদীর তীর থেকে একটী মেটে রাস্তা বড় ঘরটী পর্য্যন্ত গিয়েছিল; তাঁরা সেখানে পঁহুছিবার আগেই একটী ৮।৯ বৎসরের বালিকা ছুটে এল; এসেই "বাবা বাবা" বলে নৌকারোহীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধল্লে। তিনি তার দাড়ি ধরে গঙ্গাচরণকে দেখিয়ে বল্লেন; "নয়না! নয়না! দেখ, তোমার কেমন খেলার সাথী এনেছি। একে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।"

পিতার আদেশ মাত্র নয়না এসে গঙ্গাচরণের হাত ধল্লে। গঙ্গাচরণ সেই বনের মধ্যে এমন একটী সুন্দরী মেয়ে দেখে অবাক হ'ল। তার চাঁপাফুলের মত রঙ, গোলাল গড়ন, হাসি হাসি মুখ, মাথায় একরাশ চুল; রূপের ছটায় সে যেন বন আলো করেছিল। অসঙ্কোচে গঙ্গাচরণের হাত ধরে সে বল্লে;—"আমাদের বাড়ী চল; আমার গাঁদা গাছে কেমন ফুল ফুটেছে তোমায় দেখাব।"

নৌকারোহী গঙ্গাচরণকে লক্ষ্য করে বল্লেন;—"আজ থেকে এই তোমার বাড়ী, এই তোমার খেলার সাথী হ'ল। দু'জনে এক সঙ্গে থাকবে, এক সঙ্গে খাবে, এক সঙ্গে বেড়াবে।"

গঙ্গাচরণ নয়নার সঙ্গে তার নূতন ঘরে প্রবেশ কল্লে।

চার বৎসর দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলে গেল। গঙ্গাচরণের বয়স ষোল

অতিক্রম করেছে, কিন্তু দেখ্‌লে বিশ বৎসরের যুবা বলে বোধ হয়। চওড়া মাংসল বুক, মুগুরের মত মোটা হাত পা, গায়ে অসাধারণ বল। নৌকারোহী পুরুষ যেমন বলিষ্ঠ তেম্নি অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ ছিলেন। গঙ্গাচরণ এখন তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হয়েছে। শিক্ষাগুণে এবং নিজের স্বাভাবিক অনুরাগে সে লাঠি খেল্‌তে, তলোয়ার ভাঁজ্‌তে, ষড়্‌কী চালাতে নৌকারোহী পুরুষের প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠেছে। নৌকারোহীর বাড়ীতে দু'তিনটা চক্‌মকীয়া আর পল্‌তেদার বন্দুক ছিল। তাই নিয়ে অভ্যাস করায় গঙ্গাচরণের তাগ অব্যর্থ হয়েছে। পল্লীতে নৌকারোহী পুরুষের অনেক গুলি শিষ্য ছিল। বয়সে সকলের চেয়ে ছোট হ'লেও গঙ্গাচরণ বলে ও কৌশলে সকলকে অতিক্রম করেছে। এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নৌকারোহী আর গঙ্গাচরণ যখন লাঠি বা তলোয়ার খেল্‌তেন, তখন, কে অধিক নিপুণ সন্দেহ হ'ত। নৌকারোহীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হয়েছিল। সুস্থ ও সবল হ'লেও, কিছুক্ষণের পর, তিনি শ্রান্তি বোধ কত্তেন। কিন্তু গঙ্গাচরণ তরুণ যুবা, শ্রান্তি কা'কে বলে জান্‌তো না। এক প্রহর কুস্তি লড়ার পর সে লাঠি নিয়ে দাঁড়াত, পাড়ার ছেলেদের বল্‌ত, "কে পারিস আমাকে ঢেলা ছুড়ে মার্।" ছেলেরা ঢেলা ছুড়্‌ত, কিন্তু গঙ্গাচরণের লাঠিতে লেগে গুঁড়ো হয়ে যেত। তার বল, তার কৌশল দেখে নৌকারোহী পুরুষ একদিন হাস্‌তে হাস্‌তে তা'কে বল্লেন; "মহাভারতে আছে, দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যকেও ছাড়িয়ে উঠেছিলেন; দেখ্‌ছি তুমি আমাকে ছাড়িয়ে উঠ্‌বে।"

গঙ্গাচরণ হাতজোড় করে বল্লে;—"সে আপনারই আশীর্ব্বাদে।"

নৌকারোহী বল্লেন; "মহাভারতে কিন্তু আর একটা কথা আছে। অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যকে তাঁর মনোমত গুরু-দক্ষিণা দিয়েছিলেন। তোমার কাছেও আমার দক্ষিণা পা'বার সময় হয়েছে।"

গঙ্গা। "কি দক্ষিণা আজ্ঞা করুন। প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিবারও বাধা হবে না।

নৌ-হী। "উত্তম। সময় হলেই বল্‌ব।"

গঙ্গাচরণের মত নয়নাও বড় হয়ে উঠেছিল। তার বয়স বার বৎসর হয়েছে; সুস্থ, বলিষ্ঠ দেহ। সে পিতার, শক্তি, সাহস, সহৃদয়তা তিনই পেয়েছে· দু'হাতে দু'টা বড় বড় কলসী নিয়ে সে পুকুর থেকে জল আন্‌ত। চালের ভারী ভারী বস্তা, প্রয়োজন মত, ঘরের একদিক হ'তে আর একদিকে সরিয়ে রাখ্‌ত। নৌকার হাল ধরে, ভাঁটার টানের সময়েও, সে তার বাপকে নদীর এপার থেকে ওপারে নিয়ে যেত। তার বল দেখে নৌকারোহী একদিন বল্লেন;—"দেখ্‌চি, তোর জন্যে, একজন রামচন্দ্রের দরকার।" নয়না বল্লে "সে কি বাবা?" নৌকারোহী বল্লেন, "একটা প্রবাদ আছে যে, যে ধনুক ভেঙ্গে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন, আর কেউ তা' তুল্‌তে পার্‌তো না; কিন্তু সীতাদেবী সেটা অনায়াসে সরিয়ে রাখ্‌তেন। তো'র বল দেখে আমার মনে হয় রামচন্দ্রের মত জামাই না হ'লে মিল্‌বেনা।" নয়না সে কথা শুনে যা ভাব্‌ত, নৌকারোহী তা' বুঝ্‌তেন। তিনি মনে মনে বল্‌তেন, "নয়না! তোর সাধ যদি আমি মিটুতে না পারি তবে আমার জন্মই বৃথা।"

নয়না গঙ্গাচরণকে পেয়ে বড় খুসী ছিল। বাপের মত গঙ্গাচরণের গায়েও জোর হচ্চে দেখে তার মনে আহ্লাদ ধর্‌তনা। একা একা তার ভাল লাগ্‌তনা; এখন দু'টীতে এক সঙ্গে বসে, এক সঙ্গে নদীর ধারে বেড়ায়, এক সঙ্গে বনে ঢুকে ফুল, পাতা, পাখীর ছানা আনে। গঙ্গাচরণ নয়নার শালিকের জন্য ফড়িং ধরে দেয়, পোষা কোকিলের জন্য পাকা বটফল, তেলাকুচা ফল সংগ্রহ করে। নয়নার মনে আনন্দ উথ্‌লে ওঠে; কি কল্লে সে গঙ্গাচরণকে সুখী কত্তে পারে তাই ভাবে। নয়নার বয়স যখন আট, গঙ্গাচরণের বয়স যখন বার, তখন, দু'জনার পরিচয় হয়।

তার পর চার বৎসর গত হয়েছে। দু'জনে কত গল্প করেছে, তবু তা'দের গল্প ফুরোয় না। গল্প আর কি? পাখী গুলো কেমন করে বাসা বাঁধে, কেমন করে বাচ্চা গুলোকে খাওয়ায়, কুমীরগুলো কেমন ডাঙ্গায়, বালির মধ্যে, ডিম পেড়ে বালি চাপা দিয়ে যায়, আর খ্যাকশ্যালগুলো বালি খুঁড়ে ডিম খায়; নয়না এই সকল গল্প করে; গঙ্গাচরণ কাণ পেতে শোনে। একশ' বার সেই একই কথা শুনে তা'র তৃপ্তি হয় না। নয়না যখন গল্প করে, গঙ্গাচরণ যখন তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার বড় বড় চোক দু'টী, হাসিমাখা টুক্ টুকে ঠোঁট দুটী, অনিমেষ নয়নে, দেখে, আর ভাবে কি সুন্দর! গঙ্গাচরণকে গল্প কত্তে বল্লে সে তাদের বাড়ীতে পুজোর সময় কেমন যাত্রা হ'ত, সে কাঙ্গালীদের কেমন মুটোমুটো রসবড়া দিত, গল্প করে। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী গল্প করে সেই গঙ্গাসাগরের মেলার কথা। ছোট ছোট ছেলেগুলিকে তাদের মা, বাপ কেমন সাজিয়ে গুজিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলেন, তারা জলে পড়ে কেমন আঁকুপাকু করেছিল, তাই বলে। শেষে বলে "তোমার বাবা যদি আমায় না বাঁচাতেন, তবেত তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'ত না।" নয়না উত্তর দেয় "তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া যখন বিধাতার ইচ্ছে, তখন কোথাও না কোথাও দেখা হ'তই।" গঙ্গাচরণ এক এক দিন বলে "আমি যে কি দিয়ে তোমার বাপের ঋণ পরিশোধ করব তা' ভেবেই পাইনা।"

নয়না। "ঋণ আবার কি?" একটা লোক যদি জলে পড়ে তা'কে বাঁচান ত মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। লোকের কথা দূরে থাক্, পশু পাখীও যদি জলে পড়ে, দেখে চুপ করে থাকা কি উচিত?"

গঙ্গা। "তোমার বাবার মতই দেখি তোমার মন। ঋণের কথা বল্লেই তিনিও এই সকল কথা বলে ধমক দেন। কিন্তু আমার ইচ্ছে হয় এমন কিছু করি যা'তে তিনি সুখী হন; তাঁর ঋণের এককণা শোধ হয়।"

নয়না জিজ্ঞাসা কল্লে "কখনও কি তিনি কিছু বলেন নি?"

গঙ্গা। "না! একবার মাত্র হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন, "তোমার কাছে আমার গুরুদক্ষিণা পাবার সময় হয়েছে।"

নয়না। "তুমি কি উত্তর দিয়েছিলে?"

গঙ্গা। আমি বলেছিলুম, "কি দক্ষিণা আজ্ঞা করুন, প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হ'বনা।"

নয়না। "তিনি শুনে কি বল্লেন?"

গঙ্গা। তিনি বল্লেন, "উত্তম! সময় হ'লে বল্‌ব।"

নয়না। "তবে অপেক্ষা করে দেখ, তিনি কি বলেন।"

গঙ্গাচরণ আর নয়নার মধ্যে যে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মেছে, নৌকারোহী পুরুষের তা' অবিদিত ছিল না। তিনি দেখ্‌তেন যে নয়না তাঁর চেয়ে গঙ্গাচরণের সঙ্গে বেড়াতে, তারি সঙ্গে গল্প কত্তে অধিক ভালবাসে। এদিকে নয়নার মনোমত কাজ কত্তে পাল্লে গঙ্গাচরণেরও সুখের সীমা থাকে না। নয়না মুখ ফুটে বল্‌বামাত্র সে, দূর বন থেকে, নূতন মধু সংগ্রহ করে আনে; জাল দিয়ে বড় বড় মাছ, ফাঁদ পেতে বুনো হাঁস, কখনওবা, হরিণের ছানা ধরে। তিনি ভাব্‌লেন, সুযোগ মত, দু'জনাকে মিলাবার ব্যবস্থা কর্ব্বেন।

একদিন কথাবার্ত্তায় গঙ্গাচরণ ও নয়না একটু গভীর বনে প্রবেশ করে-ছিল। মাঝে মাঝে বন্দুকের অওয়াজ হ'ত আর সর্ব্বদা আগুণ জ্বলত বলে সেখানে বাঘ বা মহিষের উপদ্রব ছিল না। দুজনে সেই জন্য নিশ্চিন্ত ছিল। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে মস্ত শিংওয়ালা একটা হরিণ দু'জনকে তাড়া কল্লে। পল্লীর অত নিকটে প্রায় হরিণ আস্‌ত না; বোধ হয়, দলপতি হরিণের আক্রমণে এটা দলছেড়ে বেরিয়েছিল। গঙ্গাচরণের কাছে কোন অস্ত্র, শস্ত্র ছিল না। সে, নয়নাকে সরিয়ে দিয়ে, হরিণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হরিণটা শিং বাগিয়ে, মাথা নীচু করে, আস্‌ছিল; ভেবেছিল শিং দিয়ে তাকে উল্টে ফেলে গুঁতুতে থাক্‌বে। কিন্তু গঙ্গাচরণ

আগে হ'তে, তার শিংদুটা ধরে, এমন চেপে রাখ্‌লে যে তার আর মাথা উঁচু কর্ব্বার শক্তি হ'ল না। বুনো হরিণের গায়ে অসাধারণ বল; দু'জনে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হ'ল। হরিণটা শিং ছাড়িয়ে নেবার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌ল। দু'এক বার গঙ্গাচরণের হাতে, পায়ে ঠোকর দিয়ে রক্ত বা'র কল্লে, কিন্তু শিং ছাড়িয়ে নেবার তার শক্তি হ'ল না।

নয়না একদিকে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে দেখ্‌ছিল আর ভাব্‌ছিল, বাবা যদি এসময় এখানে থাক্‌তেন, কোন ভাবনা হ'ত না। কিন্তু অধিকক্ষণ তা'কে উৎকণ্ঠিত থাক্‌তে হ'ল না।

গঙ্গাচরণ হরিণটাকে সজীব ধরে নিয়ে যাবে আশা করেছিল; কিন্তু বুঝলে তা সম্ভব নয়। তখন সে, শিং ধরে, তা'র ঘাড়টা এমন মুচড়ে দিলে যে হরিণটার জিব বেরিয়ে পড়্‌ল। দু'চারবার হাঁপ ছেড়ে, গোঁ গোঁ করে, সে একবারেই অসাড় হ'ল। তখন সেটাকে কেমন করে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হবে, দু'জনার সেই ভাবনা হ'ল। লোকজন ডাকবার জন্য গেলে শিয়ালে এসে টানাটানি কর্ব্বে; শিয়ালে মুখ দিলে কেউ মাংস খেতে চাইবে না। পায়ে দড়ী বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে ঘ্যাস্‌ড়ানিতে লোম উঠে যাবে, কাঁটা, খোঁচা ফুটে অমন সুন্দর চাম্‌ড়াটা নষ্ট হবে। গঙ্গাচরণ শ্রান্ত হয়েছিল, তার কপাল দিয়ে ঘাম পড়্‌ছিল। তবুও সে হরিণটাকে চাগিয়ে তুলে বল্লে;—"দু'মণের কাছাকাছি হবে। তা' হক্, একটু জিরিয়ে নিয়ে যাচ্চি।" নয়না বল্লে;—"তা' হবেনা। চারটা পা লতা দিয়ে বেঁধে, শুক্‌না ডাল মাঝে দিয়ে, এস দু'জনে কাঁধে নিয়ে যাই। তা' হলে তোমার কষ্ট কম হবে।" গঙ্গাচরণ বল্লে, "তোমার ত ভার বওয়া অভ্যাস নাই, তোমার যে কষ্ট হবে।" নয়না উত্তর দিলে; "তোমার সঙ্গে ভার বইতে আমার কষ্ট হবে না।" গঙ্গাচরণ তার প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী নয়; নয়নাও ছাড়ে না। এ দিকে সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছিল; বনের ভিতর আর থাকা ভাল নয় ভেবে গঙ্গাচরণ শেষে নয়নার কথায় মত দিলে।

গঙ্গাচরণ যতদূর পাল্লে ভারটা যাতে তার দিকেই বেশী পড়ে তেমনি করে কাঁধে তুল্‌লে। তারপর দু'জনে যখন হরিণটাকে নিয়ে উঠনে ফেল্লে, পাড়ার লোক দেখে অবাক্ হ'ল। হরিণ পেয়ে সকলেই খুসী। অত বড় হরিণ সচরাচর দেখা যায় না; পাড়াশুদ্ধ লোকের ভোগে লাগ্‌ল। নৌকারোহী, নয়নার মুখে সব শুনে, গঙ্গাচরণের পিট চাপ্‌ড়ে, নয়নাকে শুনিয়ে, বল্লেন; "দু'জনা যখন একসঙ্গে ভার বইতে শিখেছ, তখন গুরুদক্ষিণাটা দেবার ঠিক সময় হয়েছে।"

দিন পনর চলে গেল। নৌকারোহী গঙ্গাচরণকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলেন। কথায় কথায় বল্লেন;—"গঙ্গাচরণ। তুমি আমার পরিচয় জান্‌তে চেয়েছিলে। আজ আমি তোমাকে আমার পরিচয় দেব। কিন্তু তার আগে বল দেখি, কত বয়সের কথা তোমার মনে পড়ে?"

গঙ্গা। "চার বৎসর বয়সের কথা আমার সুস্পষ্ট মনে পড়ে।"

নৌ-হী। "তোমার একবার বিবাহের কথা হয়েছিল, সে কথা মনে আছে কি?"

গঙ্গা। "হাঁ! মনে আছে।"

নৌ-হী। "কোথায় বিবাহের কথা হয়েছিল?"

গঙ্গা। "সোনাইএর তুর্ল্ভরাম বসু মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে।"

নৌ-হী। "বিবাহ হল না কেন? সব কি স্থির হয়েছিল?"

গঙ্গা। "হাঁ! সব স্থির হয়েছিল। মা, বাবা দু'জনারই বড় ইচ্ছা ছিল, খুব আয়োজন হচ্ছিল; দশ বার দিনের মধ্যেই বিবাহ হ'ত। হঠাৎ তুর্ল্ভরাম বসু মহাশয়, তাঁর কন্যাকে নিয়ে, কোথায় চলে গিয়েছিলেন। কাজেই বিবাহ হয় নি।"

নৌ হী। "তুমি বল্লে যে তোমার বাবা, মা দু'জনারই খুব ইচ্ছা ছিল; তোমার কি ইচ্ছা ছিল না?"

গঙ্গাচরণের প্রকৃতি অতি সরল ছিল; সে অকুণ্ঠিতভাবে বল্লে; "হাঁ, আমারও খুব ইচ্ছা ছিল।"

নৌ হী। "তুমি ত তখন খুব ছোট ছিলে; মেয়েটীও দেখ নি, তবে তোমার অত ইচ্ছা হয়েছিল কেন?"

গঙ্গা। "আমাদের পঞ্জাবী দরোয়ান মর্দ্দানা সিং বল্‌ত যে দুর্ল্লভরাম বসু মহাশয়ের মত তলোয়ার চালনায় নিপুণ লোক তাদের দেশেও দেখা যায় না। তাই আমার মনে ইচ্ছা হ'ত, তিনি আমার শ্বশুর হ'লে, তলোয়ার ভাঁজার সমস্ত কৌশল তাঁর কাছে শিখে নেব।"

নৌ হী। "তলোয়ার ভাঁজা শেখা সম্বন্ধে এখন তোমার ইচ্ছাটা কি?"

গঙ্গা। "আপনি ত সবই শিখিয়েছেন; তবুও মনে হয়, দুর্ল্লভরাম বসু মহাশয়ের কাছে থাক্‌তে পাল্লে, হয়ত, আরও কিছু শিখ্‌তে পাত্তুম।"

নৌ হী। "বেশ কথা; তবে শোন্, আমিই দুর্ল্লভরাম বসু। আমার কন্যা নয়নার সঙ্গেই তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল। তার প্রকৃত নাম ত্রিনয়না; আমি আদর করে তাকে নয়না বলে ডাকি।"

গঙ্গাচরণের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে অবাক্ হয়ে দুর্ল্লভরামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। শেষে হাত যোড় করে বল্লে; "আমার অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন। আমি আপনাকে একবারমাত্র আশীর্ব্বাদের দিন দেখেছিলুম, সেই জন্য চিন্‌তে পারিনে। আপনি আমাকে দেখেই চিনেছিলেন, আর আমি এম্‌নি অকৃতজ্ঞ যে আপনাকে চিন্‌তে পাল্লুম না।"

দুর্ল্লভ। তা'তে অকৃতজ্ঞতা কি হল? তুমি তখন বালক ছিলে; আমি বিবাহের আশীর্ব্বাদ কত্তে গিয়েছিলুম বলে লজ্জায় মুখ তুলে চাইতে পার নি। তবে কেমন করে আমার চেহারা তোমার মনে থাক্‌বে?"

গঙ্গা। "এখন আমার সব মনে পড়্‌চে। আপনি আমার আঙ্গুলে হীরের আংটী আর হাতে সোণার বাজু পরিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা আমায় বলেছিলেন, "ইনি তোমার পিতৃস্থানীয় হ'লেন, এঁকে প্রণাম কর।"

বাবার কথা সত্য হয়েছে, পিতৃস্থানীয় হয়ে আপনি আমার রক্ষক, পালক ও শিক্ষক হয়েছেন।"

দুর্ল্লভ। "উত্তম। এখন আমার পাওনা গুরু-দক্ষিণাটা দাও, তা' হলেই আমি সুখী হই।"

গঙ্গাচরণ ব্যগ্রতার সঙ্গে বল্লে;—"কি দিব আদেশ করুন। প্রাণ দিতেও আপত্তি নাই।"

দুর্ল্লভরাম হেসে বল্লেন; "প্রাণ, টান কিছু দিতে হ'বে না। তা' যাকে দেবার তা'কে দিও। এখন দক্ষিণাটা এই যে আমার কন্যা ত্রিনয়নাকে তোমার বিবাহ কত্তে হবে।"

গঙ্গাচরণের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। সে ভাব্‌লে বিধাতার এ কি বিধান! কি অনুগ্রহ! যার রূপে, গুণে সে মুগ্ধ, যে তার প্রাণদাতার প্রাণাধিকা কন্যা, যার সঙ্গে তার বিবাহসম্বন্ধ মাতা, পিতা স্থির করেছিলেন, বিধাতা তাকেই তার পাত্রীরূপে উপস্থিত কল্লেন! এর চেয়ে তার আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে। আনন্দে তার চোকে জল এল; অধিক কথা বল্‌বার তার শক্তি রইল না। সে দুর্ল্লভরামকে প্রণাম করে বল্লে;—"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

দুর্ল্লভরাম প্রাণভরে তা'কে আলিঙ্গন কল্লেন।

এখন একটু পূর্ব্বকথার আলোচনা আবশ্যক। মোগল ফৌজদারের ভয়ে দুর্ল্লভরাম যে দেশত্যাগী হয়েছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। তিনি শিকার কর্‌বার জন্য প্রতি শীতঋতুতে সুন্দরবনে আস্‌তেন। সুন্দরবনের নদী দিয়ে মগ আর পর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ কত্তো। মোগলেরা তাদের ভয়ে, বড় দল না বেঁধে, এই অঞ্চলে আস্‌তে সাহস কত্তো না; কিন্তু সুন্দরবনের ছোট ছোট নদী নালার ভিতর দিয়ে বড় জাহাজ, বড় দল আস্‌তে পাত্তো না। সুতরাং সেখানে মোগলের থানা, ফাঁড়ী, শাসন কিছুই ছিল না। দুর্ল্লভরাম সেই জন্য সুন্দরবনে থাকাই নিরাপদ্ মনে

করেছিলেন। তিনি কোথায় গিয়েছেন লোকে যা'তে জান্‌তে না পারে তারি জন্য, মাঝে মাঝে নৌকা বদল করে, তিনি সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। একটী যায়গায় ভদ্রলোকের বাস অধিক ছিল না; পঞ্চাশ, ষাট ঘর বুনোর বাস ছিল। তারা তীর ধনুকে বনের হরিণ মেরে, জালে নদীর মাছ ধরে, দু'দশ বিঘা জমি আবাদ করে, স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে কাটাত। তারা সাঁওতাল, ভীল, কুকি প্রভৃতি কোন অনার্য্য জাতির অন্তর্গত ছিল না, নিজেরাই একটা স্বতন্ত্র জাতি ছিল। হিন্দুর অখাদ্য মুর্গী, মুসলমানের অখাদ্য শূকর খেত; আবার হিন্দু মুসলমানের পূজিত দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর, পীর বড়খানগাজীর পূজা দিত। এই বুনো জাত সুন্দরবনের স্থানে স্থানে এখনও বাস করে। নিরক্ষর হলেও তা'দের মনটা অতি সরল; কেউ একটী মিষ্ট কথা বল্লে তারা গলে যায়; প্রাণ দিয়েও উপকারীর উপকার করে। দুর্ল্লভরাম যখন শিকার কত্তে সুন্দরবনে আস্‌তেন, তখন হরিণ, বরা মেরে তাদের খেতে দিতেন। তাদের মেয়েরা লাল পলাকাঁটা, আঁচলা দেওয়া জোলার বাড়ীর কাপড় ভাল-বাসে জেনে তিনি তা' সঙ্গে আন্‌তেন, আর যাবার সময় বিতরণ করে যেতেন। এই জন্য বুনো স্ত্রীপুরুষ সকলেই তাঁকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাস্‌ত। তিনি যে ক'দিন বুনোদের গ্রামে থাক্‌তেন তাদের যেন উৎসব হ'ত। তিনি তাদের মধ্যে বাস কর্ব্বেন শুনে তা'দের আনন্দের সীমা রইল না। দু'এক ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থও ছিল। কেউ মহাজনের দেনার ভয়ে, কেউ বা কোন দুষ্কর্ম্ম করে, সেখানে, আশ্রয় নিয়েছিল। দুর্ল্লভরাম নিজের গুণে সকলকেই বশীভূত রেখেছিলেন। তিনি রোগে ঔষধ দিতেন, অভাবে সাহায্য কত্তেন, আবার দুর্ব্যবহারে তীব্র শাস্তি দিতেন। আস্‌বার সময় তিনি অনেক টাকা সঙ্গে এনেছিলেন। ব্যয় অতি সামান্যই ছিল, সুতরাং তাঁর অর্থাভাব ছিল না। বুনোদের বল ও সাহস ছিল; তিনি তা'দিগকে শিখিয়ে নিপুণ তীরন্দাজ ও লাঠিয়াল

করেছিলেন। কেউ এসে যে হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ কর্‌বে সে সম্ভাবনা ছিল না। তিনি নিশ্চিন্তমনে মেয়েটীকে নিয়ে বাস কত্তেন। গঙ্গাচরণের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিব এই তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। গঙ্গাচরণকে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে সেই বৎসর ভাসিয়ে দেওয়া হবে, অনুসন্ধানে জেনে, তিনি পৌষ-সংক্রান্তিতে নৌকা নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের বজ্‌রা দেখে তিনি একটু দূরে অপেক্ষা কচ্ছিলেন। তার পর যা' ঘটেছিল পাঠক অবগত আছেন। আগে বলেছি যে বুনোপাড়ায় দু'এক ঘর ভদ্রলোক ছিল। এক ব্রাহ্মণ, ঋণদায়ে পলাতক হয়ে, সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি পূর্ব্বে যজন, যাজন কত্তেন। দুর্ল্লভরাম বল্‌বামাত্র তিনি নয়নার বিবাহে পুরুতের কাজ কত্তে সম্মত হলেন। বুনোরা নয়নাদিদির বিবাহ হবে শুনে, মহানন্দে, যার যেমন শক্তি, আয়োজনে সাহায্য কল্লে। কেউ কাঠ ভেঙ্গে আন্‌লে, কেউ নদী থেকে বড় বড় মাছ ধল্লে, কেউ পালিত মহিষের দুধ, ঘি, কেউ ক্ষেতের লাউ, কুমড়া, বেগুণ এনে দিলে। দুর্ল্লভরাম নয়নার বিবাহের জন্য যে বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি প্রস্তুত করেছিলেন তা তাঁ'র সঙ্গেই ছিল। সুতরাং আয়োজনের কোন ত্রুটিই হ'ল না। বুনোরাই বরযাত্রী, বুনোরাই কনেযাত্রী দুই হ'ল। দুর্ল্লভরাম সুন্দরবনে যা' কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্য পাওয়া যায় সংগ্রহ করে তা'দিগকে খাওয়ালেন। মেয়েদের আঁচলাদার শাড়ী, ছোট ছেলেদের লাল কোর্‌তা দিলেন। তা'দের আনন্দ দেখে কে? বাকী ছিল কেবল নাচ, গান। বুনোরা আর বুনোর মেয়েরা নয়নাদিদিকে ঘিরে সে অভাবও পূরণ কল্লে। দুর্ল্লভরামের সাধ পূর্ণ হল; গঙ্গাচরণ আর নয়না পরস্পরকে পেয়ে কৃতার্থ হ'ল। পৃথিবীর সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল না; বনের মধ্যে সেই ছোট পল্লীটী তাদের কাছে স্বর্গ বল্পে বোধ হ'ল। তা'দিগকে সুখী দেখে দুর্ল্লভরামের সুখের সীমা রইল না।

বুনোপাড়ায় কথা কইবার মত লোক ছিল না বলে দুর্ল্লভরাম মেয়ে

জামাইকে নিয়ে সন্ধ্যার পর নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কইতেন। ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা, রামায়ণ মহাভারতের কথা নানা বিষয়ে গল্প হ'ত। কিন্তু তাঁর প্রধান কথার বিষয় ছিল বাঙ্গালীর শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা। এত বুদ্ধি থাক্‌তেও বাঙ্গালী যে এত অধম হয়ে রয়েছে তা'র একমাত্র কারণ বল, বীর্য্য, ও সাহসের অভাব। তিনি বল্‌তেন ;—"একশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে জন্মেছিলেন একটীমাত্র মানুষ। তিনি হ'লেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য। মোগলদের দেশছাড়া কর্ব্বার যোগাড় করেছিলেন, কিন্তু জাত, জ্ঞাত কা'রও তেমন সাহায্য পেলেন না; কাজেই শেষে হেরে গেলেন। যে জাত, ছেলেবেলা থেকে, কেবল ননীর পুতুলটী হ'বার মত আদর্শ পেয়ে আস্‌চে, তারা কি কখনও মানুষ হ'তে পারে? যাত্রার গোষ্ঠলীলায় গান হয় যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে গরু চরাতে যাবেন; এতেই মা যশোদা কেঁদে আকুল। পাছে তাঁর ননীর পুতুলের গায়ে রোদ লাগে, গায়ে কাঁটা, খোঁচা ফোটে। এই গান শুনে বাঙ্গালী শ্রোতা মোহিত হন, ধন্য ধন্য বলেন। ধিক্ ধিক্! মনে হয়না পুরুষবাচ্ছা বাঘের সাম্‌নে দাঁড়াবে, বাণের মুখে নৌকায় পাড়ী দেবে। মা হ'য়ে যদি এমন ছেলে তয়ের কর্ত্তে না পাল্লে, তবে গর্ভে ধরে কেন? মায়ের মত মা ছিলেন বটে কুন্তী। নিজের ছেলেকে দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের মুখে পাঠিয়ে দিলেন। যত দিন বাঙ্গালী মা, এই কুন্তী ঠাকুরাণীর মত, নিজের ছেলেকে অত্যাচার, অবিচার দমনের জন্য পাঠাতে না পার্ব্বে, তত দিন এ জাতের লাঞ্ছনা ঘুচ্‌বে না। ব্যাসদেব যশোদা আর কুন্তী দু'য়েরই কথা লিখেছেন, কিন্তু, বাঙ্গালাদেশের জল বাতাসের গুণে, ঘরে ঘরে মা যশোদাই দেখ্‌তে পাই, কুন্তী মা'র দেখা পাই না। বাঙ্গালী মা মনে করেন ছেলেটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখ্‌লেই তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হ'ল। দ্যাখ্ নয়না! তুই যদি কখনও মা হ'স্ তবে মা যশোদা হ'স্‌নে, কুন্তী মায়ী হ'স্।"

নয়না বল্‌ত ;—"বাবা ! তুমি সেই আশীর্ব্বাদ কর, যেন পরের জন্য নিজের ছেলে দিতে পারি।" বাঘের দেশ সুন্দরবনের মধ্যে বাস করেও দুর্ল্লভরাম এইরূপে মেয়ে, জামাই নিয়ে সুখে ছিলেন।

কিন্তু মানুষের ভাগ্যে অবিচ্ছেদ সুখ ঘটে না ; ঘট্‌বার নয়। তাই, নয়নার সন্তান হ'বার পূর্ব্বেই, দুর্ল্লভরাম দেহত্যাগ কল্লেন। মৃত্যুর কয় দিন পূর্ব্বে তিনি গঙ্গাচরণকে ডেকে বল্লেন ;—"বাবা ! আমার শেষ দিন আস্‌চে ; তোমাকে গুটী কত কথা বলি, মনে রেখ। আমি বাধ্য হয়ে এই বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলুম। ত্রিনয়নার বিবাহ দেওয়া ছাড়া আমার অপর সাংসারিক কর্ত্তব্য ছিল না। তোমাদের দু'জনার কোষ্ঠী মিলিয়ে তোমারই সঙ্গে বিবাহ দেব এই আমার সাধ ছিল ; বিধাতা সে সাধ পূর্ণ করেছেন ; আমি নিশ্চিন্ত মনে মর্‌ব। তোমাদের কিন্তু দীর্ঘকাল এ বনে বাস করা চল্‌বেনা। তোমার ছেলেমেয়ে হবে ; তা'দের লেখা-পড়া শেখাতে, বিবাহ দিতে হবে। কাজেই তোমার পক্ষে লোকালয়ে বাস আবশ্যক। কিন্তু তুমি কোথায় যাবে ? পিতার নিকট তোমার স্থান হ'বে না। ভাসান ছেলেকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। যেখানেই যাবে, এই ভাসান অখ্যাতির জন্য, লোকে তোমায় অবজ্ঞা কর্ব্বে, হয়ত তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা কত্তে চাইবে না। এরূপ অবজ্ঞাত হয়ে তুমি কোথাও থাক আমার তা' ইচ্ছা নয়। আমি চাই, তোমরা যেখানেই থাক্‌বে, যেন সকলেরই ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হও। এর উপায় আমি ভেবেছি। পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীরা আজকাল বাঙ্গালা দেশে বড় উৎপাত আরম্ভ করেছে। তারা জোর করে লোককে ঈশামসি ভজায়, ছোট ছোট ছেলে ধরে নফর করে রাখে ; হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মস্‌জিদ্‌, বণিকের ধন, নারীর মর্য্যাদা কিছুই তাদের হাতে রক্ষা পায় না। মোগল বাদসাহ, তাঁর মহিষী, বাঙ্গালার সুবাদার সকলেই তা'দের ধ্বংসের জন্য ইচ্ছুক। কিন্তু তারা জাহাজে ক'রে কোন্ পথে আসে, কোন্ পথে যায় জান্‌তে পারেন না বলে

কেউ এপর্য্যন্ত তাদের শাসন কত্তে পারেন নি। এই সুন্দরবনের নদীগুলিই তাদের যাতায়াতের প্রধান পথ ; এ পথ না জান্‌লে কেউ তাদের শাসন কত্তে পার্ব্বেনা। হিন্দু মুসলমানের মহাশত্রু এই পর্ত্তুগীজদের দমন কিন্তু একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমি মোগলদের সাহায্য কত্তে পাত্তুম, কিন্তু আমার উপর ঢাকার ফৌজদারের যেরূপ আক্রোশ, তা'তে সে আমাকে দেখ্‌তে পেলেই ধরে শূলে দিত। তোমার উপর সেরূপ আক্রোশের কোন কারণ নাই। এই কয় বৎসর সুন্দরবনে বাস করে তুমি এখানকার জলপথগুলি সব দেখেছ। আরও যত্নের সঙ্গে দেখ্‌তে আরম্ভ কর। বিদ্যাধরী, বলেশ্বর, রায়মঙ্গল, সোত্তরমুখী, বুড়মন্তেশ্বর প্রভৃতি ছোট বড় যত নদী আছে, সকলগুলির অবস্থা, কোন্‌টীতে জোয়ারের জল কতদূর পর্য্যন্ত যায়, কতক্ষণ থাকে, কোন্‌টীতে চড়া, চোরাবালি কিরূপ তন্ন তন্ন করে দেখ। তারপর মোগল জাহাজের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সেই সকল সংবাদ দিও। প্রয়োজন বুঝ্‌লে তাঁকে যুদ্ধে সাহায্য করো। অসি-যুদ্ধে তোমার সমতুল্য লোক অধিক নাই ; তোমার হাতের তাগ অব্যর্থ। দু' এক দিনের পরীক্ষাতেই সন্তুষ্ট হয়ে মোগলেরা নিশ্চিত তোমার সাহায্য নেবে। তোমার সাহায্যে যদি পর্ত্তুগীজ দমন হয়, স্বয়ং বাদসাহ হ'তে সাধারণ প্রজা সকলেই তোমাকে আদর কর্ব্বেন। রাজা যা'কে সম্মান করেন, সকলেই তাকে সম্মান করে। তখন তোমার যেখানে ইচ্ছা হবে, সেখানেই গিয়ে বাস কত্তে পার্ব্বে। ভাসান কলঙ্কটা চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে। আমার এই কথাগুলি মনে রেখ। ভগবান্ তোমাদিগকে সুখে রাখুন।"

দুর্ল্লভরাম এর এক সপ্তাহ পরেই দেহত্যাগ কল্লেন। বুনোপাড়ায় শোকের ঝড় বইল। বুনোরা দুর্ল্লভরামকে দেবতার মত ভক্তি কর্‌ত ; এক সঙ্গে তাঁকে পিতা, প্রভু ও গুরুর স্থান দিয়েছিল। কে এখন তা'দের শাসন, পালন কর্ব্বেন এই তা'দের চিন্তা হল। তবে, বড় ঠাকুর স্বর্গে

গেলেও, ছোট ঠাকুর যে তা'দের কাছে রইলেন, এটা তাদের কিঞ্চিৎ শান্তির কারণ হ'ল। তারা ক্রমে গঙ্গাচরণকে দুর্ল্লভরামের স্থানীয় জ্ঞান কল্লে। নয়নার অল্পবয়সে মাতৃবিয়োগ হয়েছিল, দুর্ল্লভরাম, একসঙ্গে, তার মা, বাপ ছিলেন; নয়না বড় কাতর হ'ল; গঙ্গাচরণও আপনাকে পিতৃহীন জ্ঞান কল্লে। কিন্তু মৃত্যু ত নিবারণ কর্‌বার নয়, শোক কল্লে ত মরা মানুষ ফিরে আসে না; কাজেই দু'জনে, পরস্পরের মুখ চেয়ে, সংসারধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হলেন।

বলেছি যে সুন্দরবনের সেই পল্লীটী গঙ্গাচরণ ও নয়নার কাছে স্বর্গপুরীর মত হয়েছিল। চারদিকে নিবিড় বন, বনের গাছগুলাও তেমন সুন্দর নয়। সেখানে চাঁপা, বকুল ফুট্‌তনা, আমের মুকুল হ'তে মধুধারাও ঝর্‌ত না। সেখানে ছিল কেবল বনঝাউ, ক্যাওড়া, বাণী, খল্‌সি আর হোগলপাতার গাছ। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে সেঁয়াকুল, হেঁতাল আর হড়কোচের ঝোপ। সেখানে দয়েল কোকিলের স্বর অপেক্ষা মাছমৌরল আর বনমোরগের কর্কশ কণ্ঠই অধিক শোনা যেত। এক এক দিন গভীর রাত্রে, বাঘের ডাক শুনে, মনে হত যে উঠনেই বাঘ এসেছে। বর্ষাকালে চন্দ্রবোড়া, শিখরচাঁদা সাপ ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিত। সুতরাং কবিদের কল্পনাসৃষ্ট স্বর্গ সেখানে ছিল না। কিন্তু নয়না আর গঙ্গাচরণ তারি মধ্যে স্বর্গপুরী সৃজন করেছিল। তারা ভাব্‌তে পাত্তোনা যে হুনোপাড়া হ'তে স্বর্গ কিছু অধিক সুখের হ'তে পারে? স্বর্গ ত আকাশে নয়, পৃথিবীতেও নয়; জলে, স্থলে, শূন্যে কোথাও নয়; স্বর্গ মানুষের নিজের প্রাণের মধ্যে। প্রাণে যদি শান্তি থাকে, তৃপ্তি থাকে, স্বর্গ বাহিরের কোথাও খুঁজ্‌তে হয় না। ভাঙ্গা কুঁড়ের মধ্যে তখন ইন্দ্র-পুরী দেখা দেয়, কাঁটা ঝোপের মধ্যে তখন নন্দনবন বিরাজ করে। গঙ্গা-চরণের ও নয়নার প্রাণে শান্তি ও তৃপ্তি ছিল বলেই তারা সেই বনবাসেও স্বর্গসুখ ভোগ কচ্ছিল। বসন্তকালে ক্যাওড়াফুলের সৌরভে, বর্ষায় কেয়া-ফুলের গন্ধে বন আমোদিত হত; তা'তেই তা'দের কত আনন্দ। নূতন

মধু, বুনোদের পালিত মহিষের দধি, দুগ্ধ, ঘৃত কি উপাদেয়! জোলার বোনা মোটা কাপড়ে কেমন শীত নিবারণ করে। তবে আর অভাব কি? তার উপর প্রাণে প্রাণে যোগ, একসঙ্গে কাজ, একসঙ্গে বিশ্রাম, একসঙ্গে ইষ্টদেবতার নামকীর্ত্তন, মুহূর্ত্তের জন্য কেউ কা'রও সঙ্গ ছেড়ে থাকৃত না, তবে অশান্তি, অতৃপ্তি কিরূপে আস্‌বে? কাজেই বনের মধ্যে তারা স্বর্গপুরী পেয়েছিল। গঙ্গাচরণ বা নয়না কেউ শিক্ষিত বা শিক্ষিতা ছিল না। কিন্তু দাম্পত্যসুখ ত শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। গঙ্গাচরণ জান্‌ত নয়নার মত গুণবতী নারী, আর নয়না জান্‌ত গঙ্গাচরণের মত গুণবান্ পুরুষ এ পৃথিবীতে নাই। এই বিশ্বাসই উভয়কে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধান্বিত রেখেছিল। যে দম্পতীর মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস থাকে, তাঁরা সর্ব্বত্রই স্বর্গপুরী গঠন কত্তে পারেন।

দুর্ল্লভরাম পর্ত্তুগীজ দমনে মোগলদের সাহায্য কর্ব্বার জন্য গঙ্গাচরণকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার জন্য আপনাকে প্রস্তুত কত্তে লাগ্‌লেন। সুযোগ পেলেই, এ নদী, ও নদী ঘুরে, তিনি সুন্দরবনের জলপথ গুলো বেশ বুঝে নিলেন। সেই সঙ্গে তিনি স্বেচ্ছায় আরও একটা কাজের ভার নিলেন। যাত্রীর নৌকা লুট্‌বার সুবিধা হবে বলে পর্ত্তুগীজেরা পৌষসংক্রান্তির সময় সাগরদ্বীপের আশে পাশে ঘুরে বেড়াত; তা'দের গতিবিধি বোঝ্‌বার জন্য গঙ্গাচরণও তাদের সঙ্গ নিতেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি ভাসান ছেলেগুলিকে বাঁচাবার চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন। অনেক সময় তিনি ভাসান পর্য্যন্ত অপেক্ষা কত্তেন না; যাত্রীর নৌকা দেখ্‌লেই দল বল নিয়ে তার উপর গিয়ে পড়্‌তেন। কারু একটী পয়সার জিনিষও তিনি ছুঁতেন না; কেবল যে ছেলেটীকে ভাসাতে নিয়ে যাওয়া হ'ত সেইটীকে কেড়ে নিয়ে বাকী সকলকে ছেড়ে দিতেন। কেউ বাধা দিতে এলে রক্তারক্তি হ'ত; ছেলের মা বাপও প্রহার থেকে নিস্তার পেতেন না। তিনি বল্‌তেন;—"মা গঙ্গার উৎপত্তি শ্রীবিষ্ণুর চরণে, বাস ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে,

তিনি মহাদেবের গৃহিণী, পতিতোদ্ধারিণী। তাঁর তৃপ্তির জন্য নির্দ্দোষ শিশুর প্রাণনাশ! এর চেয়ে অধর্ম্ম আর কি হ'তে পারে? যে মা, বাপ এমন অধর্ম্ম করেন, তাঁদের একটু শিক্ষা হওয়া ভাল" প্রতিবৎসর তিনি এইরূপে দু'চারটী শিশুকে রক্ষা কত্তেন। তখন সুন্দরবন অঞ্চলে গাঙ্গ ডাকাতের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। পর্ত্তুগীজেরা, মগেরা আর সেই সঙ্গে চাটগাঁয়ের লোকেরা, সুবিধা পেলেই, যাত্রী নৌকা, মহাজনী ভড় মারত। এই সকল ডাকাতদের বেশভূষা ও ব্যবহার দেখে লোকে তাদের স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র নাম দিয়েছিল। পর্ত্তুগীজদের নাম ছিল টুপিওয়ালার দল, মগেদের নাম ছিল কাণফোঁড়া'র দল, গঙ্গাচরণের দলের নাম হ'ল ছেলেধরার দল; কারণ ছেলে ভিন্ন কারু কোন দ্রব্য তিনি স্পর্শ কত্তেন না। গঙ্গাচরণ শিশুগুলিকে উদ্ধার করে নয়নার হাতে দিতেন; নয়না মায়ের মত যত্নে তাদের পালন কত্তেন। সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে নয়না এইরূপে বহু পুত্রের জননী হ'লেন।

ছেলেধরা কাজটা, সকল সময়, যে নির্ব্বিবাদে হত না, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। একদিনের একটা ঘটনা বর্ণনা কচ্ছি। পাটনা অঞ্চলের এক লালা জমিদার তাঁর ছেলেটীকে ভাসাবার জন্য এসেছিলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, লোকজন আর তিন বৎসরের একটা শিশু; সেইটীকে ভাসান হবে। ছেলেটী দেখ্‌তে কার্ত্তিকের মত; যেমন রঙ, তেমনি গড়ন; শত্রুও তাকে দেখ্‌লে কোলে না নিয়ে থাকৃতে পারে না। লালাজী সংক্রান্তির চার পাঁচ দিন আগে এসে পঁহুছেছিলেন। তাঁর নৌকায় পালোয়ানী ডন, বৈঠক থেকে নাচ, গান, আমোদ, প্রমোদ পূর্ণ মাত্রায় চল্‌ছিল। লালাজীর স্ত্রী, কিন্তু, ছেলেটীকে বুকে নিয়ে, দিন রাত বিছানায় শুয়ে পড়ে থাক্‌তেন। তাঁর আহার, নিদ্রা ছিল না; কেঁদে কেঁদে চোখ, মুখ ফুলে উঠেছিল। ছেলেটীকে দেখে গঙ্গাচরণ তাকে বাঁচাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। কিন্তু লালাজীর নৌকা সঙ্গমের চড়ায় অন্য বহু নৌকার মধ্যে বাঁধা ছিল

বলে আক্রমণের সুযোগ পান্‌নি, অবসর খুঁজছিলেন। সংক্রান্তির দু'তিন দিন পূর্ব্বে, ভোরের সময়, লালাজীর নৌকা থেকে শোনা গেল যে তাঁর স্ত্রী, শিশুটীকে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়েছেন; তাঁদের সঙ্গে নৌকার একজন দাঁড়ীও কোথায় চলে গিয়েছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সকলেই নৌকায় ছিলেন; তারপর, অন্য সকলে ঘুমিয়ে পড়্‌লে, তিন জনে পালিয়েছেন। নৌকার আর এক জন দাঁড়ী বল্‌লে যে সে লালাজীর স্ত্রীকে পলায়িত দাঁড়ীর সঙ্গে, মাঝে মাঝে, গোপনে কথা কইতে দেখেছে। শুনে লালাজীর সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল; তিনি প্রতিজ্ঞা কল্লেন, দেশে গিয়ে সেই দাঁড়ীর ঘরে আগুন দেবেন। প্রজা হয়ে তার এত বড় আস্পর্দ্ধা! এমন সময় সেই দাঁড়ী ফিরে এল। মারের চোটে সে স্বীকার কল্লে যে সে লালাজীর স্ত্রীকে ডিঙ্গীতে করে এক বনের মধ্যে রেখে এসেছে। লালাজীর স্ত্রী তা'কে নিজের সোণার হাঁসুলি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, শিশুটীকে বাঁচাবার জন্য, যদি সে তাঁকে অন্য কোথায়, বন জঙ্গল যেখানে হ'ক, রেখে আস্‌তে পারে, তবে তিনি সেই হাঁসুলি তাকে পুরস্কার দেবেন। পুরস্কারের লোভেই সে এই কাজ করেছে। ভেবেছিল অন্য কেউ জেগে ওঠবার আগেই ফিরে আস্‌তে পার্ব্বে, তাই নৌকার সঙ্গে যে ছোট ডিঙ্গী থাকে তাই নিয়ে গিয়েছিল। লালাজী, শোন্‌বামাত্র, তাকে সেই ডিঙ্গী নিয়ে, তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য আদেশ দিলেন। পাছে দু'জনে বাঘের মুখে পড়েন তাঁর এই ভাবনা হ'ল; কাযেই বড় নৌকায় গেলেন না। বড় নৌকার নোঙ্গর তুলে হাল, দাঁড় ঠিক কর্‌তে বহু সময় যাবে। তাঁর সঙ্গে তাঁর দু'চার জন আত্মীয় ডিঙ্গীতে উঠ্‌ল। যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থাতেই চল্‌ল; কা'রও কাপড় চোপড় গায় দিবার সময় হ'ল না। গঙ্গাচরণ নিকটেই ছিলেন; শোন্‌বামাত্র, নিজের ছোট পানশীতে ভীমরু বলে এক দাঁড়ীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের পিছু পিছু চল্লেন। তখন রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়েছিল; লালাজীর ডিঙ্গী দেখে সঙ্গে যাওয়ার কোন অসুবিধা

হ'ল না। লালাজীর ডিঙ্গী একটু আগে পঁহুছিল। তিনি আর তাঁর সঙ্গীরা পলায়িতা মাতা ও শিশুটীকে খুঁজতে আরম্ভ কল্লেন। দাঁড়ী তাঁদিগকে যেখানে রেখেছিল, তাঁরা সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে একটু দূরে গিয়ে পড়েছিলেন। লালাজীর স্ত্রী শুনেছিলেন, বনের মধ্যে মুনিঋষিদের আশ্রম থাকে ; তা'ই ভেবেছিলেন, যদি কোন ঋষির আশ্রমে যেতে পারেন, তাঁর শিশুটীর প্রাণরক্ষা হ'বে। কিন্তু অন্ধকারে বনের মধ্যে ঘুরতে না পেরে একটী গাছের তলায় শিশুটীকে আঁচলে ঢেকে শুয়ে পাড়ছিলেন। শিশিরে কাপড় ভিজে গিয়েছিল, ঠাণ্ডা বাতাসে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়ে তুল্‌ছিল, কারও জ্ঞানমাত্র ছিল না। তাঁদিগকে দেখ্‌তে পেয়ে লালাজীর সঙ্গের লোকেরা চীৎকার করে উঠ্‌ল। তা'দের মূর্ত্তি আর তা'দের ব্যবহার ক'দিন যাবৎ দেখে গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হয়েছিল যে তারা বিনাযুদ্ধে শিশুটীকে দেবে না। তারা চার পাঁচজন একদিকে, অপরদিকে তিনি আর ভীমরু দু'জন মাত্র। তথাপি যুদ্ধের পরিণাম কি হ'বে তা' তিনি জান্‌তেন। দুর্লভরামের শিক্ষায় ভীমরু একজন পাকা লাঠিয়াল হয়েছিল। আর তার চেহারাটা "ভীমরু" শব্দ থেকে "রু"টা বাদ দিলে যা' থাকে তাঁরই মত ছিল। তিনি কৌতুক দেখ্‌বার জন্য বল্লেন ;

"ভীমরু! ওরা চার পাঁচজন, আমরা দু'জন মাত্র, এশুব না ফিরে যাব ?"

ভীমরু বল্লে ;—"ছোট ঠাকুর ! কখনও ত ফির্‌বার কথা বলনি, আজ ওকথা বল্‌চ কেন ?"

গঙ্গাচরণ। "দেখিস্‌নে ওরা যে সব পশ্চিমে পালোয়ান, ডালরুটী খায়, মুগুর ভাঁজে ? আমরা ভেতো বাঙ্গালী, ওদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব কি ? চল্‌ ফিরি "

ভীমরু। "ফির্‌তে হয় তুমি ফের ; ভীমরু রক্ত না দেখে ফির্‌বে না। বড় ঠাকুর যে আসমান থেকে দেখ্‌ছেন।"

গঙ্গাচরণ বল্লেন,—"তবে এস! তেরি মেরি করে ত সুন্দরবনের ছাটা মুগুরের আস্বাদটা ভাল রকম বুঝিয়ে দিও।"

এদিকে লালাজী আর তাঁর সঙ্গীরা মৃতপ্রায় মাতাকে তুলে প্রথমেই তাঁর কোল থেকে শিশুটীকে কেড়ে নিলেন। লালাজী নিজে স্ত্রীর চুল ধরে টেনে তাঁকে বন থেকে বার কর্ব্বার চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই বেরুতে চাইলেন না। কখনও মাটীতে পড়ে, কখনও কোন গাছ জড়িয়ে ধরে রইলেন। এই সময় গঙ্গাচরণ আর ভীমরু, বিকট ডাকাতী কুঁকি দিয়ে, সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে সদল লালাজী থম্‌কে দাঁড়ালেন। গঙ্গাচরণ হাত জোড় করে তাঁকে বল্লেন;—"লালাজী! আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যান, শিশুটীকে ভাসিয়ে না দিয়ে আমায় দিন। আমিও আপনার মত কায়স্থ; আমি তাকে নিজের ছোট ভাইএর মত যত্নে মানুষ কর্‌ব।"

লালাজীর রক্ত তখন গরম হয়েছিল। তিনি বল্লেন;—"ভাগো শালা ডাকু! এক ঘুঁসিসে তোম্‌রা দাঁত তোড় দেঙ্গে।"

গঙ্গাচরণ পূর্ব্বের মত বিনয়ের সঙ্গে বল্লেন;—"শিশুটীকে আগে দেন, তারপর দাঁত তুড়্‌বেন।"

লালাজী উত্তর না দিয়ে গঙ্গাচরণের মুখে সবলে একটা ঘুঁসি মাল্লেন। গঙ্গাচরণ বুঝ্‌লেন ঘুঁসিটা কাঁচি ওজনের নয়, পাকা আশী সিক্কার বটে। তখন তিনি একবার ভীমরুর দিকে চাইলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে লালাজীর টিকি সমেত লম্বা চুলের গোছা বাঁ হাতে ধরে ঘুঁসির পর ঘুঁসিতে তাঁর নাক, কাণ, চোক বিরাটরাজার শ্যালক কীচকের মত করে তুল্লেন। নিজে একজন পালোয়ান বলে লালাজীর একটু দর্প ছিল। দু' একবার পালোয়ানি কায়দায় পায়ে পায়ে বেড় দিয়ে, বুকে, পিঠে থাপ্পড় মেরে গঙ্গাচরণকে কাবু কর্ব্বার চেষ্টা কল্লেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝ্‌লেন মহিষের সঙ্গে লড়্‌তে গিয়ে মেষের যে অবস্থা হয়, তাঁর সেই অবস্থা হচ্চে। এদিকে

গঙ্গাচরণের ছেলেদের

ভীমরুর ছাটা মুগুরও বৃষ্টিধারার মত লালাজীর সঙ্গীদের পিটে পড়্ছিল। সে মুগুরের আঘাতে ভীমরু কতবার বনের মহিষ ফিরিয়েছে; মানুষত কোন্ ছার! লালাজীর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ ধরাশায়ী হলেন, কেউ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্লেন, কেউ প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগ্লেন। লালাজীর যুদ্ধসাধ তখনও মেটেনি দেখে গঙ্গাচরণ তাঁকে মাটীতে ফেলে, তাঁর বুকের উপর বসে, এমন গলা টিপুনী দিতে আরম্ভ কল্লেন যে লালাজীর নিঃশ্বাস রোধ হ'বার উপক্রম হ'ল; সেই পৌষমাসের শীতেও তাঁর সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠ্ল। তিনি অতি কষ্টে অস্পষ্ট ভাষায় বল্লেন;—"সর্দ্দার! ছোড় দিজিয়ে, ছোড় দিজিয়ে"।

গঙ্গাচরণ বল্লেন;—"ছাড়িব। আগে গঙ্গামায়ীকা নাম নিয়ে শপথ করুন, স্ত্রীর উপর অত্যাচার কর্ব্বেন না তবে ছাড়্ব। নচেৎ আর একটী টিপুনীতে দফা রফা করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাব।" এই সময় লালাজীর স্ত্রী, স্বামীর দুর্দ্দশা দেখে, ছুটে এসে, গঙ্গাচরণের পা জড়িয়ে ধরেছিলেন। লালাজীর'ও দফা রফা হ'বার উপক্রম হয়েছিল। গঙ্গাচরণ একটু আল্‌গা দিলে তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে গঙ্গামায়ীকা নাম নিয়ে শপথ কল্লেন। গঙ্গাচরণ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর শিশুটীকে কোলে নিয়ে লালাজীর স্ত্রীকে বল্লেন; "মায়ি! আজ থেকে তোমার এই বাচ্ছা আমার হ'ল। কোন ভাব্না নাই, আমি একে নিজের ছোট ভাইএর মত মানুষ কর্ব্ব।"

লালাজীর স্ত্রী কোন উত্তর দিলেন না; ভয়ে ভয়ে তাঁকে একটা নমস্কার কল্লেন। গঙ্গাচরণ তখন লালাজীকে বল্লেন;—"আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ডিঙ্গীতে উঠুন, তারপর আমি বিদায় নেব।"

বল্‌বামাত্র লালাজী, গায়ের কাদামাটী মুছে ফেলে, স্ত্রী আর সঙ্গীদের নিয়ে, ডিঙ্গীতে উঠ্লেন। গঙ্গাচরণও সঙ্গে সঙ্গে শিশুটীকে কোলে নিয়ে নিজের পান্‌সীতে চড়্লেন। ভীমরুর হাতের দাড়

দু' চার বার পড়্‌তে পড়্‌তেই তাঁর পান্‌সী পৌষমাসের কোয়াসায় অদৃশ্য হ'ল।

গঙ্গাচরণ যখন দেখ্‌লেন যে পথ, ঘাট সমস্ত তাঁর পরিচিত হয়েছে, তখন তিনি পর্ত্তুগীজদের চলাফেরা বোঝ্‌বার চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন। তিনি তাঁর দলের লোকদিগকে, ছোট ছোট নৌকায় করে ডিম, মুর্গী, দুধ, শাকসব্‌জী সঙ্গে দিয়ে বিক্রী কর্ব্বার জন্যে মাঝগাঙ্গে যে সকল পর্ত্তুগীজ জাহাজ নোঙ্গর করে থাকৃত, সেখানে, পাঠাতেন। পর্ত্তুগীজ জাহাজে অনেক দেশী লোক, মাঝি, মাল্লা, খানসামা, বাবুর্চির কাজ কত্তো। তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় গঙ্গাচরণের লোকেরা কোন্ জাহাজ কোথায় যাচ্চে, কোন জাহাজে কত ফৌজ আছে, কোন দিন কোথায় ছাউনী পড়্‌বে, পর্ত্তুগীজ কামানের দৌড় কতদূর ইত্যাদি নানারূপ সংবাদ আন্‌ত। আবশ্যক সংবাদগুলি সংগ্রহ করে গঙ্গাচরণ সুযোগ মত মোগল পোতাধ্যক্ষ খাজে সেরের সঙ্গে দেখা কল্লেন। হুগ্‌লি পর্ত্তুগীজদের প্রধান আড্ডা ছিল। সুবাদার কাশিম খাঁ আদেশ দিয়েছিলেন যে, দু'দল সৈন্য স্থলপথে গিয়ে হুগ্‌লি অবরোধ কর্ব্বে; আর খাজে সের ঢাকা হতে জলপথে গিয়ে পর্ত্তুগীজেরা যা'তে না পালাতে পারে সেইজন্যে পথ আটক করে থাকৃবেন। ঢাকা হতে সুন্দরবন দিয়ে গঙ্গায় আস্‌তে হয়। গঙ্গাচরণ খাজে সেরকে পথঘাটের অবস্থা জানিয়ে বল্লেন;—"আদেশ হ'লে আমি বাদসাহের কাজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।" খাজে সেরের কাছে এক মোগল সেনাপতি উপস্থিত ছিল। সে হেসে বল্লে;—"তুমি বাঙ্গালী; তুমি আবার বাদসাহের জন্যে প্রাণ দেবে কি? তোমরা ত জ্বরে ভুগে, সাপের কামড়ে প্রাণ দিতে জানো! তলোয়ার হাতে প্রাণ দিতে জানো কি? তোমাদের এক রাজা ত সতর জন ঘোড়সওয়ারের ভয়ে, মুখের গ্রাস ফেলে, পালিয়েছিলেন।"

গঙ্গাচরণ বল্লেন;—"হাঁ! সত্য মিথ্যা যাই হ'ক, সে একটা দুর্ণাম আছে বটে। কিন্তু বেশী দিনের কথা নয়, বাঙ্গালী প্রতাপ আদিত্যের

কাছে তোমাদের মোগলবীরেরা সকলেই ত ঘাট মেনেছিলেন। শেষ একজন হিন্দুই ত তাঁকে পরাজয় করে তোমাদের মান রেখেছিলেন। এ কথাটা কি মিথ্যা ?"

একটু অপ্রতিভ হ'য়ে সেই সেনাপতি জিজ্ঞাসা কল্লে; "তুমি কোন জাতীয় ? ব্রাহ্মণ কি ?"

গঙ্গাচরণ বল্লেন;—"না! প্রতাপ আদিত্যের যে জাতি আমারও সেই জাতি, আমি বঙ্গজ কায়স্থ"।

খাজে সের গঙ্গাচরণের নির্ভীক উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলেন; বল্লেন;— "তুমি যে বাদসাহের কাজ কত্তে এসেছ, সে আহ্লাদের কথা। আমিও নানাস্থানে চর পাঠিয়েছি। যদি তোমার সংবাদ সপ্রমাণ হয়, আমি তোমার সাহায্য নেব এবং তোমার সম্বন্ধে সুবাদারকে পত্র লিখ্‌ব।"

গঙ্গাচরণ যে সকল সংবাদ দিয়েছিলেন, শীঘ্রই সপ্রমাণ হ'ল। তখন তাঁর পরামর্শ মত কাজ কত্তে মোগল পোতাধ্যক্ষের দ্বিধা রইল না। তাঁর সাহস ও যুদ্ধনৈপুণ্যের অভাব ছিল না; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা না জানাতেই তাঁর কাজের সুবিধা হচ্ছিল না। এখন তিনি মহা উৎসাহে পর্ত্তুগীজ ধ্বংসে প্রবৃত্ত হলেন। প্রায় প্রতি যুদ্ধেই মোগলদের জয় হ'তে লাগ্‌ল। পর্ত্তুগীজেরা দেখ্‌ত, যেখানে তারা ছাউনি ফেল্‌বে বলে ঠিক করে রেখেছে, মোগলেরা আগে হ'তে তা' দখল করেছে। তাদের জাহাজ নদীর মুখে নোঙ্গর না ফেল্‌তে ফেল্‌তেই তারা দেখ্‌ত, মোগলদের জাহাজ এসে সেখানে দাঁড়িয়েছে। পরাজয়ের পর যে পথ দিয়ে তারা পালাবে বলে ঠিক করেছিল, সে পথ ডুবো জাহাজে বা বড় বড় গাছে আটক রয়েছে। পর্ত্তুগীজেরা ক্রমে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়্‌ল। গঙ্গাচরণ একদিন শুন্‌লেন, পর্ত্তুগীজদের একখানা বড় জাহাজ বিদ্যাধরী নদীর মোহানায় নোঙ্গর ফেলেছে। বিদ্যাধরী এখন মজে আস্‌ছে; কিন্তু তখন জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত ছিল। গঙ্গাচরণ দেখ্‌লেন জাহাজখানা যেখানে নোঙ্গর ফেলেছে তার নিকটেই একটা

প্রকাণ্ড চোরাবালির চড়া আছে। ভাঁটার সময় জাহাজ নিশ্চিত চোরাবালিতে আট্‌কে যাবে; তখন আক্রমণ কল্লে কিছুতেই রক্ষা পাবেনা। তিনি সেই সংবাদ মোগল পোতাধ্যক্ষকে দিয়ে বল্লেন;—"এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া হবে না; এখনি চলুন, আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চি।" মোগলদের জাহাজ পর্ত্তুগীজদের জাহাজের চেয়ে কিছু ছোট ছিল। পোতাধ্যক্ষ সেইজন্য একটু ইতস্ততঃ করে বল্লেন;—"আমার এই ছোট জাহাজ নিয়ে অত বড় জাহাজ আক্রমণ করা কি উচিত?" গঙ্গাচরণ মাঝে মাঝে মোগল পর্ত্তুগীজদের যুদ্ধ দেখে জলযুদ্ধের প্রণালীটা কিছু কিছু বুঝেছিলেন। তিনি বল্লেন;—"ছোট জাহাজ বলেইত আমাদের সুবিধা; বড় জাহাজ ভাস্‌তে যত জল আবশ্যক, ছোট জাহাজের তত নয়। পর্ত্তুগীজ জাহাজ ভাঁটার সময় চড়ায় আট্‌কে যাবে, আমাদের সে ভয় নাই। তার পর বড় জাহাজ ঘুর্‌তে ফির্‌তে যত সময় লাগ্‌বে, আমাদের তার অর্দ্ধেক সময়ও লাগ্‌বে না। তাদের জাহাজ যখন বালিতে আট্‌কে যাবে, আমরা অনায়াসে লক্ষ্য করে তোপ দাগ্‌তে পার্‌ব, আমাদের ভাসা জাহাজ চল্‌বে, ফির্‌বে; তারা সেরূপ লক্ষ্য কত্তে পার্ব্বেনা। এমন সুযোগ ছাড়্‌লে আর আস্‌বে না। আমি খবর পেয়েছি, অই জাহাজে একজন প্রধান পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারী আছেন, তাঁকে বন্দী কত্তে পাল্লে আপনার মহা গৌরব হবে। আর যদি নিতান্তই আপনার যেতে ভরসা না হয়, আমাকে জাহাজ দেন, আমি যুদ্ধ জয় করে আসি।" হিন্দুর মুখে এত বড় কথাটা মোগল পোতাধ্যক্ষের পক্ষে অসহ্য হ'ল। তিনি তৎক্ষণাৎ পর্ত্তুগীজ জাহাজ আক্রমণে অগ্রসর হ'লেন। গঙ্গাচরণ যা' যা' বলেছিলেন, কাজেও তা' ফল্‌ল। ভাঁটার সময় পর্ত্তুগীজ জাহাজ চড়ায় আট্‌কে গেল। মোগলেরা দূর হ'তে লক্ষ্য করে তোপ দাগ্‌তে লাগ্‌ল। কামানের গোলায় মাস্তুল, দড়া, দড়ী ছিঁড়ে যাওয়ায় জাহাজ কাত্‌ হয়ে পড়্‌ল। সুযোগ বুঝে মোগল সৈনিকেরা, দলে দলে, তার উপর লাফিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সকলের অগ্রে মোগল পোতাধ্যক্ষ

খাজে সের আর গঙ্গাচরণ। দূর হ'তে কামান বন্দুক ছুড়্তে ইয়ুরোপবাসীরা ভারতবাসী হ'তে সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ। তা'দের কামান, বন্দুকও উৎকৃষ্ট। কিন্তু হাতাহাতি যুদ্ধে, লাঠি, ষড়্কী, তলোয়ার চালাতে তারা এদেশের লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। কাজেই মোগলদের সুবিধা হ'ল। খাজে সের আর গঙ্গাচরণ মত্ত সিংহের মত তা'দের অসি শূলে বিদীর্ণ কর্ত্তে লাগ্লেন। গঙ্গাচরণের বল, সাহস আর অসিযুদ্ধে নৈপুণ্য দেখে খাজে সের বিস্মিত হ'লেন। তিনি পর্ত্তুগীজ সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছিলেন, গঙ্গাচরণ দেখ্তে পেলেন, একজন পর্ত্তুগীজ গোলন্দাজ, মাস্তুলের আড়াল থেকে, তাঁকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলেছে। সে বন্দুকের রজ্জুকে পল্‌তে দিতে যায় এমন সময় গঙ্গাচরণ হাতের ষড়কীটা তা'কে লক্ষ্য করে এমন জোরে ছুড়্লেন যে ষড়কীর ফলাটা পর্ত্তুগীজের গলা ভেদ করে ওপার থেকেও দেখা গেল। সে তৎক্ষণাৎ জাহাজের উপর পড়্ল। এ দিকে খাজে সেরের অস্ত্রাঘাতে পর্ত্তুগীজ সেনাপতির ডান হাত দু'খান হ'ল। অম্‌নি মোগলেরা "আল্লা হো আকবর" "আল্লা হো আকবর" বলে চীৎকার করে উঠ্ল। আর অধিক ক্ষণ যুদ্ধ চল্‌ল না। পর্ত্তুগীজদের শবে জাহাজের উপর তলা পরিপূর্ণ হ'ল; রক্তের স্রোত বইল। পর্ত্তুগীজ সেনাপতি গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন; তিনি পরাজয় স্বীকার করে আপনার তরবারী খাজে সেরের হাতে দিলেন। জয় সম্পূর্ণ হ'ল। খাজে সের গঙ্গাচরণকে আলিঙ্গন করে বল্লেন;— "আপনার গুণে কেবল যুদ্ধ জয় হয় নি; আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছে। আমি আপনার কৃত উপকার কখনও ভুল্‌বনা। আপনি আমার সঙ্গে সুবাদারের নিকট চলুন; হিন্দুর যদি রাজভক্তি থাকে, মুসলমানের কেমন প্রজাবাৎসল্য আছে তা'র পরিচয় পা'বেন। গঙ্গাচরণ "যে আজ্ঞা" বলে উত্তর দিলেন।

ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় কোন জাতিরও যখন পতন আরব্ধ হয়, তখন চার দিক্ হ'তেই বিপদ ঘনিয়ে আসে; পর্ত্তুগীজদের সম্বন্ধেও তাই ঘট্‌ল।

মোগল সৈন্য স্থল পথে এসে হুগ্‌লি অবরোধ কল্লে। বহু পর্ত্তুগীজ নর, নারী হুগ্‌লির দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। মোগলেরা বারুদ পুতে কেল্লার বুরুজ উড়িয়ে দিলে তারা জাহাজে উঠে পালাবার চেষ্টা কল্লে। কিন্তু খাজে সের শ্রীরামপুরের নিকটে এক নৌসেতু নির্ম্মাণ করে তাদের পলাবার পথ আঠক কল্লেন। পর্ত্তুগীজদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাহাজটীতে প্রায় দু' হাজার স্ত্রী, পুরুষ, বালকবালিকা, প্রচুর ধন নিয়ে, উঠেছিল। মোগলদের হাতে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মরা ভাল, এই ভেবে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ বারুদঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেন। জাহাজ চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে গেল; সমস্ত আরোহী গঙ্গার জলে ডুবে ম'ল। অন্য অনেক গুলি জাহাজও সেই রকমে ধ্বংস হ'ল। পর্ত্তুগীজদের ছোট, বড় তিনশ' একুশ খানি জাহাজের মধ্যে তিন খানি ছোট জাহাজমাত্র পালিয়ে রক্ষা পেলে। কত পর্ত্তুগীজ যে মর্‌ল তার সংখ্যা নাই। যারা বাঁচ্‌ল তাদের মধ্যে পুরুষেরা দাস আর স্ত্রীলোকেরা বাঁদী হ'য়ে মোগলদের সেবা কত্তে লাগ্‌ল। হুগ্‌লির কেল্লা সমভূম করা হ'ল্; চির দিনের জন্য বাঙ্গালাদেশ হ'তে পর্ত্তুগীজ নাম উঠে গেল। *

এ সকল ইতিহাসের কথা ছেড়ে আমরা এইবার আমাদের আসল গল্পটায় ফিরে আসি। তিন মাস গত হয়েছে; যেখানে পর্ত্তুগীজদের কেল্লা ছিল, কুটী ছিল, সেখানে তা'দের চিহ্ন মাত্র নাই। মোগলদের কামানে সব চুরমার হয়ে গিয়েছে। সেখানে এক প্রকাণ্ড তাঁবু পড়েছে। লোকে লোকারণ্য; হাতী, ঘোড়া, উট, ফৌজ যে কত দাঁড়িয়েছে, গণনা করা যায় না। বাঙ্গালা দেশের সুবাদার কাসিম খাঁ সেখানে দরবার করেছেন। যা'দের বীরত্বে পর্ত্তুগীজ দস্যু ধ্বংস হয়েছে, বাদসাহের আদেশে তাদের খিলাৎ দেওয়া হবে। পর্ত্তুগীজদের ব্যবহারে কেবল বাদসাহ সাজাহান ন'ন, সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধা ছিলেন। তাঁ'রা উভয়েই আদেশ

* Stewart প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস ২৮০—২৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

পাঠিয়েছিলেন যে পর্ত্তুগীজদমনে যারা সাহায্য করেছে, তাদের যেন মুক্তহস্তে পুরস্কার দেওয়া হয়। জলেই পর্ত্তুগীজদের আধিপত্য ছিল, সেই জন্য যিনি জলযুদ্ধে তা'দের পরাজয় করেছেন. লোকে তাঁরি অধিক প্রশংসা কচ্চে। বাঙ্গালার সুবাদার কাসিম খাঁ সিংহাসনে বসেছেন; জরীর পাগড়ী মাথায়, মুক্তার মালা গলায়, বড় বড় আমীর, ওমরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। বাঙ্গালা দেশের অনেক জমিদার, তালুকদারও উপস্থিত হয়েছেন। সর্ব্বাগ্রে নৌসেনাপতি খাজে সেরকে আহ্বান করা হ'ল। তিনি যথারীতি অভিবাদন করে দাড়ালে সুবাদার বল্লেন;—"নৌসেনাপতি মহাবীর খাজে সের! আপনার কার্য্যে বাদসাহ পরম পরিতুষ্ট হয়েছেন। আপনি পর্ত্তুগীজদিগকে ধ্বংস করে রাজ্যের কণ্টক দূর করেছেন। আপনার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ বাদসাহ আপনাকে রাজ্যের পঞ্চহাজারী আমীরের পদ প্রদান করেছেন। আপনার জন্মভূমি লক্ষ্ণৌয়ে আপনার মর্য্যাদার উপযুক্ত জায়গীর প্রদত্ত হবে। আপনি এই পরিচ্ছদ এবং এই মুক্তামালা গ্রহণ করুন।" সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্ম্মচারী একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও মুক্তামালা নিয়ে দাঁড়াল। খাজে সের তাঁ'কে অপেক্ষা কত্তে বলে, সুবাদারকে সম্বোধন করে করজোড়ে বল্লেন, "জাঁহাপনা! বাদসাহ যে আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হয়েছেন, এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কিন্তু পর্ত্তুগীজ-বিজয়ের গৌরব একমাত্র আমার প্রাপ্য নয়। সুন্দরবন অঞ্চলে আমি যে সকল যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলুম, তা'তে আমার একজন সহকারী ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁরও গুণের পুরস্কার হওয়া আমি সঙ্গত বিবেচনা করি। আপনার অনুমতির অপেক্ষায় তিনি বাহিরে আছেন, আজ্ঞা হ'লেই উপস্থিত হ'বেন।"

সুবাদার বল্লেন;—"অবিলম্বে আহ্বান কর। পর্ত্তুগীজধ্বংসে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের মুক্তহস্তে পুরস্কার দেওয়ার জন্য বাদসাহের আদেশ আছে।"

আজ্ঞামাত্র খাজে সের স্বয়ং গঙ্গাচরণকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। খাজে সেরের পরামর্শ অনুসারে তিনি বীরোচিত মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিলেন। সভায় প্রবেশমাত্র সকলেরই দৃষ্টি তাঁর উপর পড়্‌ল। তাঁর সুগঠিত, দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ, যৌবনের তেজোবীর্য্যে উজ্জ্বল, সুন্দর মুখ দেখ্‌বামাত্র সভায় একটা কৌতূহলের সঞ্চার হ'ল। কিরূপে সুবাদারকে অভিবাদন কর্ত্তে হয়, কিরূপে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে হয়, খাজে সের গঙ্গাচরণকে পূর্ব্বে শিখিয়ে রেখেছিলেন। তিনি অভিবাদন করে দাঁড়ালে, সুবাদারের অনুমতিক্রমে, খাজে সের গঙ্গাচরণের কার্য্য আদ্যন্ত বর্ণনা কল্লেন। শেষে বল্লেন; "এই হিন্দুবীর যদি আমার প্রাণরক্ষা না কর্ত্তেন, তা' হ'লে এ দাস বাদসাহের সেবা কর্ত্তে সমর্থ হ'ত না।"

সভার সকলেই গঙ্গাচরণের কার্য্য শ্রবণে প্রীত হলেন। সুবাদার তাঁকে সম্বোধন করে বল্লেন;—"হিন্দুবীর! তোমার বীরত্বে আমরা সকলেই পরিতুষ্ট হয়েছি। তোমার পরিচয় দাও। তোমার নাম কি? তোমার নিবাস কোথায়?" গঙ্গাচরণ নিজের নাম ও বাসস্থান বল্লেন।

সুবাদার। "তোমার পিতার নাম?"

গঙ্গা। "শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ চৌধুরী মহাশয়।"

সুবা। "আমি ঢাকায় থাক্‌তে এ নাম যেন অনেকবার শুনেছি মনে হচ্চে।"

একজন প্রধান কর্ম্মচারী বল্লেন;—"হুজুরের অনুমান যথার্থ। সচ্চিদানন্দ চৌধুরী বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ জমিদার, অতি ধার্ম্মিক, সৎকর্ম্মশীল এবং পরম রাজভক্ত। তাঁর রাজস্ব কখনও বাকী পড়ে না, সরকারের আদেশ তিনি প্রাণপণে পালন করেন।"

সুবাদার গঙ্গাচরণকে বল্লেন:—"যোগ্য পিতার যোগ্যপুত্র তুমি; তুমি কি পুরস্কার চাও বল।"

গঙ্গা। "জাঁহাপনা! আমি শুনেছি, বাদসাহ যাদের সেবায় সন্তুষ্ট

হন, তাদের কোন প্রার্থনা কত্তে হয় না। বাদসাহ নিজেই বিবেচনা করে তা'দিগকে যোগ্য পুরস্কার দেন।"

সুবা। "উত্তম কথা। তুমি বাদসাহের হয়ে যুদ্ধ করেছ; তাঁর একজন প্রধান সেনাপতির প্রাণরক্ষা করেছ; তোমার কার্য্যের পুরস্কারার্থ, আমি বাদসাহের প্রতিনিধিরূপে তোমাকে রাজা উপাধি দিচ্চি। সুন্দর-বনের জঙ্গলমহলে, তোমার মনোনীত যে কোন স্থানে, তিন দাঁড়ের পান্‌সীতে এক দিনে যত স্থান বেষ্টন করা যায়, বার্ষিক এক শত এক তঙ্কা মাত্র রাজস্ব দিয়ে, তুমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তা' ভোগ কত্তে পার্ব্বে। তোমার ন্যায় বীর সুন্দরবন অঞ্চলে থাক্‌লে মগ বা পর্ত্তুগীজ দস্যু এদেশে প্রবেশ কত্তে পার্ব্বে না। তুমি, বাদসাহী নিশান উড়িয়ে, হাতীর উপর ডঙ্কা বাজিয়ে, দরবারে আস্‌তে পার্ব্বে। কোষাধ্যক্ষ তোমার রাজ্য-স্থাপনের ব্যয়স্বরূপ তিন সহস্র বাদসাহী মোহর তোমাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে দিবেন। তুমি এই পরিচ্ছদ, এই তরবারী গ্রহণ কর।"

গঙ্গাচরণ বিনয়ের সহিত সুবাদারকে অভিবাদন করে এক কর্ম্মচারীর হাত থেকে তরবারী ও পরিচ্ছদ গ্রহণ কল্লেন। সভাস্থ সকলেই গঙ্গাচরণের পুরস্কারে সুবাদারকে প্রশংসা কত্তে লাগ্‌লেন।

তারপর যা' হ'ল, তা' বেশী বল্‌বার প্রয়োজন নাই। গঙ্গাচরণ রাজা হলেন, নয়না রাণী হলেন। বুনোপাড়া তাঁদের রাজ্যের মধ্যে পড়্‌ল; তাঁরা দুর্ল্লভরামের ঘরখানি রক্ষা কল্লেন। মাঝে মাঝে, নিজেদের প্রাসাদ ছেড়ে, দু'জনে এসে সেখানে বাস কত্তেন। সেই নদীর ধারে হাত ধরাধরি করে বেড়াতেন, সেই জঙ্গ্‌লী ফুল তুলে আন্‌তেন; বুনো ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলা কত্তেন। পূর্ব্বের কথা স্বপ্নের মত তাঁদের মনে জাগ্‌ত। কালের গতিকে, নদীর ভাঙ্গনে, গঙ্গাচরণের রাজ্য কোথায় গিয়েছে, কেউ বল্‌তে পারে না। কিন্তু সুন্দরবনের বুনোরা এখনও তা'দের ছেলে মেয়েদের কাছে নয়না রাণীর রূপগুণের কথা গল্প করে।

পঞ্চম

মানুষ না দেবতা ?

সে অনেক দিনের কথা ; তখন বৈদ্যনাথ দেওঘরের চতুষ্পার্শ্বকে লোকে ঝাড়খণ্ড বল্‌ত। তখন, এখানে, বিদ্যালয়, বিচারালয় ছিল না ; কিন্তু দেবালয় ছিল্‌। তখন বায়ু-বিলাসীর দল, ব্যাগ-বাস্কেট সঙ্গে নিয়ে, রেলগাড়ী চড়ে, এখানে আস্‌ত না ; কিন্তু যাত্রীর দল, গঙ্গাজলের ভার কাঁধে নিয়ে, পায়ে হেঁটে, এখানে আস্‌ত। তখন বাঘে বাথান থেকে গরু নিয়ে যেত ; ঘাটওয়ালে ঘাটওয়ালে লড়াই হ'লে হাটবাজার লুঠ হ'ত ; তবুও লোকে পেট ভরে দুধ, ভাত খেতে পেত। তখন 'মাতা পিতাকে ভক্তি করিবে' পাঠশালার পাঠ্যপুস্তক হ'তে একথা বালকবালিকারা শিক্ষা কত্তো না ; তবুও তারা মাবাপের কথা মতই চল্‌ত ; পাছে তাঁদের মনে ব্যথা লাগে, এই ভয়ে জড়সড় হয়ে থাক্‌ত। সুখে, দুঃখে সে আর এক রকমের দিন ছিল।

এই সময় ঝাড়খণ্ডের প্রায় সাতক্রোশ দক্ষিণে, একটী ছোট জঙ্গ্‌লী গ্রামে, এক ব্রাহ্মণ বাস কত্তেন। সে গ্রাম এখনও আছে ; তার নাম বুড়াই। এখন আর তা'তে তেমন জঙ্গল নাই, কিন্তু তা'র নদী, পাহাড় গুলি পূর্ব্বের মতই আছে। পাথ্‌রো বলে একটী পাহাড়ে নদী, বুড়াইএর ভিতর দিয়ে, ঘুরে ফিরে, প্রবাহিত হচ্চে। গ্রীষ্মকালে তা'তে অধিক জল থাকে না, কিন্তু বর্ষায় তার কলেবর পুষ্ট হয় ; দুই কূল ভাসিয়ে, গাছপালা উপ্‌ড়ে, পাথ্‌রো পাগলের মত ছুট্‌তে থাকে। পাথ্‌রো আছে বলেই গ্রামটীর শোভা, পাথ্‌রো আছে বলেই গ্রামটীর উর্ব্বরতা। বুড়াই পাহাড়ে ভরা ; পাহাড়গুলির বৈচিত্র্য এই যে, সাধারণ পাহাড়ের মত, সেগুলি খণ্ড

খণ্ড পাথরে গঠিত নয়। এক একটী পাহাড় এক একখানি পাথর। তা'তে ফাটা নাই, ভাঙ্গা চুরার কোন চিহ্ন নাই ; দেখ্‌লে মনে হয়, সৃষ্টিকর্ত্তা, অতীত যুগে, কোন আসুরিক কটাহে বালি, পাথর, মাটী সব একসঙ্গে গালিয়ে উপুড় করে ঢেলে রেখেছেন। পাহাড়গুলির মধ্যে একটী অপেক্ষাকৃত বড় ; প্রায় আড়াই শত ফুট উচ্চ। সেই পাহাড়টীতে অনেকগুলি গুহা আছে। গুহাগুলি দেখ্‌তে বড় সুন্দর ; ঋষিমুনিদের বাসের উপযুক্ত। এক একটী গুহা এত বড় যে তা'তে পঞ্চাশ ষাট জন লোক রৌদ্রে, বর্ষায় স্বচ্ছন্দে আশ্রয় নিতে পারে। বুড়াইএর প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ সুন্দর। নদী, পাহাড়ের কথা বলেছি ; খোলা মাঠেরও অভাব নাই। ভূমি নতোন্নত ; বর্ষার প্রারম্ভ হ'তে হেমন্তের শেষ পর্য্যন্ত নিম্নভূমিগুলি যখন ধান্যে এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিগুলি যখন ইক্ষু, ভুট্টা প্রভৃতিতে আবৃত থাকে, তখন অতি মনোহর শোভা হয়। যে সময়কার কথা বল্‌চি, তখন বুড়াই বনে আবৃত ছিল। বড় বড় শাল, পিয়াল, মহুল গাছের ছায়ায় সমস্ত গ্রামটী স্নিগ্ধ থাক্‌ত। ফাল্গুন চৈত্র মাসে থোকা থোকা সাদা ফুলে শালগাছগুলি ভরে যেত ; সুগন্ধে সমস্ত গ্রাম আমোদিত হ'ত। তখন রাত্রিতে গোয়ালের কাছে, মাঝে মাঝে, গুলবাঘার আবির্ভাব হ'ত, মহুল ফুল ফুট্‌লে ভাল্লুকের দল দেখা দিত, বরাহে চাষার ধানক্ষেত নষ্ট করত। তখন জঙ্গলে শিয়াল, শশক, হরিণ প্রভৃতি বুনো জন্তু দলে দলে বেড়াত। গ্রামে যে সকল লোক বাস কর্‌ত, তারাও আকারে, আচারে বুনো ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই অনার্য্য ; ঘরকয়েকমাত্র আর্য্যবংশীয় লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব্বোক্ত মৈথিল ব্রাহ্মণ। কি আকর্ষণে তিনি এমন জঙ্গ্‌লী গ্রামে বাস করেছিলেন বলা যায় না। তবে তখন অনার্য্যদের মধ্যে অনেকের আর্য্য আচার, ব্যবহার গ্রহণের বড় সাধ ছিল। তারা পূজাপাঠের, বিধি ব্যবস্থার, সুবিধা হবে বলে ব্রাহ্মণদিগকে, আদর করে, ভূমি দিয়ে, গ্রামে বাস করাত এবং তাঁদের সাহায্যে ক্রমে আর্য্য-সমাজে

উঠ্ত। সম্ভবতঃ আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুর এঁদেরি মধ্যে একজন হবেন।

পাড়াগাঁয়ে সাধারণ লোকের অবস্থা যেরূপ থাকে, ব্রাহ্মণের অবস্থা সেইরূপই ছিল। তাঁর বিঘা কত ধান জমী ছিল, চার পাঁচটা গাভী ছিল, গোটা কত আম, কাঁটাল, মহুল গাছ ছিল। যে বৎসর চাষ ভাল হ'ত, সে বৎসর তাঁর চাউলের, চিড়ার অভাব হ'ত না। কিন্তু চাষ ভাল না হ'লেই তাঁকে ভাব্তে হ'ত, কেমন করে ঠাকুরের নিত্য ভোগ দেব, অতিথি এলে কেমন করে তাঁর সেবা কর্ব। যাই হ'ক এম্নি করে সুখে, দুঃখে তাঁর দিন যেত। ব্রাহ্মণ গরীব ছিলেন বটে, কিন্তু মূর্খ ছিলেন না। হিন্দু-শাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল; সেইসঙ্গে তিনি মোটামুটী দু' চারটা শাস্ত্রীয় ঔষধ আর ঝাড়, ফুঁকও জান্তেন। কা'রও উপর ভূত প্রেতের আবেশ হয়েছে সন্দেহ হলে, কারুকে সাপে কামড়ালে, কা'রও গায়ে গরল বেরুলে গ্রামের লোক তাঁর কাছে আস্ত; তিনি চিকিৎসা করে সারাতেন। সেজন্য তিনি এক পয়সাও নিতেন না; লোকের ভক্তি আর ভালবাসাতেই তাঁর পুরস্কার হ'ত।

অন্য গুণের অপেক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্মানুরাগই অধিক প্রশংসনীয় ছিল। তিনি বুড়াইএর সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাহাড়ের গুহাটীতে, এক বৃহৎ কুণ্ড খনন করে, তা'তে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন। সেই লিঙ্গের নাম দিয়েছিলেন গৌরীনাথ। তিনি ভক্তির সঙ্গে প্রতিদিন গৌরীনাথের পূজা কত্তেন; তার উপর, প্রতি পূর্ণিমাতে, ঝাড়খণ্ডে গিয়ে, বৈদ্যনাথের পূজা করে আস্তেন। জঙ্গলের পথে, প্রতিমাসে, উপবাস করে, সাতক্রোশ যাতায়াত বড় কম কষ্টের নয়। তা'র উপর বাঘ ভাল্লুকেরও ভয় ছিল। চার পাঁচ বৎসর এইরূপ পূজার পর, একবার, তিনি স্বপ্ন দেখ্লেন, এক জটাজূটধারী, ত্রিনয়ন পুরুষ তাঁকে বল্চেন; "তোমার আর এত কষ্ট করে ঝাড়খণ্ডে যেতে হ'বেনা। আমি তোমার স্থাপিত লিঙ্গেই আবির্ভূত হ'ব;

তুমি সেই লিঙ্গই পূজা করো।” ব্রাহ্মণ সেই অবধি আর ঝাড়খণ্ডে যেতেন না; নিজের স্থাপিত লিঙ্গই পূজা কত্তেন।

ব্রাহ্মণের গৃহিণী ছিলেন না; অন্য আত্মীয়, স্বজনও ছিল না; ছিল কেবল একটী মাত্র কন্যা; তার নাম ছিল গৌরী। কি করে যে অমন সুন্দরী মেয়ে বুড়াইএর মত জঙ্গ্‌লা গ্রামে জন্মেছিল, তা' বলা যায় না। চারদিকে যাদের বাস তারা ছিল কালো, প্রায় ঝুলের মত কালো; তা'দের ঠোঁট পুরু, নাক থ্যাব্‌ড়া, চোক ছোট। ব্রাহ্মণ নিজেও বড় সুপুরুষ ছিলেন না; অথচ মেয়েটী হয়েছিল “তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, সুগঠিতাধরনাসা, পদ্মপলাসাক্ষী।” দামে ভরা, পচা পুকুরের মধ্যে, কখনও কখনও, একটী পদ্মফুল ফুটে যেমন পুকুরটী আলো করে, গৌরীর রূপে বুড়াই গ্রামও তেম্‌নি আলো করেছিল। মেয়েটীর যেমন রূপ তেমনই গুণ। একটু বড় হয়ে অবধি সে পিতার পূজার সাহায্যকারিণী হয়েছিল। ছোট মাটীর ঘটে করে সে পাথ্‌রো থেকে জল আন্‌ত; পূজার ফুল, বেলপাতা তুল্‌ত; যেখানে পা'ক, খুঁজে, ছুটো একটা ধুতুরা ফুল সংগ্রহ কত্তো। গ্রামে অধিক ব্রাহ্মণের বাস ছিল না; সেইজন্য ঝাড়খণ্ডে যাবার সময়, কখনও কখনও, ছু'এক জন সাধু সন্ন্যাসী গৌরীর পিতার অতিথি হ'তেন। গৌরী ভক্তির সঙ্গে তাঁদের সেবা কত্তো। তার রূপ আর তার ব্যবহার দেখে একবার এক সন্ন্যাসী গৌরীর পিতাকে বলেছিলেন;—“ভগবতী, কুমারীরূপে পূজা নেবার জন্য তোমার এই কন্যাটীতে আবির্ভূতা হয়েছেন।”

গৌরীর বয়স ক্রমে আটবৎসর হ'ল। ঝাড়খণ্ডের মৈথিল ব্রাহ্মণেরা, সাধারণতঃ, এত বয়স পর্য্যন্ত কন্যা অবিবাহিতা রাখেন না। কিন্তু গৌরী শ্বশুরবাড়ী গেলে কেমন করে তিনি একা থাক্‌বেন, কে তাঁর পূজার ফুল, বেলপাতা তুল্‌বে, অসুখ হলে কে তাঁর মুখে একটু জল দেবে, এই ভেবে গৌরীর পিতা কন্যার বিবাহ দেন নাই। কিন্তু আর বিলম্ব করার উপায় ছিল না। জ্ঞাতি, কুটুম্বেরা, গৌরীকে দেখ্‌লেই, ব্রাহ্মণকে লাঞ্ছনা দিয়ে

বল্‌তেন ;—"করেছ কি ? এত বড় মেয়ে ঘরে রেখেছ ! জঙ্গলের ভিতর রয়েছ, তাই রক্ষা ; ঝাড়খণ্ডে থাক্‌লে মহা কলঙ্ক হ'ত।" কাজেই গৌরীর পিতা কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হ'লেন, পাত্র খুঁজতে লাগ্‌লেন।

পাত্রের অভাব হ'ল না। গৌরীর রূপের কথা প্রচারিত হয়েছিল, অনেক পাত্র জুট্‌ল। গৌরীর পিতা, বেছে রেছে, তাদের মধ্যে একটী সুপাত্র স্থির কল্লেন। পাত্রটী সুশিক্ষিত, সুরূপ, সুশীল এবং সর্ব্বোপরি পরম মাতৃভক্ত। দোষের মধ্যে পাত্রটী গরীব। কিন্তু গৌরীর পিতা সেটা দোষ বলেই গণনা কল্লেন না। তিনি ভাব্‌লেন, পাত্রের যৎকিঞ্চিৎ যা' আছে, তার উপর সে ত আমার এই ভদ্রাসন, জমী, বাগান সমস্তই পা'বে ; তা' হলেই একরকম মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান হ'বে। পাত্রের বাপ ছিলেন না, মা ছিলেন। গৌরীর বাপ মনে কল্লেন, এ এক প্রকার মন্দ নয়। আমি জামাইএর পিতৃস্থানীয় হ'ব, আর বেহান গৌরীর মাতৃস্থানীয়া হবেন। উভয়েরই মাতাপিতার অভাব মোচন হ'বে। বিবাহসম্বন্ধ স্থির হ'ল।

গৌরীর পিতার অবস্থামত আয়োজনে ত্রুটি হ'ল না। ভাগ্যক্রমে সেবার অন্য বৎসর অপেক্ষা চাষ ভাল হয়েছিল ; গৌরীর পিতা স্বচ্ছল ছিলেন। তিনি ঝাড়খণ্ডে গিয়ে গৌরীর জন্য একখানি চেলির সাড়ী, একটি রূপার হাঁসুলি, ও দু'গাছি কাঁসার বাঁকমল ক্রয় করে আন্‌লেন। ঘরে ব্রাহ্মণবিদায়ে প্রাপ্ত যে পিতলের থালা, ঘটি ছিল, তাই মেজে, ঘসে দানসামগ্রী এবং চাষের ধানে চিড়া ও ক্ষেতের আকে গুড় তৈয়ার করান হ'ল। গ্রামের গোয়ালারা ব্রাহ্মণের সেবা কল্লে তা'দের গরু মহিষের দুধ বাড়্‌বে ভেবে দই যোগাবার ভার নিলে। বুড়াইএ নৈয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল জঙ্গ্‌লী লোক বাস কত্তো, তারা কেউ শালপাতা, কেউ জ্বালানী কাঠ এনে দিলে। আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল।

গৌরীর বাবাকে গ্রামের সকলেই ভাল বাস্‌তেন। সুতরাং সকলেরই

আনন্দ হ'ল; গৌরীরও হ'ল। আট বৎসরের মেয়ে বিবাহের দায়িত্ব বোঝে না; কিন্তু তা' বলে যে তার মনে আনন্দ হয় না, তা নয়। আনন্দও হয় আর যাঁর সঙ্গে বিবাহ হ'বে, তাঁর প্রতি ভালবাসাও হয়। স্বামীর কাছে যেতে, হয়ত, তার একটু ভয় হয়; তবুও সে, আড়াল থেকে, স্বামীকে দেখে; দেখে সুখী হয়। হিন্দুর মেয়ে, পুরুষপুরুষানুক্রমে, যে শিক্ষা পেয়েছে তারই গুণে, শিশুকাল থেকেই, তার মনে এইরূপ ভাব হয়; গৌরীরও হল। চোকে না দেখ্‌লেও, সম্বন্ধ স্থির হ'বার পর হ'তেই, সে স্বামীকে ভালবাসতে শিখ্‌লে; তাঁকে দেখ্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে রইল।

আজ শুভবিবাহ। ভোর না হ'তেই গ্রামের সাঁওতালেরা, গৌরীর বাবার উঠনে এসে, মাদল বাজাতে আরম্ভ কল্লে। কেউ তাদের ডাকেনি; গৌরীর পিতার প্রতি ভালবাসার জন্যই তারা স্বেচ্ছায় এসেছিল। পাড়া প্রতিবাসীরাও একে একে এসে জুটলেন। গ্রামে আর যে দু' তিন ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁদের মেয়েরা এসে গৌরীকে তেল, হলুদ মাখিয়ে স্নান করালেন, রাঙা কাপড় পরালেন, কপালে অলকা তিলকা, গলায় ফুলের মালা দিলেন। গৌরীর রূপ পূর্ণচন্দ্রের মত ফুটে বেরুল, মুখে হাসি এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। বিবাহ হ'লে বাবাকে যে ছেড়ে যেতে হ'বে, সেটা তার মনে পড়্‌ল। সে নির্জ্জনে বাবার কাছে গিয়ে বল্লে; "বাবা! তুমি আমার সঙ্গে যাবে?" ব্রাহ্মণ বল্লেন;—"আমি কেমন করে যাব, মা? আমার গৌরীনাথের পূজা কর্‌বে কে? গেলে যে তাঁর পূজা বন্ধ হবে।" গৌরী বল্লে;—"তবে আমি যাব না।"

গৌরীর মনের ভাব ত এই; পাত্রের মনের ভাব কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি নবীন যুবাপুরুষ; গৌরীর অনুপম রূপের কথা শুনেছিলেন, মনশ্চক্ষুতে তার চিত্র দেখেছিলেন, তাঁর প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ উঠ্‌ছিল। কিন্তু কেবল রূপের কথা নয়, গৌরীর গুণের কথাও তিনি শুনেছিলেন; তা'তেই তাঁর

অধিক আনন্দ হয়েছিল। অতি অল্পবয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁর মা'ই তাঁকে মানুষ করেছিলেন। মা'ই তাঁর সব ;—"সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতা।" তিনি ভাব্‌ছিলেন, গৌরী এলে মার পরিশ্রম অনেকটা কম হ'বে। তিনি যে এই বয়সে, কোথায় কাঠ, কোথায় ঘুঁটে যোগাড় করে, আমায় রেঁধে দেন, কুঁয়া থেকে জল আনেন, ক্রমে, এগুলো ত আর কত্তে হবে না। যখন লেখাপড়া শিখেছি, তখন, আজ হ'ক, কাল হ'ক, কিছু উপার্জ্জন কত্তে পার্‌বই। তা'হলে সংসারের অভাব দূর হবে, গৌরী কাজকর্ম্ম কর্‌বে, মা আমার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক্‌বেন। এর চেয়ে আর কি সুখ হবে?

তিনি কপালে চন্দন মেখে, গলায় ফুলের মালা দিয়ে, হাতে দূর্ব্বার সঙ্গে লাল সূতো বেঁধে, যাত্রার পূর্ব্বে, মায়ের পায়ে প্রণাম কত্তে গেলেন। কিন্তু এ কি? তাঁর মা, ঘরের কোণে বসে, দু'টা কোদোর ভাত দই মেখে খাচ্চেন।* তিনি বল্লেন; "এ কি মা! আমি বিয়ে কত্তে যাচ্চি, তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ না করে, বিদায় না দিয়ে, এমন সময় খেতে বসেছ?"

মা বল্লেন;—"বাবা! পরের মেয়ে আন্‌তে যাচ্চ, সে এলেত আর আমায় খেতে দেবে না, তাই দু'টা খেয়ে নিচ্চি।"

পুত্র। সে কি মা! তোমায় খেতে দেবে না, এ কথার অর্থ কি?"

মাতা। অর্থ এই যে, এখন থেকে, সবই ত বউএর হবে। বুড়ো শাশুড়ী বলে সে কি আর আমার কথা মনে রাখ্‌বে? না খেয়ে মলেও, হয়ত, ফিরে চাইবে না।"

পুত্র। "অমন কথা বল না, মা! সে তোমার দাসী হয়ে থাক্‌বে; ঘর সংসার তুমিই চালাবে। আমরা তোমার আদেশমত চল্‌ব।"

মাতা। "সোণার চাঁদ আমার! বিয়ের আগে অনেক ছেলেই ওকথা

* কোদো একপ্রকার ঘাসের বা তৃণধান্যের বীজ; দেখ্‌তে কতকটা সাগুর মত। সাঁওতাল পরগণার গরীবদের একটী প্রধানখাদ্য। পাক কল্লে ক্ষুদের মত দেখায়।

বলে ; তারপর দুঃখিনী মা বলে মনে রাখে না। তা' তুই বিয়ে কত্তে যাচ্চিস্ যা ; আমি এই ভাত ক'টা খেয়ে নি। কাল থেকে আমার অদৃষ্টে কি ঘট্‌বে, কে জানে ?"

পুত্র। "মা ! এই যখন তোমার মনের ভাব তখন আমি বিয়ে কর্‌ব না, চিরদিন আইবুড় থাক্‌ব।"

এই বলে তিনি হাতের সুতো, গলার মালা খুলে ফেল্লেন। যে দু' চারজন বরযাত্রী এসেছিলেন, তাঁদের বল্লেন ;—"আমি বিবাহ কর্‌ব না, আপনারা কন্যার পিতাকে এই সংবাদ পাঠিয়ে দিন।"

এদিকে কন্যার গৃহে সকলেই উৎসুক হয়ে অপেক্ষা কচ্ছিলেন। এই আস্‌চে এই আস্‌চে করে রাত্রি কেটে গেল। আট বৎসরের মেয়ে গৌরী, সমস্ত রাত্রি জেগে, ভোরের সময়, ঘুমিয়ে পড়্‌ল। প্রাতঃকালে উঠে শুন্‌লে বিবাহ হ'ল না। কি জন্য হ'ল না গৌরীর পিতা তা' শুন্‌লেন। তিনি বল্লেন ;—"আমার মেয়ের বিবাহ না হ'ক, কলিযুগে যে এমন মাতৃভক্ত ছেলে আছে, এটাও সুখের কথা। গৌরীকে যেন একটু ম্লান দেখে তিনি বল্লেন ;—গৌরি ! তুই আমার গৌরীনাথের সেবা কর্, তিনিই তোকে উপযুক্ত পাত্র দেবেন।" গৌরী মনে মনে বল্লে ;—'আদেশ মাথায় রাখ্‌লুম।"

বড়লোক হ'লে এই বিবাহভঙ্গটা নিয়ে তুমুল আন্দোলন, আলোচনা হ'ত। কিন্তু গরীবের সকল দুঃখ, সকল নৈরাশ্যই সয়ে যায়, এখানে তাই হ'ল। পিতার ও পুত্রীর মনে একটা বিষাদের ছায়া অবশ্যই পড়্‌ল ; কিন্তু ছাঁদনাতলা ভাঙার সঙ্গে সেটা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এল। গৌরীর পিতা যে চিড়া, দধি, গুড় সংগ্রহ করেছিলেন, গৌরীনাথের ভোগ দিয়ে তা' গ্রামের গরীব লোকদের খাওয়ালেন। আয়োজনের চিহ্ন লোপ পেলে।

সেই দিন হ'তে গৌরী, দ্বিগুণ ভক্তির সঙ্গে, গৌরীনাথের সেবায় প্রবৃত্ত হ'ল। পূর্ব্বে সে মধ্যাহ্নের পূজা শেষ হ'বার অগ্রে কিছু খেত, কিন্তু

এখন থেকে পূজা সমাপ্ত না হলে জলস্পর্শ কর্‌ত না। পূর্ব্বে সে পূজার ফুল, বেলপাতা তুলেই তৃপ্ত হ'ত, কিন্তু এখন, ফুলের মালা গেঁথে, গৌরীনাথকে স্বহস্তে না সাজালে তার নিদ্রা হ'ত না। তার বাবা মহাদেবের স্তব পাঠ কত্তেন, সে একমনে শুন্‌ত। একদিন সে বল্লে;—"বাবা! আমাকে অই স্তবগুলি শেখাও"। তার বাবা আনন্দে তাকে স্তব, ধ্যান, মন্ত্র শেখালেন। সে লুকিয়ে মহাদেবের পূজা কত্তে বস্‌ত; এমন ভক্তির সঙ্গে, এমন মধুর কণ্ঠে, স্তবগুলি পাঠ কত্তো যে তার বাবা শুনে মোহিত হ'তেন। পূজার মন্ত্রগুলি তার আয়ত্ত হয়েছে দেখে ব্রাহ্মণ একদিন বল্লেন;—"গৌরি! আমি বুড়ো হয়েছি, আর ক'দিন বাঁচব? আমার পর তুই গৌরীনাথের পূজা করিস্।"

গৌরীর বয়স ক্রমে বার বৎসর হ'ল। একবার আশাভঙ্গ হওয়ায় ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহের জন্যে পূর্ব্বের মত উৎসুক ছিলেন না। তাঁর শরীর ক্রমে অপটু হচ্ছিল; সংসারের কাজ, রান্না, জলতোলা, গো-সেবা, ঠাকুর-সেবা সমস্তই গৌরী কত্তো। তার শরীর, সুস্থ ও সবল ছিল; পরিশ্রমে তার ক্লেশ হ'ত না; আলস্য কা'রে বলে সে জান্‌ত না। বাপের সেবা, ঠাকুরের সেবার চেয়ে বড় কাজ আর কি হ'তে পারে ভেবে সে স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সকল কাজ কত্তো। ব্রাহ্মণ ভাব্‌তেন গৌরী, বিবাহের পর, শ্বশুর-বাড়ী গেলে এ সকল কে ক'র্ব্বে? যদ্দিন এম্‌নি যায় যাক্, তারপর যা হ'বার হবে। আরও একটা কারণ ছিল। গৌরীর রূপের কথা শুনে অনেক বড় বড় ঘর থেকেও, মাঝে মাঝে, সম্বন্ধ আস্‌ত। ব্রাহ্মণের মনে হ'ত, গৌরীর বিবাহের ভাবনা কি? যখনি ইচ্ছা হবে দেব। হ'ক না একটু বড়, যে যা' বলে বলুক; নিজ মিথিলায়ত বড় মেয়ে বিবাহ দেওয়ার রীতি আছে। আমরা যখন মৈথিল, তখন, সে রীতি পালন কল্লে দোষ কি?

বুড়াইএর মেয়েরা, মাঝে মাঝে, হেঁটে, ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথের পূজা দিতে যেত। তারা এসে বৈদ্যনাথ সম্বন্ধে নানারূপ গল্প কত্তো। শুনে একদিন

গৌরী তার বাবাকে বল্লে ;—"বাবা ! আমায় একবার বৈদ্যনাথ দেখিয়ে আন ; আমার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়েছে।" তার বাবা বল্লেন ;—"তুমি এত পথ হাঁট্‌তে পার্ব্বে ?"

গৌরী। "পার্‌ব, বাবা ! পার্‌ব। তুমি দেখ, আমি তোমার আগে আগে যাব।"

পূর্ণিমার দিন যাওয়া স্থির হল। একটী গাছে নূতন কুম্‌ড়া ফলে ছিল ; সেইটী কাঁধে নিয়ে, আর যৎকিঞ্চিৎ খরচ সংগ্রহ করে, ব্রাহ্মণ যাত্রা কল্লেন। তাঁর দু' একজন প্রতিবেশী এবং তা'দের মধ্যে একজনের গৌরীর সমবয়স্কা একটী মেয়ে তাঁদের সঙ্গে চল্‌ল। তখন বুড়াই থেকে ঝাড়খণ্ডে যাবার পথে অনেক যায়গায় জঙ্গল ছিল ; দিনের বেলাতেও দু'একটা নেকড়ে বাঘ দেখা যেত। তাই ব্রাহ্মণ দু'চারজন সঙ্গী পেয়ে খুসী হ'লেন গৌরী কখনও গ্রামের বাহিরে যায়নি ; অর্দ্ধেক পথ বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চল্‌ল ; কিন্তু তার পর ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ল। ব্রাহ্মণ গৌরীর কাছে, অনেক সময়, রামায়ণ মহাভারতের কথা গল্প কত্তেন। গৌরী একমনে শুন্‌ত ; শুনে তার বড় আনন্দ হ'ত। কন্যাকে পথশ্রান্তা দেখে গৌরীর বাবা সে দিন সাবিত্রী-সত্যবানের কথা গল্প কত্তে লাগ্‌লেন। সাবিত্রী তপোবনে সত্যবানকে দেখে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছিলেন। তার পর সত্যবানের পরমায়ু এক বৎসর মাত্র এই কথা শুনে তাঁর বাবা তাঁকে বলেছিলেন, সাবিত্রি ! তুমি অন্য কারুকে বরণ কর ; সত্যবানকে বরণ কল্লে তোমায় চিরজীবন কষ্ট পেতে হ'বে।" শুনে সাবিত্রী উত্তর দিয়েছিলেন ;—"বাবা ! আমি যাঁকে মনে মনে বরণ করেছি, তিনি ত আমার স্বামী হয়েছেন ; তবে আমি কেমন করে অপর কারুকে বরণ করব।" গৌরী এই কথা শোনার পর বল্লে ;—"বাবা ! সাবিত্রী ত বড় ভাল মেয়ে ছিলেন ; এ কালে তাঁর মত মেয়ে হয় না কেন ?" ব্রাহ্মণ বল্লেন ;—"সাবিত্রী যে বড় ভাল মেয়ে ছিলেন, তা'তে আর সন্দেহ

কি? সেই জন্যই ত লোকে আশীর্ব্বাদ করে বলে, 'সাবিত্রীর মত হও।' এ কালে যে তাঁর মত মেয়ে হয় না বা হ'তে পারে না, এমন নয়। কারণ সাবিত্রী যে দেশে, যে জাতির মধ্যে জন্মেছিলেন, 'সে দেশ, সে জাতি ত এখনও রয়েছে। তবে তাঁর মত মেয়ে তখনও দুর্ল্লভ ছিল, এখনও দুর্ল্লভ বটে।

কথাবার্ত্তায় তাঁরা ক্রমেই বৈদ্যনাথধামের নিকটবর্ত্তী হচ্ছিলেন। অপর দু'চার জন যাত্রীও সেই পথে চলেছে, মাঝে মাঝে, দেখা গেল। গৌরী দেখ্‌লে একটী বৃদ্ধা, তামার ঘটিতে গঙ্গাজল নিয়ে, তাঁদের আগে আগে চলেছেন। তাঁর বয়স সোত্তর বৎসরের কম নয়; শরীর শীর্ণ, গায়ে এক খানি ছেঁড়া ময়লা কাপড়; কাঁকর ফুটে পা দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে; তবুও তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাচ্চেন আর গুন্ গুন্ করে গান গা'চ্চেন "ব্যোম ভোলা কা দরশন চাহে নয়না হামারি"। তাঁকে দেখে গৌরীর বড় লজ্জা বোধ হ'ল। সে ভাব্‌লে এই বৃদ্ধা এত কষ্ট করে চলেছেন, আর আমি, কিশোরী মেয়ে হয়ে, ক্লান্তিবোধ কচ্চি! ছি! ছি! তখন সে উৎসাহের সঙ্গে চল্‌তে লাগ্‌ল। এ দিকে বেলাও শেষ হয়ে এসেছিল। একটী উঁচু যায়গা থেকে বৈদ্যনাথের মন্দির দেখা গেল। ব্রাহ্মণ মেয়েকে দেখিয়ে বল্লেন;— "অই দেখ, রাবণেশ্বরের মন্দির দেখা যাচ্চে, প্রণাম কর।"

গৌরী প্রণাম করে বল্লে;—"বাবা! উটী কি রাবণেশ্বরের মন্দির? তবে বৈদ্যনাথের মন্দির কোথায়? ব্রাহ্মণ বল্লেন;—"অইত বৈদ্যনাথের মন্দির। যিনি বৈদ্যনাথ তিনিই রাবণেশ্বর। রাবণ তাঁকে কৈলাস হ'তে পৃথিবীতে এনেছিল বলে তাঁর নাম রাবণেশ্বর হয়েছে।"

গৌরী। "রাবণ তাঁকে কিরূপে এনেছিল?"

ব্রাহ্মণ। একদিন কৈলাসধামে গৌরী মহাদেবের উপর অভিমান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। মহাদেব অনেক উপরোধ অনুরোধ কল্লেও তাঁর অভিমান দূর হ'ল না। এই সময় রাবণ দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে-

ছিল। কৈলাস পর্ব্বতের কাছে এসে তার খেয়াল হ'ল, আমার গায়ে কেমন জোর, একবার, এই পর্ব্বতটা তুলে পরীক্ষা করি। যদি সুবিধা হয় পর্ব্বত শুদ্ধ ঠাকুরকে নিয়ে আমার লঙ্কাপুরীতে বসাব। তিনি থাক্‌লে শত্রুরা আমার কিছু অনিষ্ট কত্তে পার্ব্বে না। এই ভেবে সে পর্ব্বতটা ধরে টান্‌তে লাগ্‌ল। যার উপর মহাদেব আর গৌরী অধিষ্ঠিত তা' তুল্‌তে পারে রাবণের এমন শক্তি কি? তবুও তার টানাটানিতে পর্ব্বতটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠ্‌ল। হঠাৎ পর্ব্বতের কাঁপুনীতে গৌরী, চম্‌কে উঠে, মহাদেবকে ভয়ে জড়িয়ে ধল্লেন, তাঁর অভিমান দূর হ'ল। মহাদেব এতে রাবণের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে রাবণ তাঁকে লঙ্কায় গিয়ে থাক্‌তে অনুরোধ কল্লে। মহাদেব সম্মত হ'লেন। কিন্তু দেবতাদের কৌশলে তাঁর লঙ্কায় যাওয়া ঘট্‌ল না; তিনি মাঝপথে, এই ঝাড়খণ্ডে, নিজ মূর্ত্তিতে স্থায়ী হয়ে বস্‌লেন। লোকে এখানেই তাঁর পূজা করে। রাবণ তাঁর ভক্ত ব'লে আর রাবণই তাঁকে কৈলাস থেকে এখানে এনেছিল ব'লে তাঁর নাম রাবণেশ্বর হয়েছে। তিনি শরীরের, মনের সকল প্রকার ব্যাধি দূর করেন বলেই তাঁর অপর নাম বৈদ্যনাথ। কেউ কেউ বলেন, বৈজু বলে একব্যাধ সর্ব্বপ্রথমে তাঁর পূজা কত্তো। তারি নামানুসারে তাঁর নাম বৈজনাথ বা বৈদ্যনাথ হয়েছে। একটী ছোট মন্দিরে বৈজুব্যাধের সমাধি আছে ব'লে লোকে এখনও দেখায়।"

মেয়েটীর পথশ্রান্তি দূর কর্‌বার জন্যই ব্রাহ্মণ, প্রসঙ্গক্রমে, এই সকল কথা বল্‌ছিলেন, গৌরীও আনন্দে শুনছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁরা বৈদ্যনাথধামের মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। তখন, এখানে, এখনকার মত, প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা হয়নি। কিন্তু গৌরী একেবারেই জঙ্গল থেকে এসেছিল; যা' দেখ্‌লে তা'তেই তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। কাপড়ের দোকান, বাসনের দোকান, মিষ্টান্নের দোকানগুলি দেখে সে অবাক্ হয়ে গেল। দলে দলে যাত্রীরা গঙ্গাজলের ভার নিয়ে আস্‌ছিল; ঢাকীরা, নেচে নেচে, তা'দের সঙ্গে ঢাক বাজাতে বাজাতে চল্‌ছিল, আর গান কচ্ছিল;—"মোর মনস্কামনা

পূরণ কর।" কেউবা গাচ্ছিল "মাল খাজনা বাবা লেল; ভর ভর কামর হীরা দেল"* একটী গান গৌরীর বড় ভাল লাগ্‌ল; সে গানটী এই :—

"চর্‌কা কাটি কাটি হম্ পোষল পুত,
সো হো পুতা লেগেল ভৈরো অবধূত।" †

বৈদ্যনাথের ঢাকীরা এখনও এই সকল গান করে। কতদিন হ'তে তারা যে এই গান কচ্চে, আর কতদিন যে কর্ব্বে, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। ঢাকীরা পয়সা চায় ব'লে লোকের বিরক্তি জন্মে; কিন্তু তা'দের গানের মধ্যে যে এক আধটা কথা পাওয়া যায় তা'তে ভাবুকের প্রাণ স্পন্দিত হয়। 'আমার বড় কষ্টে পালিত সন্তানটাকে ভয়রোনাথ সন্ন্যাসী করে নিলেন' না জানি কবে কোন্ মর্ম্মপীড়িতা মাতার কণ্ঠে এই করুণ বাণীটী ধ্বনিত হয়েছিল। এখনও ঢাকীর মুখে তা'র প্রতিধ্বনি হচ্চে।

গৌরী বৈদ্যনাথদর্শনের জন্য ব্যাকুল ছিল। শিবগঙ্গায় হাত, মুখ ধুয়েই পিতার সঙ্গে মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ কল্লে। তখন সকল মন্দির-গুলি গঠিত হয়নি, কিন্তু বৈদ্যনাথের ও পার্ব্বতীর মন্দির দু'টী হয়েছিল এবং উভয় মন্দিরের চূড়া গাঁটছড়ায় বাঁধা ছিল। বৈদ্যনাথের মন্দির দেখে গৌরীর আনন্দের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে ভাব্‌লে এত বড় মন্দির কেমন করে গাঁথা হ'ল। সন্ধ্যার পর সে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে আরতি দেখ্‌লে, বৈদ্যনাথের শৃঙ্গারবেশ দেখ্‌লে; তা'র দুই চক্ষু দিয়ে দর দর করে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমি আজ কি দেখ্‌লুম, আমার জন্ম সার্থক হ'ল, এই

---

* ইহার অর্থ এই :—

বিষয়, বিভব বিভু করিয়া গ্রহণ
করণামণিতে পাত্র করিলা পূরণ॥

† ভাবার্থ এই :—

চর্‌কা কাটিয়া আমি পালিনু কুমারে
অবধূত ভৈরোনাথ লইলা তাহারে।

ভেবে সে বার বার বৈদ্যনাথকে প্রণাম কত্তে লাগ্‌ল। বৈদ্যনাথকে যখন সে স্পর্শ কল্লে, তখন তার মনে হ'ল, কেউ তার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ঢেলে দিচ্চে। মন্দিরে যারা উপস্থিত ছিলেন, গৌরীর ভাব দেখে মুগ্ধ হলেন। পূজক যাত্রীদের মধ্যে এক ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন। তিনি, কৌতূহলী হয়ে, তাঁর পাণ্ডাকে গৌরীর পরিচয় নিতে বল্লেন। দর্শন শেষ হ'লে গৌরী, মন্দির প্রদক্ষিণ করে, পিতার সঙ্গে, শিবগঙ্গার দক্ষিণে যাত্রী থাক্‌বার জন্য যে সকল ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে, রাত্রিবাসের জন্য, তারই একটীতে উঠ্‌ল।

পরদিন প্রাতে, পিতার সঙ্গে, শিবগঙ্গায় স্নান করে, গৌরী বৈদ্যনাথের পূজা দিলে। আয়োজন কিছুই ছিলনা। গাছের সেই মিঠা কুম্‌ড়াটী, দু'চার পয়সার গঙ্গাজল, ফুল, বেলপাতা আর সামান্য কিছু মিষ্টান্ন পূজার উপকরণ ছিল। এরূপ যাত্রীরা তীর্থের পূজারিদের কাছে আদর, যত্ন পায়না। কিন্তু বৈদ্যনাথের পাণ্ডারা, সাধারণতঃ, অপর বহুতীর্থের পাণ্ডাদের অপেক্ষা ভদ্র। তাঁরা অর্থের জন্য যাত্রিদিগকে কোনওরূপ পীড়ন করেন না। যাতে স্বচ্ছন্দে তাদের দর্শন হয়, থাক্‌বার বা আহারাদির ক্লেশ না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করেন। গৌরীর ভক্তি, ততোধিক তার সরল, সুন্দর মুখখানি দেখে তাদের পাণ্ডার মনে স্নেহসঞ্চার হয়েছিল। তিনি বেশ যত্ন করে তাদের পূজা করালেন এবং পূর্ব্বদিন গৌরীর অন্নাহার হয়নি শুনে তাঁর বাড়ীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ কল্লেন। গৌরী পিতার সঙ্গে যাত্রিনিবাসে ফিরে এল।

গৌরীর পিতা যে যাত্রিনিবাসে উঠেছিলেন, তা'তে আরও কয়েকটী যাত্রী আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ আহারের উদ্‌যোগ কচ্ছিলেন, কেউ গৃহস্থালীর জন্য যে সকল দ্রব্য পূর্ব্বদিন ক্রয় করেছিলেন, সেগুলি পুঁটুলির মধ্যে তুল্‌ছিলেন। একজন, কেবল, একটী ছোট অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে বসে, একমনে, স্তবপাঠ কচ্ছিলেন। নবীন যুবা, নধর দেহ, উজ্জ্বল কাঞ্চনের মত বর্ণ, প্রশস্ত ললাট তা'তে বিভূতির রেখা, সহাস্য সুন্দর মুখ,

বাহু, বক্ষ রুদ্রাক্ষমাল্যে শোভিত, দেখ্‌লে সাক্ষাৎ মহাদেব বলে জ্ঞান হয়। তিনি একমনে শিবাষ্টক স্তোত্র পাঠ কচ্ছিলেন ঃ—*

গৌরী, তাঁর প্রশান্তমূর্ত্তি দেখে আর তাঁর মধুর স্তবপাঠ শুনে, মোহিত হয়ে, একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। তিনিও গৌরীকে দেখে একবার ভাল করে তার দিকে চাইলেন। দু'জনার চোকে চোকে মিল হ'ল। এই সময় গৌরীর পিতাকে নিকটে দেখে যুবা, যেন খুব সঙ্কুচিত হয়ে, স্তবপাঠ বন্ধ কল্লেন। গৌরীর পিতা যুবাকে দেখিয়ে গৌরীকে বল্লেন ;—"গৌরি! এঁরই সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা হয়েছিল" শুনে গৌরী তাঁকে আর একবার ভাল করে দেখ্‌বার জন্য চাইলে ; কিন্তু দেখ্‌লে, তিনি পূর্ব্বেই উঠে গিয়েছেন। গৌরীর সমবয়স্কা যে মেয়েটী বুড়াই থেকে তা'দের সঙ্গে এসেছিল, সে এই সময় বল্লে ঃ—

"গৌরী দিদি! তুমি যাঁকে দেখ্‌ছিলে, উনি কে?" গৌরী অনুচ্চ স্বরে বল্লে ;—"আমার স্বামী।"

কথাটী তা'র পিতার কাণে গেল। তিনি একবার গৌরীর দিকে চাইলেন, কিন্তু কোন কথা বল্লেন না। অপরাহ্লে সংসারের কিছু জিনিস কেন্‌বার জন্য বাজারে যাবার সময় তিনি জিজ্ঞাসা কল্লেন' "গৌরি! তোমার কি কিছু চাই?"

গৌরী উত্তর দিলে ; "একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা।"

পরদিন প্রাতে গৌরীর পিতা কন্যাকে নিয়ে বুড়াইএ ফির্‌বার উদ্‌যোগ কচ্চেন, এমন সময় তাঁর পাণ্ডা এসে বল্লেন ;—"উপাধ্যায়! তোমার মেয়েটীর অদৃষ্ট দেখ্‌চি বড় ভাল, শীঘ্রই তুমি একটী সুসংবাদ পা'বে।"

* প্রভুমীশ মনীশমশেষগুণং গুণহীন মহীশগরাভরণম্
রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।
গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং তনুনিন্দিত রাজিতকোটিবিধুম্
বিধিবিষ্ণুশিরোধৃতপাদযুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।
ইত্যাদি।

গৌরীর পিতা ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন; "কি সংবাদ?"

পাণ্ডা বল্লেন;—"এখনও একটু সন্দেহ আছে বলে আজ তোমায় সকল কথা বলতে পারব না। তুমি বুড়াইএ ফিরে যাও। সংবাদটা পাকা হ'লে আমি নিজেই বুড়াইএ গিয়ে তোমায় জানাব, তখন আমায় খুসী কর্ত্তে হবে।"

গৌরীর পিতা বল্লেন;—"সুসংবাদ হ'লে ত্রুটি হ'বে না।"

যথাসময়ে গৌরী বুড়াইএ ফিরে এল। তার বাবা দেখলেন, মেয়েটা গম্ভীর হয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন, বৈদ্যনাথ-সম্বন্ধে কত কথাই গৌরী তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে; কিন্তু সে সমস্ত পথ একরূপ নীরবেই এল। ব্রাহ্মণ বুঝলেন, গৌরীর মনে কি একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হয়েছে। বুড়াইএর কাছে এসে সে কেবল জিজ্ঞাসা কল্লে;—"বাবা! স্ত্রীলোকের একবার বিবাহ হ'লে আবার কি বিবাহ হ'তে পারে?"

গৌরীর বাবা বল্লেন;—"না;—নীচ জাতির মধ্যে হতে পারে; কিন্তু উচ্চবর্ণের, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের, মধ্যে হ'তে পারে না।"

আর কোন কথা হ'ল না। বাড়ীতে ফিরে এসে গৌরী আপনার অভ্যাস মত গৌরীনাথের পূজা, পিতার সেবা কর্ত্তে লাগল। তার ব্যবহারে কেবল এইটুকু পরিবর্ত্তন দেখা গেল যে, বৈদ্যনাথ থেকে সে যে রুদ্রাক্ষের মালা ছড়াটী এনেছিল, পূজার সময় সেইটা গলায় পরত। মেয়েটার মন যদি তা'তে শুচি হয়, ক্ষতি কি? এই ভেবে তা'র বাবা সে সম্বন্ধে কোন কথা বল্লেন না।

লোকালয় থেকে দূরে বাস কল্লে কতকগুলি দোষ হয়, কিন্তু কতকগুলি গুণও জন্মে। দোষ হয় পৃথিবী সম্বন্ধে অজ্ঞতা। কোথায় কি ঘটচে, কি অবস্থায় কা'র সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তে হয়, জ্ঞান থাকে না। গুণ হয় এই যে মানুষ পরের উপর নির্ভর না করে ভাবতে শেখে, কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য নিজেই বুঝে স্থির কর্ত্তে পারে। গৌরীরও এই গুণ জন্মেছিল।

বার বছরের মেয়ে হ'লেও সে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা স্থির করেছিল। বাড়ীতে অপর কেউ ছিল না, বাপ আর মেয়ে। দু'জনার মধ্যে মন খুলে কথাবার্ত্তা হ'ত। বাপ তা' হ'তে বুঝতেন, মেয়েটী নিতান্ত কাদার ডেলা নয়; তার কোমলতার মধ্যে কাঠিন্য আছে। জলের মত সে নরম বটে, কিন্তু চাপ দিয়ে তাকে সঙ্কুচিত করা যায় না। তিনি মেয়ের মন বুঝে চল্‌তেন।

গৌরীর পিতার ঝাড়খণ্ড হ'তে ফিরে আসবার দিন পনর পরে দেখা গেল, পাথ্‌রো নদীর ধারে ছোট বড় তিন চারটী তাঁবু পড়েছে। বড় তাঁবুটীর দরজায় জরীর পাগড়ী মাথায়, ঢাল তলোয়ার হাতে, এক ভোজপুরিয়া দরোয়ান বসে আছে। ছোট তাঁবু গুলিতে কয়জন কর্ম্মচারী ও ভৃত্য আপনার আপনার কাজ কচ্চে। বড় তাঁবুটীর মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট গালিচা পাতা; একজন সুবেশ, শান্তমূর্ত্তি পুরুষ তার উপর বসে গৌরীর পিতার পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে কি কথা বার্ত্তা কচ্চেন। তাঁর বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নয়; সুস্থ, সবল; দেখ্‌লেই অতি সুপুরুষ বলে বোধ হয়। এ রকম লোক, এত আসবাব নিয়ে, কেন বুড়াইএ এলেন জান্‌বার জন্য সকলেরই আগ্রহ জন্মেছিল। ক্রমে প্রকাশ হল যে তিনি হাজারিবাগ জিলার অন্যতম প্রধান জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ ঝা। বৈদ্যনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন, বাড়ীতে ফিরে যাচ্চেন। বুড়াইএর পরেই হাজারিবাগ; কোন প্রয়োজনে তিনি বুড়াই হয়ে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তার কিয়ৎক্ষণ পরে বৈদ্যনাথের পাণ্ডা গৌরীর পিতার সঙ্গে দেখা করে বল্লেন;—"জনার্দ্দন! আমি তোমায় বলেছিলুম যে তোমার কন্যার অদৃষ্ট বড় ভাল; আমি শীঘ্রই তা'র সম্বন্ধে তোমাকে একটা সুসংবাদ দেব। এখন সেই সংবাদটা শোন। হাজারিবাগ জিলার প্রধান জমিদার শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ঝা তোমাদের গ্রামে এসেছেন। ঐশ্বর্য্যে তিনি দ্বিতীয় কুবের; এত নগদ টাকা আমাদের মৈথিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে আর কা'রও ঘরে নাই।

তিনি যেমন ধনী তেমনই ধার্ম্মিক। এবার বৈদ্যনাথকে সোণার মুকুট দিয়েছেন। প্রত্যেক পাণ্ডার বাড়ীতে, একথালা চূরমা লাড্ডুর সঙ্গে, এক এক থানি রেশমী কাপড় পাঠিয়েছেন। বৈদ্যনাথধামে সর্ব্বপ্রকারে তাঁর দশহাজার টাকার কম ব্যয় হয়নি। বৎসরাধিক হ'ল, তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। একটী পুত্র আছে বলে তাঁর বিবাহে ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সম্প্রতি তিনি পত্র পেয়েছেন যে, যদি তিনি বিবাহ না করেন, তাঁর মা সংসারে থাক্‌বেন না; কাশীতে গিয়ে বাস কর্ব্বেন। তাই তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ কত্তে সম্মত হয়েছেন। তোমার কন্যাটীকে বৈদ্যনাথের মন্দিরে দেখে তাঁর মনোনীত হয়েছে। আমার মুখে তোমার পরিচয় পেয়ে তিনি স্থির করেছেন যে, তোমার সম্মতি পেলে, তিনি আজই পাকা কথা দিয়ে যাবেন। পরে শুভদিনে বিবাহ হবে। এমন সৌভাগ্য আমাদের মৈথিলী মেয়েদের সহজে হয় না। এখন তোমার মত কি বল।"

গৌরীর পিতা আনন্দে বল্লেন;—"এ প্রভু বৈদ্যনাথেরই কৃপা। আমার কন্যার কপালে এত সুখ ছিল বলেই পূর্ব্বসম্বন্ধটা, বোধ হয়, ভেঙ্গে গিয়েছিল। যা' হ'ক বুড়াইএ আমার যে দু'এক ঘর জ্ঞাতি, কুটুম্ব আছেন, তাঁদের মত জেনে আমি অপরাহ্ণে আপনাকে জানাব। বিনা পরামর্শে মত দিলে তাঁদের অভিমান হবে।"

গৌরীর পিতা যে জ্ঞাতি, কুটুম্বের সঙ্গে পরামর্শ কর্ব্বেন বলেছিলেন, সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা গৌরীর সঙ্গে পরামর্শ। তিনি গৌরীর মনোগত ভাব কতকটা বুঝেছিলেন। সেত এখন আর নিতান্ত শিশু নয়; বার বৎসর পার হয়েছে; তার অনিচ্ছায় কিছু করা সঙ্গত নয়। আর যেরূপ সম্বন্ধ তা'তে গৌরীর অমতের কারণ থাকতে পারে না; তবে জিজ্ঞাসা কত্তে ক্ষতি কি? তিনি আহারের পর গৌরী যখন তাঁকে বাতাস কচ্ছিল, তখন তাকে বল্লেন;—"গৌরি! আজ বড় একটা সুসংবাদ পেলুম।

হাজারিবাগ জিলার প্রধান জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঝা তোমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছেন। তিনি অতি সুপুরুষ ও ধার্ম্মিক। তাঁর ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই, তুমি রাজরাণীর মত সুখে থাকবে। তোমার ভাগ্য বড় ভাল; এই জন্যই, বোধ হয়, পূর্ব্ব সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গিয়েছিল।

গৌরি মন দিয়ে পিতার কথাগুলি শুনলে; অতি ধীরভাবে বল্লে,—"বাবা! আপনি সেদিন না বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মেয়ের একবার বিবাহ হ'লে আর বিবাহ হ'তে পারে না?"

কন্যার মনের ভাব বুঝে জনার্দ্দন বল্লেন;—"হাঁ বলেছিলুম বটে; কিন্তু তোমার ত মা! বিবাহ হয় নি। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল মাত্র। এমন কত সম্বন্ধ স্থির হয়, ভেঙ্গে যায়; সে সকল কন্যা কি অবূঢ়া থাকে?"

গৌরি। "আপনি বলেছিলেন যে সাবিত্রী, মনে মনে সত্যবানকে পতিরূপে একবার বরণ করেছিলেন বলে, অপর কোনও পাত্রকে বরণ কত্তে সম্মতা হন নি। তাঁর পিতাও তাঁর মতে মত দিয়েছিলেন। তবে আপনি আমাকে আবার বিবাহের কথা বলছেন কেন?"

জনার্দ্দন বিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে চাইলেন। গৌরী বৈদ্যনাথধামের যাত্রিনিবাসে অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে যে যুবকের সঙ্গে তার বিবাহপ্রস্তাব হয়েছিল তাঁকে দেখে বলেছিল 'আমার স্বামী', সে কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি জানতেন গৌরী ফুলের মত কোমল, আবার পাষাণের মত কঠোর। কূটতর্ক উত্থাপনের বা বাদানুবাদের তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তিনি বল্লেন;—"গৌরী! আমি তোমার পিতা, আমার কাছে কিছু গোপন করো না। যাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা হয়েছিল, তোমার কি ইচ্ছা যে তাঁরি সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়? নির্ভয়ে বল।"

গৌরী নীরব রইল। জনার্দ্দন বল্লেন;—"মা! লজ্জা কল্লে চলবে না। আমাকে তোমার মনের ভাব সুস্পষ্ট বল। তুমি কি তাঁকে মনে মনে বরণ করেছিলে বলেই সে দিন উত্তর দিয়েছিলে "আমার স্বামী?"

গৌরী এবার বল্লে; "আজ্ঞা হাঁ।" জনার্দ্দন বল্লেন; "তবে আর পাণ্ডা ঠাকুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন কথা ক'বার প্রয়োজন নাই। আমি বল্‌ব যে এখন আমি কন্যার বিবাহ দেব না।"

এই সময় একজন ভৃত্য রূপার থালে কিছু মিষ্টান্ন ও একখানি রেশমী শাড়ী নিয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। উভয়েই বুঝ্‌লেন যে জমিদার বাবুর তাঁবু থেকেই এসেছে। গৌরী পিতাকে আস্তে আস্তে বল্লে;—"বাবা! এ কাপড় কি হ'বে? আমিত এ কাপড় পরতে পারব না; ফিরিয়ে দেন। খাবারগুলি রাখ্‌চি; ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পেলে খুসী হ'বে।"

জনার্দ্দন যথোচিত ভদ্রতার সঙ্গে কাপড়খানি ফিরৎ দিলেন। পরদিন প্রাতে বুড়াইবাসীরা দেখ্‌লে অত বড় তাঁবু শরতের মেঘের মত কোথায় উড়ে গিয়েছে। পাণ্ডাজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

জমিদার মহাশয় কেন এসেছিলেন, কেনই বা হঠাৎ চলে গেলেন, সে কথা শীঘ্রই প্রচার হ'ল। গৌরীর অনিচ্ছাতেই যে বিবাহ হ'ল না এবং গৌরীর অনিচ্ছার কারণ যে কি তা'ও অপ্রচার রইল না। তখন নানা জনে নানা কথা বল্‌তে আরম্ভ কল্লে। কেউ বল্লে,—'এমন করে হাতের লক্ষ্মী কি পায়ে ঠেল্‌তে আছে?' কেউ বল্লে;—"জনার্দ্দন ঠাকুর বড় ভুল কল্লেন। তিনি একটু জোর কল্লেই ত গৌরীর মত হ'ত। বাপ ভিন্ন সেত কারুকে জানে না; সে কি বাপের মনে কষ্ট দিত?" কিন্তু যে মেয়ে বাপ ভিন্ন কারুকে জানে না, তার উপর জোর করা যে বাপের পক্ষে অসম্ভব, যিনি এ কথা বল্লেন, তাঁর মনে সেটা স্থান পেলে না। অধিকাংশ লোকই কিন্তু বল্লে;—"ধন্যা মেয়ে! যার সঙ্গে বিবাহের কথা স্থির হয়েছিল, তাঁকে ভিন্ন কারুকে বিবাহ কর্ব্ব না এ কথা এ কালের কোন মেয়ের মুখে ত শোনা যায় না। এমন কথা সাবিত্রীর মুখেই শোভা পায়। রাজরাণী হ'বার সুযোগ পেয়ে কাঙ্গালিনী রইল; ধন্যা মেয়ে।"

বুড়াইএ উচ্চশ্রেণীর লোকের বাস অধিক ছিল না। নিম্নশ্রেণীর বা

ছোটলোকের বাস অনেক ছিল। তা'দিগকে ছোটলোক ভিন্ন আর কি বল্‌ব? স্বভাবতঃ তা'দের বুদ্ধি একটু স্থূল, তা'র উপর, সত্যযুগ থেকে এ পর্য্যন্ত, তা'দের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা হয়নি; কাজেই তাঁরা মূর্খ; সুতরাং ছোটলোক। সামাজিক নিয়মে তা'দের হাত, পা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা; বুকে 'জগদ্দল' পাথর চাপান: তা'দের নড়্‌বার চড়্‌বার, নিঃশ্বাস ফেলবারও সামর্থ্য নাই। ভূমি উচ্চশ্রেণীর অধিকারে, মূলধন উচ্চশ্রেণীর হস্তে, রাজসেবা, ব্যবসায় উচ্চশ্রেণীর মুষ্টির মধ্যে; কাজেই, অর্থাগমের পথ না থাকায়, তারা দরিদ্র; সুতরাং ছোট লোক। অস্পৃশ্যতাদোষে, দেবমন্দিরের দ্বার তা'দের নিকট রুদ্ধ, সাধু সজ্জনের উপদেশ হ'তে তা'রা বঞ্চিত, সদাচারে, কদাচারে কি পার্থক্য কেউ কখন তা'দিগকে শিক্ষা দেন নি, কাজেই তারা আচারভ্রষ্ট; সুতরাং ছোটলোক। দরিদ্রতার ও অজ্ঞতার জন্য তা'দের বাসস্থান অপরিস্কৃত, পরিচ্ছদ মললিপ্ত, ভক্ষ্য অখাদ্য, কুখাদ্য। সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাবে তা'রাই, অগ্রে, সপরিজন প্রাণ দিয়ে, রোগের প্রসার করে; সুতরাং তা'দিগকে ছোটলোক ভিন্ন আর কি বল্‌ব? এই ছোটলোকেরা, পাশী, দোসাদ, মোহার প্রভৃতি আর্য্য ও অনার্য্যের মিলনে উৎপন্ন জাতিরা, গৌরীর বাবাকে বড় ভালবাস্‌ত। কারণ তারা তাঁর কাছে যেমন মিষ্ট ব্যবহার পেত, এমন আর কা'রও কাছে পেত না। বুড়াইএ আর এক জাতি বাস কর্‌ত, এখন তা'দের সংখ্যা কমে গিয়েছে; কিন্তু তখন অনেক ছিল, তা'দিগকে নৈয়া বলে। নৈয়ারা হিন্দু ও পাহাড়িয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। তারা হিন্দু-দেবতার পূজা করে, সংযম, উপবাস করে, অথচ শূকর, মুর্গী বলি দেয়। কি জানি কেন তারা গৌরীর পিতাকে আন্তরিক ভক্তি কর্‌ত। তা'দের পল্লীতে উপদেবতার উপদ্রব হলে তারা তাঁকে ডেকে নিয়ে যেত; পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হ'লে তারা তাঁকেই মধ্যস্থ মান্‌ত। গাছে নূতন ফল হ'লে তারা তাঁকে না দিয়ে খেত না; বিবাহের পর বরকন্যাকে তাঁকে

না দেখিয়ে ঘরে তুল্‌তনা। তিনিও নৈয়াদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী ছিলেন। তিনি তাদের বিবাদ মিটিয়ে দিতেন, রোগে ঔষধ দিতেন, নবান্নের দিন ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী, পুরুষ সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। পরস্পরের এই সম্বন্ধের জন্য বুড়াইএর ব্রাহ্মণেরা গৌরীর বাবাকে রহস্য করে "নৈয়াগোঁসাই" বল্‌তেন। অপর সকলের মত নৈয়ারাও জমিদার মহাশয়ের সম্বন্ধীয় ঘটনা শুনেছিল। পতিবর্জ্জন, পত্যন্তরগ্রহণ ইত্যাদি কথার অর্থ তারা বুঝ্‌ত না। কিন্তু সত্যরক্ষা যে একটা মহাধর্ম্ম, ত্যাগেই যে ধর্ম্মের পরীক্ষা, এ তা'রা বুঝ্‌ত। তারা শুন্‌লে যে, গৌরী, সত্যরক্ষার জন্য, বছরে লাক টাকা আয়ের এক জমিদারকে বিবাহ কত্তে অসম্মতা হয়েছে; সোণা দানা ছেড়ে দিয়ে, গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালা পরে, জীবন কাটাবে স্থির করেছে; তখন তা'দের ভক্তির সীমা রইল না। নৈয়াদের মোড়ল গৌরীর বাবার কাছে এসে বল্লে;—"গোঁসাই! তোর গৌরী মানুষ নয়, দেবতা; আমরা তা'র পূজো কর্‌ব।" জনার্দ্দন মিষ্ট কথা বলে মোড়লকে বিদায় দিলেন।

জনার্দ্দন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। গৌরীর সম্বন্ধে নিন্দা, প্রশংসা যে যা' করুক, তিনি ভাব্‌লেন, গৌরীর পক্ষে যা' করা সঙ্গত ও স্বাভাবিক সে তা'ই করেছে। আমি তা'কে সাবিত্রীর কথা শুনিয়েছি; আমি তা'কে বুঝিয়েছি ব্রাহ্মণের মেয়ের দু'বার বিবাহ হয় না। এর পর যদি সে নিজের মনোমত পতি ভিন্ন অপর কারুকে বরণ না করে, তবে তা'র দোষ কি? সে ধর্ম্মসঙ্গত কাজই করেছে। কুঁড়ে ঘরের জন্য সে রাজার প্রাসাদ ছেড়েছে, তার মত মেয়ে কোথায় মেলে?

গৌরী অপর কোন পাত্রকে বিবাহ কর্‌বে না বুঝে জনার্দ্দন সেই পূর্ব্বপাত্রটীরই অনুসন্ধান কত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর বাড়ী অধিক দূরে ছিল না। অনুসন্ধানে জানা গেল যে সেই পাত্রটীও আর বিবাহ করেন নি। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁ'র মাতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং সংসারে অপর বন্ধন না থাকায় তিনি

গৃহত্যাগ করে কোথায় চলে গিয়েছেন। কেউ তাঁর সন্ধান জানে না; লোকে বলে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন। সম্ভবতঃ সেই অবস্থায় ঝাড়খণ্ডে তাঁর সঙ্গে জনার্দ্দনের দেখা হয়েছিল।

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, গত হ'তে লাগল। জনার্দ্দন গৌরীর বিবাহ সম্বন্ধে হতাশ হলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল, ক্রমে তাঁর শরীরে নানাবিধ রোগের লক্ষণ দেখা দিল। গৌরী প্রাণপণে পিতার সেবা কত্তো। তাঁর মলমূত্র পরিষ্কার করা হ'তে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সকল কাজই গৌরীকে কত্তে হ'ত। তার উপর পিতার স্থাপিত গৌরী-নাথের নিত্য পূজা ছিল। গৌরীর অক্লান্ত পরিশ্রমে কোন কার্য্যে বিন্দু-মাত্র ত্রুটি হ'ত না। সমস্ত কাজ শেষ ক'রে যখন সে, হাসি মুখে, বাপের কাছে এসে বস্‌ত, জনার্দ্দন সকল ক্লেশ ভুলে যেতেন। একদিন জনার্দ্দন কন্যাকে বল্লেন;—"মা! আমার ত যাবার সময় হয়েছে; তোমার জন্যই আমার ভাবনা। আমার অভাবে তোমার কি হবে?"

গৌরী। "আপনি ত আমাকে কতবার বলেছেন, যার কেউ নাই ভগবানই তার সহায়। গৌরীনাথ আমার ভার নেবেন।"

জনার্দ্দন। "হাঁ মা! এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ; এই বিশ্বাসেই ধার্ম্মিকের বল। তবে, মা! কৃষক যেমন খাত কেটে রাখ্‌লে নদীর জল এসে তার ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করে, ভক্তকেও তেমনি ভগবানের কৃপালাভের জন্য এক একটী পথ উন্মুক্ত করে রাখ্‌তে হয়। তুমি নিজের সম্বন্ধে কিরূপ পথ খুলে রাখ্‌তে চাও বল।"

গৌরী। "আপনি সে সম্বন্ধে কি ভেবেছেন অগ্রে বলুন।"

জনার্দ্দন। "আমি ভেবেছি যে তুমি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিতা হও। তুমি এখনও বালিকা, অনেক দিন তোমায় বেঁচে থাক্‌তে হবে। পৃথিবীতে সৎ, অসৎ সকল শ্রেণীর লোক আছে। তুমি সন্ন্যাসিনী হ'লে কেউ

তোমার দিকে পাপদৃষ্টিতে চাইতে সাহস কর্ব্বে না। সন্ন্যাসিনী হয়ে তুমি আজীবন গৌরীনাথের সেবা কত্তে পার্ব্বে।"

গৌরী। "আপনি ঠিক আমার মনের কথা বলেছেন। ঝাড়খণ্ড থেকে আস্‌বার পর হ'তেই সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য আমার ইচ্ছা জন্মেছিল; আপনি পাছে মনে কষ্ট পান, এই ভয়ে আমি এতদিন মনের ভাব প্রকাশ করিনে। এখন যখন আপনার অনুমতি হয়েছে, তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। এই পূর্ণিমাতে আমার দীক্ষার ব্যবস্থা করুন।"

জনার্দ্দন। সন্ন্যাসধর্ম্ম কি কঠোর তা' কি তুমি জান? সে ধর্ম্ম পালন কত্তে পার্ব্বে ত? আজীবন, অবূঢ়া থেকে, আহার, পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে, কঠোর সংযম অবলম্বন কত্তে পাল্লে তবেই সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা হ'বে।"

গৌরী। "বাবা! সমস্তই শুনেছি। কেবল আহারে, পরিচ্ছদে সংযম নয়; বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায় পর্য্যন্ত সংযম অবলম্বন কত্তে হ'বে। কুবাক্য বলা, কুকার্য্য করা দূরে থাক্, যার মনেও কুচিন্তা স্থান পায়, সে সন্ন্যাস হ'তে বিচ্যুত হয়।"

জনার্দ্দন। "তুমি এ সকল কথা কার কাছে শিখ্‌লে?"

গৌরী। "ঝাড়খণ্ডে যখন আপনি বাজার কর্ব্বার জন্য বেরিয়েছিলেন, তখন আমি যাত্রিনিবাসের একটী ঘরে এক সন্ন্যাসিনীকে দেখ্‌তে পেয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়েছিলুম। তিনি অমরনাথ পাহাড়ে থাকেন; পায়ে হেঁটে মথুরা, প্রয়াগ, কাশী হয়ে বৈদ্যনাথে এসেছিলেন। সেখান থেকে জগন্নাথ হয়ে সেতুবন্ধ যাবেন। তিনিই আমাকে এই সকল কথা বলেছিলেন।"

জনার্দ্দন। "তিনি যা' বলেছেন, সন্ন্যাসধর্ম্মের সেই প্রকৃত আদর্শ। এ আদর্শ রক্ষা কত্তে পার্ব্বে ত?"

গৌরী। "ভরসা করি আপনার আশীর্ব্বাদে পার্‌ব।"

জনার্দ্দন। "আমি নিশ্চিন্ত হলুম। আর আমার মৃত্যুতে ভয় নাই।"

যথাসময়ে সদানন্দ গিরি, বৈদ্যনাথধাম থেকে এসে, গৌরীকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন। সেই রাত্রিতে গৌরী স্বপ্ন দেখ্লেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী তাঁর শয্যার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পরিধান গেরুয়াবস্ত্র, মাথায় জটা; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁর রূপের প্রভায় ঘর আলোকিত হয়েছে। গৌরী তাঁকে প্রণাম করে ফিরে দেখেন তাঁর সে বেশভূষা আর নাই; তাঁর সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত, মস্তকে রত্নময় কিরীট, পরিধান রত্নখচিত বসন। তিনি অতি মধুর স্বরে গৌরীকে বল্লেন;—"বৎসে! আমার তপস্বিনী এবং সংসারিণী উভয় রূপ তুমি দর্শন কল্লে। ভক্তের ইচ্ছানুসারে আমি স্বরূপ প্রকটিত করি। তুমি আমাকে নিয়ত কোন্ রূপে প্রকটিত দেখ্তে চাও।" গৌরী বল্লেন:—"মা! আমি সন্ন্যাসিনী আমি তোমার তপস্বিনী-মূর্ত্তিই সর্ব্বদা দর্শন কত্তে চাই। তখন সেই নারী "তথাস্তু" বলে অন্তর্হিতা হলেন; গৌরীরও নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। প্রাতঃকালে গৌরী পিতাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানালে জনার্দ্দন বল্লেন; "বাছা! তুই ভাগ্যবতী; আমি এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত গৌরীনাথের সেবা কল্লুম, কিন্তু কখনও গৌরীর দর্শন পেলুম না। আর তুই বালিকা তিনি তোকে কৃপা কল্লেন। এই স্বপ্নের কথা স্মরণ রাখিস্; যে ব্রত গ্রহণ করেছিস্ তা'তে অটল থাক্‌তে পার্ব্বি।"

এর কয়দিন মাত্র পরে জনার্দ্দন, অশ্রুসিক্তা কন্যার ক্রোড়ে মাথা রেখে, গৌরীনাথের নাম জপ কত্তে কত্তে, ইহলোক ত্যাগ কল্লেন। তাঁর মুখের শেষ কথা হ'ল "গৌরী"—

অষ্টাদশ বর্ষবয়স্কা গৌরী আজ একাকিনী। তাঁকে আশ্রয় দেন, অভয় দেন, এমন কেউ নাই। তাঁর পার্থিব সম্বল পিতার কুটীরখানি, আর কয় বিঘা জমী। কিন্তু তাঁর সহায় স্বয়ং গৌরীনাথ। সন্ন্যাসিনীর পক্ষে যেরূপ কর্ত্তব্য পিতার পারলৌকিক কার্য্য সেইরূপে শেষ ক'রে গৌরী আপনাকে সম্পূর্ণরূপে গৌরীনাথের সেবায় অর্পণ কল্লেন। প্রথমে পিতৃহীন

কুটীরে একাকিনী বাস কত্তে তাঁর বুকের ভিতর যেন বেদনা বোধ হ'ত। পিতার শয্যা, পরিচ্ছদ, পাদুকা দেখ্‌লে তাঁর চোক যেন জলে ভরে যেত, বুক চিরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়্‌ত। কতবার তিনি, অন্যমনস্কতায়, বাবার জন্য পথ্য, ঔষধ দেবার সময় হয়েছে ভেবে উৎকণ্ঠিতা হ'তেন ; কতবার "বাবা! বাবা! ডাক্‌চ ?" বলে জিজ্ঞাসা কত্তেন। স্বপ্নে, জাগরণে, কত বার, তিনি পিতার মূর্ত্তি দেখ্‌তে, তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেতেন। চিরদিন এভাবে থাক্‌লে মানুষ বাঁচ্‌তে পারে না ; বিধাতার তা' ইচ্ছা নয়। তাই কালে, অবস্থা বিশেষে, গাছ যেমন পাথর হয়ে যায়, অতি কোমল হৃদয়ও তেমনি শোকে, তাপে কঠোর হয়ে আসে। গৌরী ক্রমে পিতার বিয়োগ সহ্য কত্তে শিখ্‌লেন। গ্রামবাসীদিগের সহানুভূতিও তাঁর সান্ত্বনাস্থল হ'ল। জনার্দ্দন সকলেরই প্রিয় ছিলেন। ইতর, ভদ্র সকলেই গৌরীর সংবাদ নিতেন ; তাঁর কোন অভাব আছে জান্‌লে মোচনের চেষ্টা কত্তেন। প্রতিবেশিনী এক বিধবা রাত্রিতে গৌরীর কুটীরে থাক্‌তেন ; পিতার জমি, বাগান পূর্ব্বেরই মত চাষ হ'ত। পূজা, অতিথিসেবা প্রভৃতি কার্য্যে জনার্দ্দনের সময়ে যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, তার কোনও পরিবর্ত্তন হ'ল না।

গৌরীনাথের পূজা, গৌরীনাথের ধ্যানই এখন গৌরীর প্রধান কার্য্য হয়েছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, নিশীথে, সকল সময়ে, সকল কার্য্যের মধ্যে, গৌরী সেই "রজতগিরিনিভ, চারুচন্দ্রাবতংস" মূর্ত্তি ধ্যান কত্তেন। কিন্তু কেবলই কি গৌরীনাথের ? যাত্রিনিবাসে সেই যে উজ্জ্বল গৌর-কান্তি, বিভূতিভূষিত ললাট, রুদ্রাক্ষশোভিতবক্ষ, সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তি যুবা পুরুষকে তিনি দেখেছিলেন, সেই যুবা, অজ্ঞাতভাবে, গৌরীর হৃদয় অধিকার করেছিলেন। গৌরী তাঁকে আপনার আরাধ্য দেবতা হ'তে অভিন্ন ভেবে তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান কর্ত্তেন ; তাঁর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'ত। গৌরী ভাব্‌তেন, ইষ্টদেবতার ধ্যানে যদি এত সুখ, এত আনন্দ, তবে, মানুষ সে সুখ হ'তে আপনাকে বঞ্চিত রাখে কেন ?

গৌরীনাথের সেবার পরে যেটুকু সময় থাকৃত, গৌরী প্রতিবেশীদের সেবায় ক্ষেপন কত্তেন। তাঁর বাবার কাছে তিনি কতকগুলি টোট্‌কা ঔষধ শিখেছিলেন, সেই ঔষধগুলি বিতরণ তাঁর নিত্য কর্ম্ম ছিল। গাছে আম, আতা, কুল, পেয়ারা হ'লে তিনি বাড়ী বাড়ী দিয়ে আস্‌তেন। প্রতিবেশীদের ন্যায় তাদের পালিত পশুগুলিও তাঁর স্নেহে বঞ্চিত হ'ত। একদিন এক প্রতিবেশিনী দেখ্‌লে, গৌরী বড় এক বোঝা শাক নিয়ে চলেছেন। সে জিজ্ঞাসা কল্লে ;—"মা! এগুলি কি হবে? কোথায় নিয়ে যাচ্চেন?" গৌরী বল্লেন ;—"ক্ষেতে এবার অনেক শাক হয়েছিল, সকলকে দেওয়া হয়েছে, এই বার সব বাড়ীর গরুগুলিকে প্রতিদিন কিছু কিছু দেব মনে করে নিয়ে যাচ্চি।" নবান্নের দিন পিতার ন্যায় তিনিও সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। তখন ঝাড়খণ্ডে যাবার রেলপথ দূরে থাক্‌, নির্দ্দিষ্ট রাস্তাও ছিল না। যাত্রীরা যে পথ দিয়ে পারত, সেই পথ দিয়ে, সেখানে যেত। এইজন্য দু'একজন সাধু সন্ন্যাসী বুড়াই দিয়ে যাবার সময়, সন্ধ্যা হলে, গৌরীর অতিথি হ'তেন। গৌরী প্রাণপণে তাঁদের পরিচর্য্যা কত্তেন। পাদপ্রক্ষালনের জল দেওয়া হ'তে অন্নপাক পর্য্যন্ত কোন কার্য্যেই তাঁর ঔদাসীন্য ছিল না। তাঁর পবিত্র কান্তি আর পূজাকালে তাঁর তন্নিষ্ঠতা দেখে কোন কোন সন্ন্যাসী বল্‌তেন;—"আমরা আজ গৌরীনাথের সঙ্গে মূর্ত্তিমতী গৌরীকে দর্শন কল্লুম। কলিযুগে এমন মেয়ে জন্মে না।"

গৌরী পিতার সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি রক্ষা করেছিলেন, কেবল একটী রক্ষা কত্তে পারেন নি। জনার্দ্দন সাপে কামড়ান রোগীকে মন্ত্র পড়ে সারাতেন; গৌরী সেটা পাত্তেন না। কিন্তু লোকে ছাড়্‌তো না। পাহাড়ে দেশে সাপের ভয় বেশী; নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের কারুকে সাপে কামড়ালেই তার আত্মীয় স্বজনেরা গৌরীর কাছে উপস্থিত হ'ত। জনার্দ্দন কন্যাকে পূজার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন এ কথা সকলেই জান্‌ত। শিবপূজার মন্ত্র আর সাপের মন্ত্র যে এক নয় সাধারণ লোকের সে জ্ঞান

ছিল না।' তারা ভাবত গৌরী যখন বাপের কাছে শিবপূজার মন্ত্র শিখেছেন, তখন সাপের মন্ত্রও নিশ্চিত শিখে থাক্‌বেন। তিনি ইচ্ছা কল্লেই বাপের মত সাপে কামড়ান রোগীকে সারাতে পারেন। অনেক বুঝিয়েও গৌরী সাধারণ লোকের মন থেকে এই বিশ্বাস দূর কর্ত্তে পারেননি। পূর্ব্বে বলেছি যে তখন বুড়াই গ্রামে নৈয়া ব'লে এক অনার্য্য জাতির বাস ছিল। জনার্দ্দন তাঁ'দিগকে বড় ভালবাস্‌তেন। একবার নৈয়াদের মোড়লের একটী তিন বৎসরের ছেলেকে ঘাসের ভিতর থেকে সাপে কামড়েছিল। অনেকগুলি মেয়ের পর, শেষ বয়সে, অই ছেলেটী হ'য়েছিল বলে মোড়ল ছেলেটীকে প্রাণের চেয়েও ভালবাস্‌ত। সে গৌরীর কাছে উপস্থিত হ'ল। ঔষধ দিয়ে হ'ক, মন্ত্র পড়ে হ'ক তা'র ছেলেটাকে বাঁচাতেই হবে, নচেৎ সে তাঁর সামনে মাথায় কুঠার মেরে মরবে এই কথা বল্লে। তা'র কথা শুনে আর তা'র কান্না দেখে গৌরী, নিরুপায়ে, ছেলেটাকে গৌরীনাথের স্থানে আন্‌তে উপদেশ দিলেন। বুড়া অচৈতন্য শিশুটাকে বুকে করে গৌরীনাথের গুহায় নিয়ে এল। তার সঙ্গে যত নৈয়া স্ত্রী, পুরুষ আর বুড়াইএর সাধারণ ইতর, ভদ্র সকলেই সেখানে উপস্থিত হ'ল। সকলেরই মুখে এই কথা যে "গৌরী আজ মোড়লের মরা ছেলের প্রাণ দেবেন।" গৌরীর বুক ভয়ে কাঁপ্‌ছিল, কথা জড়িয়ে আস্‌ছিল। তিনি কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে একমনে গৌরীনাথের পূজা কল্লেন; শিশুটীর প্রাণরক্ষার জন্য অতি কাতরভাবে নিবেদন কল্লেন। বৃদ্ধ নৈয়ার অবস্থা ভেবে তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে দর দর করে জল পড়ছিল। পূজা শেষ হ'লে তিনি একটী পূজার ধুতূরা ফুল ও কয়েকটী বিল্বপত্র গঙ্গাজল দিয়ে বেটে এবং গৌরীনাথের স্নান-জল একটী পাত্রে নিয়ে শিশুটীর কাছে এলেন। তার পর মা যেমন ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে বসেন, তেমনি সেই অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য শিশুটীকে কোলে নিয়ে বসলেন। তাঁ'র চক্ষে পলক, বুকে স্পন্দন রইল না; সর্ব্বাঙ্গ স্থির; তিনি মনে মনে কেবল বল্‌ছিলেন, "ঠাকুর!

তুমি ত কালকূটপানে গরলনাশ করেছিলে ; এই নিরপরাধ শিশুর দেহ হতে গরল তুলে নাও।" তাঁর কাণে কে যেন বল্লেন ; "তথাস্তু।" তার পর তিনি গৌরীনাথের স্নানজল নিয়ে শিশুটীর সর্ব্বাঙ্গে মাখালেন ; তাঁর ঠোঁট দুটী ফাঁক্ করে ধুতূরা ফুল আর বেলপাতা বাটা ঔষধটী ফোঁটা ফোঁটা ঢেলে দিলেন। আবার চক্ষু মুদে গৌরীনাথের ধ্যান কত্তে বস্‌লেন। হাজার লোক, ছবির মত নিঃশব্দে, তাঁর কাজ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বিধাতার কি বিধান কেউ বুঝ্‌তে পারে না। ঔষধ পানের কিছুক্ষণ পরেই শিশুটীর নিঃশ্বাস অল্প অল্প পড়্‌তে আরম্ভ কল্লে। ক্রমে সে চক্ষু মেলে চাইলে। তখন সকলেই বুঝ্‌লে বালকের দেহে সত্যই প্রাণ এসেছে। উপস্থিত লোকদের মনে যে কি আনন্দ, কি বিস্ময় জন্মিল—তা' বল্‌বার নয়। বৃদ্ধ নৈয়া আর তার স্ত্রী গৌরীর পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়্‌ল। বুড়াইএর এক ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি গৌরীকে দেখ্‌লে, অনেক সময়, আদর করে অব্যূঢ়েশ্বরী বলে সম্বোধন কত্তেন। এখন তিনি আনন্দের উচ্ছ্বাসে বল্লেন ;—"জয় অব্যূঢ়েশ্বরীর জয়"। লোকে প্রথমে তাঁর কথা বুঝ্‌তে পাল্লে না ; কিন্তু যখন তিনি তার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন, তখন শত কণ্ঠে ধ্বনি উঠ্‌ল "জয় অব্যূঢ়েশ্বরীর জয়" "জয় অব্যূঢ়েশ্বরীর জয়" "জয় অব্যূঢ়েশ্বরীর জয়।"* বুড়াইএর নদী, পাহাড়, প্রান্তর তার প্রতিধ্বনি কল্লে। নৈয়াজাতি সেই দিন হ'তে গৌরীর দাসানুদাস হ'ল।

গৌরী এখন অব্যূঢ়েশ্বরী নামেই পরিচিতা। তাঁর বয়স বিংশতি বৎসর হয়েছে। বসন্তকালের পুষ্পিতা লতার ন্যায় তিনি যৌবনের অনুপম সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা হয়েছেন। সুগঠিত, পূর্ণাবয়ব দেহ, বিশাল নেত্র,

---

* সংস্কৃত অব্যূঢ়া শব্দের অর্থ অবিবাহিতা ; ঈশ্বরী শব্দের অর্থ দেবী। গৌরীর কুমারীত্ব এবং দেবীসদৃশ গুণগুলি ভেবেই ব্রাহ্মণ তাঁর অব্যূঢ়েশ্বরী নাম দিয়েছিলেন। অব্যূঢ়েশ্বরী হ'তে সাধারণ লোকে ব্যূঢ়েশ্বরী ক্রমে বুড়েশ্বরী শব্দ গঠন করেছে। এই অব্যূঢ় শব্দ হ'তেই বাঙ্গালা আইবুড় শব্দের উৎপত্তি।

কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, আজানুলম্বিত কেশজাল দেখ্‌লেই যেন কোন দেবী বলে বোধ হ'ত। প্রাতঃস্নানের পর, যখন, তিনি পূজার পুষ্প, পত্র সংগ্রহের জন্য ভ্রমণ কত্তেন, তখন মনে হ'ত হিমাচলদুহিতা উমা, মহাদেবের অর্চ্চনার জন্য, আবার, পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। সন্ন্যাসিনীর বেশে তাঁর রূপ যেন আরও প্রস্ফুট হয়েছিল। পরিধান গৈরিক বসন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মাল্য, ললাটে বিভূতির রেখা, কেশজাল রুক্ষস্নানে আপিঙ্গল, দেখ্‌লেই লোকে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম কত্তো। সন্ধ্যার আরতির পরে যখন তিনি গৌরীনাথের বন্দনা কত্তেন, গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুন্‌ত। গৌরীর জীবন এই ভাবে অতিবাহিত হচ্ছিল।

পূর্ব্বে বলেছি, কোন কোন সাধু সন্ন্যাসী ঝাড়খণ্ডে যাবার সময় গৌরীর অতিথি হ'তেন। একদিন এক নবীন সন্ন্যাসী এসে তাঁকে দেখা দিলেন। তাঁর সঙ্গে চোকোচোকি হ'বা মাত্র গৌরীর দেহে যেন একটী বিদ্যুতের প্রবাহ ছুট্‌ল। আট বৎসর পূর্ব্বে, বৈদ্যনাথের যাত্রিনিবাসে, তিনি যে যুবাপুরুষকে মহাদেবের স্তব পাঠ কত্তে দেখেছিলেন, তাঁর কথা মনে পড়্‌ল। কিন্তু তিনি মনের ভাব বিন্দুমাত্রও প্রকাশ না করে, সাধারণ অতিথির ন্যায়, তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা কল্লেন। সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ ব'লে তিনি তাঁর পরিচয় জান্‌তে ইচ্ছা কল্লেন না; বিনা পরিচয়েই তাঁর পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হলেন। সন্ন্যাসী, তাঁর অকপট যত্নে প্রীত হয়ে, সে দিন, তৎপর দিনও, গৌরীনাথের গুহার পার্শ্বস্থিত অপর একটী গুহায় অবস্থিতি কল্লেন। গৌরী যখন গৌরীনাথের পূজা, বন্দনা কত্তেন, তিনি একমনে দর্শন ও শ্রবণ কত্তেন। গৌরীর নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখে তিনি যার পর নাই প্রীত হ'লেন। গৌরীর শাস্ত্রজ্ঞান অধিক ছিল না। কিন্তু ভক্তি ত শাস্ত্রজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিতা নয়; ভক্তি ভগবানের হৃৎপদ্ম হ'তে উদ্গতা, এই জন্য তাঁর পাদোদ্ভূতা গঙ্গার অপেক্ষাও পবিত্রতরা। দু' দিন, দু'রাত্রি এক স্থানে বাস করায় এবং পূজা ও আরাধনার পর কথাবার্ত্তায়

উভয়েরই মনে পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হ'ল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর গৌরী আরতির শেষে এই বন্দনাটী গান কল্লেন :—

প্রণমামি শিব শঙ্কর।
অনাদি, অনন্ত, পরাৎপর॥
ত্রিভুবনপালক, ত্রিতাপহারী,
ত্রিপুরাসুরপুর-দাহনকারী
পিণাক-ডম্বরু-ত্রিশূলধারী,
রজত-গিরি-নিভ সুন্দর॥

কণ্ঠবিভূষিত পন্নগমালে,
শোভিত জাহ্নবী শিরোরুহজালে,
শশিলেখা নব অঙ্কিত ভালে,
ভস্ম-চর্চ্চিত কলেবর॥

মঙ্গলরূপী তুমি বিশ্ববিধাতা,
বিঘ্নবিপদহর, ভবভয়ত্রাতা,
ভকতজনে সদা মোক্ষপ্রদাতা,
সুর-নর-বন্দিত মহেশ্বর॥

সন্ন্যাসী মুগ্ধচিত্তে গান শুন্‌লেন; তাঁর চক্ষু জলে আপ্লুত হল। তিনি বল্লেন :—"দেবি! আপনার আরাধনাই ফলবতী হবে, আমাদের প্রয়াস নিষ্ফল।" গৌরী নীরব নমস্কার মাত্রে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

আরতি শেষ হলে অপর সকলে, একে একে, চলে গেলেন; কেবল গৌরী আর সেই সন্ন্যাসী সেখানে রইলেন। উভয়ে গৌরীনাথের গুহার সম্মুখস্থ শিলাসনে বসে পূর্ব্ব দু'দিনের মত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। গৌরীনাথের পূজার জন্য যে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা হয়েছিল তার আলোক

এসে উভয়ের মুখের উপর পড়্‌ছিল। পরস্পরকে দেখে উভয়েই ভাব্‌ছিলেন, কি সুন্দর! কি পবিত্র! চন্দ্রালোকে তখন গুহার সম্মুখস্থ প্রদেশ সমুজ্জ্বল হয়েছিল; সুখশীতল বায়ু উভয়ের অঙ্গ মৃদু মৃদু স্পর্শ কচ্ছিল: গৌরীনাথের গুহা হ'তে সচন্দন ধূপের গন্ধ এসে উভয়ের হৃদয়ে দেবতার সান্নিধ্য জানিয়ে দিচ্ছিল। অন্যান্য কথার পর সন্ন্যাসী বল্লেন :—

দেবি! আমি আপনার আতিথ্যে পরম প্রীতিলাভ করেছি। দেবাদিদেবের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার কল্যাণ হ'ক। সন্ন্যাসীর পক্ষে এক স্থানে অধিক কাল বাস নিষিদ্ধ; আমি সত্বরই অন্যত্র যাব। যাবার পূর্ব্বে আপনাকে দু' একটা কথা বল্‌তে চাই।"

গৌরী। "কি আজ্ঞা হয়, বলুন।"

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীদের পরিচয় লোকে জিজ্ঞাসা করেন না; সন্ন্যাসীরাও লোককে নিজেদের পরিচয় দেন না। কিন্তু আপনি যখন সন্ন্যাসিনী, তখন আপনার নিকট আমার পরিচয় দিলে, বোধ হয়, দোষ হ'বে না।

গৌরী। "আমি পূর্ব্ব হ'তেই আপনার পরিচয় জানি।"

সন্ন্যাসী। "উত্তম! আপনার সহিত আমার কি সম্বন্ধ হ'বার প্রস্তাব হয়েছিল, তা' কি আপনি শুনেছেন?"

গৌরী। "শুনেছি।"

সন্ন্যাসী। "যে জন্য সে সম্বন্ধ হ'ল না তা' কি আপনি জানেন?"

গৌরী। "জানি।"

সন্ন্যাসী। "প্রস্তাবিত সম্বন্ধ-ভঙ্গের জন্য আপনি কি আমায় অপরাধী জ্ঞান করেন?"

গৌরী। "না! মাতৃভক্ত পুত্র বলে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।"

সন্ন্যাসী। "তবে আমি আপনার নিকট একটা প্রস্তাব কর্ত্তে পারি কি?"

গৌরী। 'অকুণ্ঠিত চিত্তে করুন।"

সন্ন্যাসী। "আমার প্রস্তাব এই যে উভয়ে আবার সংসারাশ্রমে প্রবেশ করি; একসঙ্গে গৌরীনাথের সেবা করে কৃতার্থ হই।"

গৌরী। "তা' সম্ভবপর নয়।"

সন্ন্যাসী। "কেন?"

গৌরী। "আপনি এবং আমি উভয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি; তা' হ'তে বিচ্যুত হ'লে উভয়েরই ধর্ম্মহানি হ'বে।"

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুনর্ব্বার গৃহী হওয়ার দৃষ্টান্ত একবারে ত দুর্ল্লভ নয়।"

গৌরী। "পুরুষের পক্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত থাকতে পারে; কিন্তু কোন সন্ন্যাসিনী পুনর্ব্বার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে কি?

সন্ন্যাসী। "স্মরণ হয় না। তবে সন্ন্যাসী যদি পুনর্ব্বার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কত্তে পারেন, সন্ন্যাসিনীই বা না পার্ব্বেন কেন? এর ত কোন সঙ্গত কারণ নাই।"

গৌরী। "সে তর্কের কথা। পুরুষ পত্নীবিয়োগে, এমন কি পত্নীর জীবিতাবস্থাতেও, পুনর্ব্বার বিবাহ কত্তে পারেন; নারী পারেন কি?"

সন্ন্যাসী। "তবে কি আশ্রমধর্ম্ম গ্রহণ না করাই আপনার অভিপ্রায়"?

গৌরী। "কেবল অভিপ্রায় নয়; দৃঢ় সঙ্কল্প।"

সন্ন্যাসী। "আর একটী কথা মাত্র আমার জিজ্ঞাসা আছে। আপনি আমায় অসঙ্কোচে বলুন, আপনার এই সঙ্কল্প কি আমার প্রতি বিরাগের জন্য না অপর কোন কারণে? আমি শুনেছি যে, এক সময়ে, আপনি আমাকে ভিন্ন অপর কা'কেও বিবাহ কত্তে সম্মতা হ'ন নি; বর্ত্তমানে আমার সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব কি?"

গৌরী। "যদি আমার নিজের মনের উপর আমার প্রভুত্ব না থাকৃত, তবে, হয়ত, আমি আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সঙ্কুচিতা হ'তুম। কিন্তু গৌরীনাথের কৃপায় আপনাকে অসঙ্কোচে বলতে পারি, বৈদ্যনাথের যাত্রি-

নিবাসে যে দিন আপনাকে প্রথম দেখেছি, সেই দিন হ'তে, আপনাকে গৌরীনাথের মধ্যে আর গৌরীনাথকে আপনার মধ্যে দেখে, আমি অন্তরে আপনার পূজা করে আস্‌চি। এর অধিক আমার আর কিছু বল্‌বার নাই।"

সন্ন্যাসী। "দেবি! এই যখন আপনার মনের ভাব, তখন, আপনি আশ্রমধর্ম্মগ্রহণে কেন অকারণ অসম্মতা হচ্চেন?"

গৌরী। "অকারণ নয়। আমি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিকট প্রতিশ্রুতা হয়েছি যে, আজীবন, অব্যূঢ়া থেকে, গৌরীনাথের সেবা কর্‌ব। কার্য্যে দূরে থাক্‌, চিন্তাতেও যদি আমি সে প্রতিশ্রুতি হতে বিচ্যুতা হই, ধর্ম্মে পতিতা হ'ব।"

সন্ন্যাসী। "দেবি! তবে আমাদের মিলনের কি একবারেই আশা নাই?"

গৌরী। "এ পৃথিবীতে নাই। যদি পরলোকে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, সংযতেন্দ্রিয় নরনারীর মিলন বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তবে আমরা, অবশ্যই, সেখানে, মিলিত হ'ব।"

সন্ন্যাসী। "আমি সে দিনের প্রতীক্ষা কর্‌ব; এক্ষণে বিদায় গ্রহণ কল্লুম; গৌরীনাথ আপনার কল্যাণ করুন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ন্যাসীর গৌরকান্তি জ্যোৎস্নার আভায় অদৃশ্য হ'ল। গৌরী, নেত্রের উদ্গত বারিবিন্দু, পতিত হ'বার পূর্ব্বেই, রোধ করে, গৃহে প্রত্যাগমন কল্লেন।

অগ্রহায়ণ মাস এসেছে। নূতন ধান্যে বুড়াইএর ক্ষেত্রগুলি কমলার আবির্ভাব সূচনা কচ্চে। কোথাও শ্যাম কোথাও বা হরিদ্রাভ শস্য ফলভরে অবনত হয়ে পড়েছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে সর্ষপের প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি কাঞ্চনের দীপ্তিকে পরাজয় করেছে। চাষার ঘরে ঘরে নূতন ধান উঠেছে; বাতাস নূতন ইক্ষুগুড়ের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত কচ্চে।

বুড়াইএর সর্ব্বপ্রধান উৎসব এই অগ্রহায়ণ মাসে। এই মাসে নূতন

ধান্যে নবান্ন হয়। গৌরী, সে দিন, স্বহস্তে পায়স রেঁধে গ্রামবাসী সকলকে খাওয়ান। গ্রামবাসীরা অমৃতান্নের ন্যায় তা' ভোজন করেন, কুটুম্ব-ভবনে প্রসাদরূপে পাঠিয়ে দেন। গৌরীনাথের কৃপায় নবান্নের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গৌরীকে চিন্তা কত্তে হয় না। ইতর, ভদ্র প্রত্যেক গৃহস্থ পায়সের জন্য নূতন ধানের চাউল, দুগ্ধ, শর্করা তাঁর আশ্রমে পাঠিয়ে দেন। নৈয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিরা কাষ্ঠসংগ্রহের ভার লয়। গৌরী অন্নপূর্ণার ন্যায় দর্ব্বীহস্তে পায়স পরিবেশন করেন। অন্য বৎসরের ন্যায় এবারও নবান্নের উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল। "জয় অবূঢ়েশ্বরীর জয়", "জয় অবূঢ়েশ্বরীর জয়" শব্দে বুড়াইএর প্রান্তর, নদীতীর, গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগ্‌লে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, ক্লান্তি দূর কর্‌বার জন্য, গৌরী, দ্বাররুদ্ধ করে, গৌরীনাথের কুণ্ডের মধ্যে গিয়ে বস্‌লেন। গৌরীনাথের ধ্যানেই তাঁর শ্রান্তি, ক্লান্তি, মানসিক অবসাদ দূর হ'ত। অনেক দিন তিনি সেই কুণ্ডের মধ্যেই রাত্রি যাপন কত্তেন। অপর সকলেই পূজা, আরতি দর্শন করে আপন আপন গৃহে গমন কল্লেন। মধ্য রাত্রিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হল। বাতাসের গোঁগোঁ শব্দের সঙ্গে, মাঝে মাঝে, বজ্রের গর্জ্জন শোনা গেল এবং অকস্মাৎ সুতীব্র ভূকম্পনে সমস্ত গ্রাম আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল। প্রাচীর ও বৃক্ষাদি পতনের এবং প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণের শব্দে গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হ'লেন। কিন্তু প্রগাঢ় অন্ধকারে গৃহের বাহির হতে কা'রও সাহস হল না। প্রাতঃকালে দেখা গেল, অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হয়েছে, নদীতীরের গাছগুলি উপ্‌ড়ে পড়েছে, কোথাও বা বড় বড় পাথর উপর হ'তে নীচে গড়িয়ে এসেছে; কোন কোন গৃহে পালিত পশু ও উত্থানে অক্ষম ব্যক্তি আহত হয়েছে। সকলেই নিজের নিজের বিপদে ব্যস্ত বলে প্রথমে অবূঢ়েশ্বরীর কথা কা'রও মনে উঠ্‌ল না। কিন্তু ক্রমে যখন বেলা প্রহরাতীত হল, লোকে দেখ্‌লে, গৌরী তাঁর অভ্যাসমত পুষ্প চয়ন কচ্চেন না, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রয়েছে, নিত্য পূজার কোনও উদ্যোগ নাই, তখন সকলেই উৎকণ্ঠিত হলেন। ক্রমে গ্রামের

স্ত্রী, পুরুষ বহু ব্যক্তি, মিলিত হয়ে গৌরীনাথের গুহার দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত কত্তে লাগ্‌লেন। আঘাতে রুদ্ধ দ্বারের অর্গল ভেঙ্গে গেল। লোকে বিস্ময়ে ও আতঙ্কে দেখ্‌লে, গুহার উপরিতল হ'তে রাশীকৃত বালুকা, প্রস্তর-খণ্ড ও মৃত্তিকা ভূকম্পন-কালে পতিত হয়ে কুণ্ডটী পূর্ণ করেছে। একখানি বৃহৎ প্রস্তরফলকে কুণ্ডের মুখ প্রায় আবৃত; তা'র উপর শিবলিঙ্গাকৃতি আর একখানি প্রস্তর রয়েছে। গৌরীর পরিধেয় গেরুয়া বস্ত্রের একটী অংশ পতিত বালুকাস্তূপের ভিতর হ'তে দেখা যাচ্ছে। তিনি যে ভূকম্পনে নিপতিত বালুকাপ্রস্তরের মধ্যে, সেই বৃহৎ শিলাখণ্ডের নিম্নে, প্রোথিত হয়েছেন, তখন, কা'রও আর সন্দেহ রইল না। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্রে গ্রামে একটা হাহাকার উঠ্‌ল। স্ত্রী পুরুষ, বালবৃদ্ধ, ইতর ভদ্র, দলে দলে গুহার নিকট উপস্থিত হ'লেন। অনেকে, বালুকা খনন করে, গৌরীকে উদ্ধার কর্ব্বার ইচ্ছা কল্লেন। কিন্তু গ্রামের প্রাচীনেরা পরামর্শ করে বল্লেন;—"তা' কর্ত্তব্য নয়; তাঁকে জীবিত অবস্থায় পা'বার যখন সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁর রক্তাক্ত দেহ বা'র করে লাভ কি? খনন কর্ব্বার সময় হয় ত তাঁর দেহে, গৌরীনাথেরও লিঙ্গে আঘাত পড়্‌বে। তিনি যেরূপ আছেন, সেইরূপই থাকুন। আমাদের সেবা নেবার জন্য তিনি এইভাবে কলেবর ত্যাগ করেছেন। স্বভাবের হস্তে নির্ম্মিত লিঙ্গাকৃতি যে প্রস্তর খানি আকাশ হ'তে পড়েছে, উটী গৌরীনাথেরই প্রতিরূপ। গৌরী সশরীরে এ প্রদেশে আছেন বলে ওতে গৌরীপট্ট নাই। অই লিঙ্গের নিম্নে গৌরীর অধিষ্ঠান কল্পনা করে, আমরা সকলে তাঁর পূজা কর্‌ব। অবুঢ়েশ্বরী নামে, আজ হতে, তিনি বুড়াইএর অধিষ্ঠাত্রী রূপে গণ্য হ'বেন।"

সকলেই একবাক্যে এ কথার অনুমোদন কল্লেন। নৈয়াদের মণ্ডল সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বল্লে;—"তোমরা যদি পূজা কর, তবে, আমরাও কর্ব্ব। অবুঢ়েশ্বরী তোমাদের চেয়ে আমাদের অধিক ভাল বাস্‌তেন, আমাদের অধিক উপকার করেছেন। আমরা প্রথমে পূজা

কর্ব, তারপর তোমরা কর্ব্বে। যদি তোমরা এতে সম্মত না হও, হাজার নৈয়া আজ এখানে রক্ত দেবে।”

হিন্দুরা বল্লেন ;—“তাই হ'ক ; তোমরাই আগে পূজা কর, পরে আমরা কর্ব।” তখন আর্য্য অনার্য্য, স্ত্রী পুরুষ সকলেই এক সঙ্গে “জয় অবৃঢ়েশ্বরীর জয়” “জয় অব্যূঢ়েশ্বরীর জয়” “জয় অবৃ্যঢ়েশ্বরীর জয়” বলে চীৎকার করে উঠল। বুড়াইএর সর্ব্বত্র সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হ'ল।

অব্যূঢ়েশ্বরীর পূজা, এখনও, পূর্ণ প্রভাবে, বুড়াইগ্রামে বর্ত্তমান আছে। নবান্নের পরদিন এখনও সেখানে একটী মেলা বসে। আর্য্য ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বহু সহস্র নৈয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্যজাতি এই উৎসবে যোগ দেয়। তাঁদের মাদল আর বাঁশীর শব্দে সমস্ত গ্রাম মুখরিত হয়ে ওঠে। বৃহৎ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে, রাত্রিতে, যখন, তারা দলে দলে নৃত্য কত্তে থাকে, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হয়। নৈয়ারা প্রথমে তাঁদের জাতীয় প্রথামত শূকর ও মুর্গী বলি দেয়, তারপর হিন্দুরা ছাগ, মেষ বলি দিয়ে পূজা করেন। প্রায় এক সহস্র পশু বলিরূপে অর্পিত হয়। বুড়াইবাসীরা বলেন, এই অঞ্চলের সমস্ত ভূত, প্রেত সেদিন অব্যূঢ়েশ্বরীর আতিথ্য গ্রহণ করে। কয়েক ব্যক্তির উপর সেদিন প্রেতাবেশ হয় ; মাথা নাড়তে নাড়তে, অচৈতন্য অবস্থায়, তারা অনেক অলৌকিক কথা বলে। স্থানীয় ভাষায় এইরূপ ক্রিয়াকে “ঝুপা” বলে। নৈয়াজাতির লোকই এদের মধ্যে প্রধান ; তারা এখনও মন্দিরের পূজারি।

পাঠক ! যদি আর্য্য ও অনার্য্য ধর্ম্মের মিলন কিরূপে হয়েছে বুঝ্তে চান, যদি সীতাসাবিত্রীর যুগের পরেও হিন্দুনারীর পিতৃভক্তির ও পাতিব্রত্যের নিদর্শন পেতে চান, তবে অব্যূঢ়েশ্বরীর লীলাক্ষেত্র বুড়াই দর্শন করুন ; শ্রম এবং অর্থব্যয় সার্থক হ'বে। *

সম্পূর্ণ।

* বুড়াই মধুপুর-গিরিডি-লাইনের জগদীশপুর ষ্টেশন হ'তে ছ' মাইল মাত্র। দেওঘর হ'তে চৌদ্দ মাইল। উভয় স্থান হ'তেই পাল্কী বা গরুর গাড়ীতে যাওয়া যায়। বুড়াই ভক্ত ও ভাবুক উভয়েরই দ্রষ্টব্য।

হিতবাদী।—"এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

THE BENGALEE—We believe every home will be the better and the happier for its perusal.

সঞ্জীবনী।—"অতি সুন্দর, অতি মধুর হইয়াছে; আমরা সকলকে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

১। ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের জন্য কঠোপনিষৎ-কবিতানুবাদ। ।৵০

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়;—"এই অনুবাদ যেমন সরল ও সুমিষ্ট তেমনই আবার মূলের সম্পূর্ণ অনুগামী। এরূপ রচনা কেবল আপনার সিদ্ধ হস্ত দ্বারাই সাধ্য। এই কবিতানুবাদ বঙ্গসাহিত্যের গৌরব ও সৌষ্ঠব বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী মহামূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৮। শিক্ষার্থী শিশুদিগের জন্য রামায়ণের ছবি ও কথা মূল্য ।০

অক্ষয়চন্দ্র সরকার।—"পড়িতে পড়িতে যেন প্রাণের ভিতর বসন্ত বায়ু খেলিতে থাকে।"

৯। ছবি ও কবিতা ১ম ভাগ মূল্য ।০ আনা।

ঐ ২য় ভাগ মূল্য ৷৷০ আনা।

বালক বালিকা দিগের মনোরঞ্জনের উপযুক্ত সুন্দর ছবি ও সুমধুর কবিতা একসঙ্গে দুর্ল্লভ। এই দুই খানি পুস্তক সে অভাব দূর করিবে।

সঞ্জীবনী;—"কোন শিশুপাঠ্য গ্রন্থে এমন ভাষা ও এমন ভাব আছে বলিয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না।"

১০। ভক্তকবি তুকারামের জীবন-চরিত মূল্য ৷৷৵০ আনা।

নব্যভারত;—"যেমন সরল ভাষা, তেমনি বিশুদ্ধ রুচি। তেমনই বিষয় বিবৃতি, তেমনই মাধুর্য্য। যিনি পড়িবেন তিনিই উপকৃত হইবেন।

অধ্যক্ষ—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী—৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।